সবুজ অঙ্গন

বর্ষ ... সংখ্যা ২০১১

সম্পাদনা

উজ্জ্বল হোসাইন

সবুজ অঙ্গন অণু-উপন্যাস সংকলন ২০০৬

সম্পাদনায়	:	উজ্জ্বল হোসাইন
সৌজন্যে	:	সবুজ অঙ্গন ক্লাব গ্রাম ঃ ডাইয়ারকুম ডাকঘর ঃ আল-আমিন বাজার উপজেলা ঃ দোহার, জেলা ঃ ঢাকা
স্বত্ব	:	সম্পাদক
প্রকাশনায়	:	ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ
মূল্য	:	১৫০ টাকা
প্রচ্ছদ	:	সুমন রহমান

উৎসর্গ :

অকালে নিভে যাওয়া আগুন-প্রতিভা
কবি মিজানুর রহমান শমশেরী

কবি মিজানুর রহমান শমশেরী ৮ কার্তিক ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে (১৯৪৬ সালে) ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার অন্তর্গত সুতারপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৯ আষাঢ় ১৩৮৮ বঙ্গাব্দে (১৪ জুলাই ১৯৮১) হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে প্রয়াত হোন। তাঁর পিতার নাম শমশের উদ্দিন। সর্বজ্যেষ্ঠা এক বোন ও পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে শমশেরী ছিলেন পঞ্চম।

শমশেরী ৭০ দশকের কবি। ধূমকেতু, দৈনিক বাংলার বাণী, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সমাচারসহ তদানীন্তন গুটিকতক জাতীয় দৈনিকের সবকটাতেই এবং অন্যান্য লিটল ম্যাগাজিন ও সাময়িকীতে তিনি নিয়মিত লিখতেন। কাজ করতেন দৈনিক বাংলার বাণীতে।

তাঁর জীবদ্দশায় একটিমাত্র কাহিনীকাব্য 'অশ্রুমালা' প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির আয়তন সুবিশাল, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : জীবন-যন্ত্রণা, বসন্ত পরাগ, একাত্তরের চিঠি, শিকল ভাঙ্গার গান (গান) ও হিজলফুলের মালা (কাহিনীকাব্য)।

শমশেরীর কবিতায় কঠিন জীবন-যুদ্ধ ও ঘাত-প্রতিঘাতের এক নিষ্ঠুর বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছিল। এ দেশের মানুষের মধ্যে বিরাজমান নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশা, অনাহার, নৃশংসতা, দুর্নীতি—এসবও অতি প্রকটভাবে তাঁর কবিতায় উঠে এসেছিল।

'সবুজ অঙ্গন সাহিত্য সংকলন ২০০৫'-এ **'নির্বাচিত কবিতা ও ছড়া'** নামের অণুগ্রন্থ স্থান পায়, যাতে প্রেম ও অন্যান্য বিষয়ক ১৯টি ছড়া ও কবিতা রয়েছে।

যদি বলো, আর কোনোদিন লিখবো না—লিখবো না একটি চিঠিও
আমার চিঠির ধূসর পাণ্ডুলিপিগুলো আমাকে ফিরিয়ে তুমি দিও।
যদি বলো, ভুলে যাবো অতীতের মশক-তাড়ানো রাত
আর তুমি যদি বলো—তোমাকেই ভুলে যাবো অকস্মাৎ।
স্মরণের চেয়ে ভুলে যাওয়া শ্রেয়—দেখো নি ভুলেছি কতো,
নক্ষত্রের আকাশ থেকে ঝরে পড়া একটি তারার মতো?

তুমি যদি বলো, ভুলে যাবো পৃথিবীর গীতিময় সুর
আর যদি বলো চলে যেতে, আমি যথার্থই চলে যাবো বহুদূর।
যদি তুমি চেয়ে থাকো পাখির নীড়ের মতো চোখ করে ভার
তবু আমি আসিব না—আসিব না—কোনোদিনই আসিব না আর।

যদি বলো
মিজানুর রহমান শমশেরী

অণু-উপন্যাস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

Edgar Allan Poe 'ছোটগল্প' সম্পর্কে বলেছেন 'A brief prose tale'. তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প সেটিই যা পাঠকমনে একটিমাত্র ঘটনাপ্রবাহের আবেদন সৃষ্টি করে থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষাযাপন' কবিতায় বর্ণিত 'ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখ-কথা'র কথা বাঙালি পাঠকমাত্রই জানেন। এক যুগ আগেও বোধ হয় বাঙালি লেখকরা ছোটগল্পের এই সংজ্ঞাকে আদর্শ সংজ্ঞা হিসেবেই বিবেচনা করতেন। কিন্তু, 'শেষ হয়েও হইল না শেষ'—রবীন্দ্রনাথের এই কথাটি আজকাল নয় শুধু, রবীন্দ্রপূর্ব যুগেও কেবল ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল না—বড় গল্প, উপন্যাস—বলতে গেলে যে-কোনো লেখার ক্ষেত্রেই সমভাবে এই বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ'—এর অর্থ 'অসম্পূর্ণ' উপাখ্যান নয়, পাঠ শেষে পাঠকের মন এক অদ্ভুত তৃপ্তিতে ভরে উঠবে, সেই তৃপ্তিবোধ থেকেই গল্পের প্রধান চরিত্রের পরিণতির জন্য মনে হতে থাকবে—এরপর আরো কিছু ঘটে থাকবে, ঘটতে পারতো, যা পাঠকের মনে যুগপৎ এক ধরনের অতৃপ্তির জ্বালাও সৃষ্টি করবে। এই বৈশিষ্ট্য উপন্যাস, বড় গল্প, নাটক, এমনকি চলচ্চিত্রের কাহিনী এবং 'রূপকথা'র জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য। একটি দীর্ঘ গল্প এক-কাহিনী নির্ভর হতে পারে, একটি অনতি দীর্ঘ গল্পে বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ ও অসংখ্য চরিত্রের উপস্থিতি থাকতে পারে। মাত্র দশ সেকেন্ডের ঘটনা বর্ণনায় উপন্যাস দেখা যায় (অতি সাম্প্রতিককালে আনিসুল হকের 'ফাঁদ' উপন্যাসের কথা বলা যেতে পারে)। এক যুগেরও বেশি সময়ের ব্যাপ্তি দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' ছোটগল্পে। আলাউদ্দীন আল আজাদের 'শীতের শেষ রাত, বসন্তের প্রথম দিন' মাত্র কয়েক মাস সময়কালের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে নির্মিত উপন্যাস। সময়কালের ব্যাপ্তি, চরিত্র, ঘটনাপ্রবাহ, ইত্যাদি দিয়ে তাহলে উপন্যাস আর ছোটগল্পের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা দুরূহই বটে। কিন্তু দুটো যে এক জিনিস নয়, তা-ও স্বীকৃত। অন্যান্য সকল বৈশিষ্ট্যকে ছাপিয়ে অধুনা বেশির ভাগ গবেষক-সমালোচক বিভাজন-রেখা হিসেবে যেটিকে বর্ণনা করে থাকেন তা হলো গল্পের দৈর্ঘ্য। এই দৈর্ঘ্যের ব্যাপারেও সবাই একমত নন; কারো মতে দশ মিনিটের মধ্যে পড়ে শেষ করা গেলে সেটি ছোটগল্প হবে, এভাবে পনর-বিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিট পর্যন্ত পড়ার সময়কালকে কেউ কেউ ছোটগল্প বলে থাকেন, আর এর চেয়ে বেশি সময় লাগলে সেটি আর ছোটগল্প থাকে না, হয়ে যায় বড় গল্প বা উপন্যাস। ছোটগল্প ও উপন্যাস সম্পর্কে ইংরেজি সাহিত্যে আরেকটি ধারণা প্রচলিত আছে—উপন্যাস হলো ছোটগল্পের বর্ধিত সংস্করণ, ছোটগল্প উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত রূপ। তাহলে 'বড় গল্প'র স্থান কোথায়? ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় উপন্যাসের পাশাপাশি 'বড় গল্প' শিরোনামে গল্প ছাপা হতে দেখা যায়, সেগুলোকে পরবর্তীতে একক গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হতেও দেখা যায়। এগুলোর আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, একমাত্র এর দৈর্ঘ্য ছাড়া—যা প্রচলিত 'ছোটগল্প'র চেয়ে আকারে বড়, কিন্তু প্রায়শই প্রচলিত বহু ছোট-উপন্যাসের দৈর্ঘ্যের সমান। বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় 'বড় গল্প' হিসেবে প্রকাশিত গল্প কখনো দেখেছি কিনা আমার মনে পড়ে না। তবে ২০০৫ সনে বিভিন্ন ঈদ-সংখ্যায় (ঈদুল ফিত্‌র) 'উপন্যাসিকা' প্রকাশিত হতে দেখা গেলো; এর আগেও হয়তো 'উপন্যাসিকা' প্রকাশিত হয়ে থাকতে পারে, তবে আমার নজরে পড়ে নি। 'বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে' 'উপন্যাসিকা' অর্থ লিখা হয়েছে 'ক্ষুদ্র উপন্যাস' বা 'novelette'. সেখানে 'উপন্যাস' অর্থ লিখা হয়েছে 'দীর্ঘ আখ্যায়িকা; বড়ো গল্প'। Oxford Dictionary-তে novelette-এর অর্থ লিখা রয়েছে 'a short novel, esp one of poor literary quality'. ইংরেজি সাহিত্যে আরেকটি নাম আছে এই বড় গল্পের—novella, যার অর্থ 'a short novel'. জার্মান, ফ্রেঞ্চ এবং ইটালীয় ভাষায় মূলত ছোটগল্পকেই 'নভেলা' বলা হলেও বর্তমানে আমেরিকাতে novelette আর novella নাম দুটোকে অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। এগুলোকে সংজ্ঞায়িত করা হয় এভাবে—আকারে ছোটগল্পের চেয়ে বড়, তবে উপন্যাসের মতো অতোখানি দীর্ঘ নয়। এই 'বড়'র আবার একটি সীমারেখা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, যা একেবারে অলঙ্ঘ্য নয়, তা হলো—novelette বা novella-র শব্দসংখ্যা হবে বিশ হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার; পঞ্চাশ হাজার শব্দের অধিক হলে তা হবে 'উপন্যাস', আর বিশ হাজার শব্দের কম হলে সেটি 'ছোটগল্প' হিসেবেই বিবেচিত হবে। শব্দসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলা-গল্পের শ্রেণী-বিন্যাস অসম্ভব। এই সংকলনের দীর্ঘতম গল্পটির শব্দসংখ্যা দশ হাজারের নিচে এবং এই সংকলনের ক্ষুদ্রতম গল্পটিকেও পাঠকগণ 'ছোটগল্প' হিসেবে মানতে কুণ্ঠিত হবেন। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র শব্দসংখ্যা তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার হবে। কিন্তু এটি 'উপন্যাসিকা' নয়, বাংলা সাহিত্যের একটি অতি উচ্চাঙ্গীয় উপন্যাস।

'অণু-উপন্যাস' নামটি সবুজ অঙ্গনের নিজস্ব। সবুজ অঙ্গনের নিয়মিত (সপ্তম) সংখ্যায় আমরা এ নামটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ নামেই আমাদের বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। উপন্যাসিকা, novelette বা novella থেকে ভিন্ন অর্থে 'অণু-উপন্যাস' নামটি ব্যবহার করার ইচ্ছে বা যৌক্তিকতা আমাদের নেই। 'অণুগল্প', 'অণুকাব্য', 'অণুপদ্য', ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'ক্ষুদ্র'ত্ব প্রকাশার্থে শব্দের সাথে 'অণু' বিশেষণটি যোগ করা হয়ে থাকে, (যা বর্তমানে একটি বহুল প্রচলিত ধারায় পরিণত হয়েছে); একই ভাবে গ্রন্থের 'ক্ষুদ্র'ত্ব বোঝাবার জন্য 'গ্রন্থ' শব্দের সাথে 'অণু' যোগ করে **'সবুজ অঙ্গন সাহিত্য সংকলন ২০০৫, কবিতা ও ছোটগল্পের ১৭টি অণুগ্রন্থ একত্রে'** প্রকাশ করেছিলাম অমর একুশে বইমেলা ২০০৫-এ। সেই ধারাবাহিকতায় উপন্যাস নামের সাথেও আমরা 'অণু' শব্দটি যোগ করেছি মাত্র, যা 'উপন্যাসিকা'র প্রতিশব্দ হিসেবেই আমরা সূচনা করতে চাই। কোনটি গল্প এবং কোনটি গল্প নয়

(অর্থাৎ গল্প হতে পারে নি), তা বোদ্ধা পাঠক-সাহিত্যিকের বিবেচ্য বিষয়; আমরা আপাতত গল্পের দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে বাংলা অণু-উপন্যাসের সীমারেখা নির্ধারণ করতে আগ্রহী। দশ মিনিটে পড়ে শেষ করা গল্পকে ছোটগল্প বললে হঠাৎ করেই বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যাবে, ছোটগল্পের সংখ্যা যাবে একেবারে কমে; আবার পঞ্চাশ হাজার শব্দের অধিক হলে যদি তা উপন্যাস হয়, তাহলে অজস্র উপন্যাস হয়ে যাবে নিছক 'উপন্যাসিকা'। আমরা যাতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছি তা হলো—মোটামুটি পাঁচ হাজার শব্দ হলেই একটি গল্পকে 'অণু-উপন্যাস' বলা যেতে পারে; এই দৈর্ঘ্যের গল্পকে ছোটগল্প বলতে অনেক পাঠকের অনীহা আছে বলে আমরা ঠিক এই শব্দসংখ্যা ও আকার থেকেই 'অণু-উপন্যাস' সংজ্ঞায়িত করবো। কারিগরি দিক থেকে চার ফর্মার নিচে কোনো বই বাঁধাই করলে তা সুদৃশ্যও হয় না। এই বিবেচনায় তিন ফর্মা বিশিষ্ট গল্পটিকেও আমরা 'অণু-উপন্যাস' বা 'উপন্যাসিকা' বলবো, যা অতিক্রান্ত হলে তা একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যসের মর্যাদা পাবে।

সবুজ অঙ্গন সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের পর থেকেই এর পুস্তক-সংস্করণ বের করার চিন্তা আমাদের মাথায় এসেছিল, যাতে কেবল প্রতিশ্রুতিশীল 'সবুজ' লিখিয়েরাই অংশগ্রহণ করবেন। সেই উদ্দেশে (আগেই বলা হয়েছে) একুশে বইমেলা ২০০৫-এ আমাদের প্রথম পুস্তক-সংস্করণ বের হয়। দ্বিতীয় ধাপে এই বারটি অণু-উপন্যাস একত্রে প্রকাশ করা হলো।

সবুজ অঙ্গন পত্রিকা ও সংকলন 'বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' অনুযায়ী প্রণীত 'বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান' অনুসরণ করে থাকে। অনেকে, বিশেষ করে নবীন লেখকগণ এ বানান-রীতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত নন বলে সবুজ অঙ্গন পড়ে মনে করেন এগুলো ভুল বানানে পরিপূর্ণ। তাঁদেরকে সবিনয়ে 'বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' পড়বার জন্য অনুরোধ করছি।

এই সংকলনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যাঁরা লেখা পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমার সবিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যাঁদের লেখা প্রকাশিত হলো না তাঁদের প্রতি সমবেদনা, আর যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন রইলো।

উজ্জ্বল হোসাইন
১ জানুয়ারি ২০০৬

সূচি

স্বচ্ছ নীল দিগন্ত ... ১১
নূরহাসনা লতিফ

রীতু আরাশিগে ... ২৭
খলিল মাহ্‌মুদ

পানিশমেন্ট ... ৪১
ইমরান আহমেদ

শেষ দেখা ... ৬৩
আর এ জামাল

এক বাঁও মিলে না ... ৭৭
সুমন আখন্দ

চাঁদের গায়ে নীল কামিজ ... ৯৫
বিশ্বাস হাফিজ

গালে টোল পড়া মেয়ে ... ১১৯
জালাল উদ্দিন

নদীর কিনারে ... ১৪৭
সংগীতা সুলতানা মুক্তি

খাঁচা ... ১৭৫
মাসউদ আহমাদ

দোয়েলী ... ১৯৭
এম এ আলীম

অব্যক্ত মনোবাসনা ... ২১৩
ফারজানা রোজ

বৃষ্টি-বিলাসী মেয়ে ... ২৩১
এম. ফজলুল্লাহ্

স্বচ্ছ নীল দিগন্ত

নূরহাসনা লতিফ

উৎসর্গ :

সুসাহিত্যিক শামসুন নাহার জামান

লেখিকা-পরিচিতি

২ এপ্রিল ১৯৪৯-এ রংপুরে জন্মগ্রহণ করেন নূরহাসনা লতিফ। শিক্ষাগত যোগ্যতা বি.এ. অনার্স (বাংলা), এম.এ. (বাংলা), এম.এড। শৈশব থেকেই লেখালেখি শুরু। পত্রিকায় প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সনের দিকে। বর্তমানে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখছেন। ঢাকায় একটি উচ্চবিদ্যালয়ে সিনিয়র শিক্ষিকা হিসেবে কর্মরত আছেন। স্বামী মোঃ আবদুল লতিফ মন্ডল একজন কলামলেখক এবং বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব। নূরহাসনা লতিফ দুই সন্তানের জননী।

সংগঠন : সভাপতি—বনলতা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা; সহ-সভাপতি—বাংলাদেশ লেখক সংসদ, ঢাকা; আজীবন সদস্য—বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

পুরস্কার : দাবানল সাহিত্য পুরস্কার, রংপুর; মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার পুরস্কার ও অন্যান্য।

প্রকাশিত গ্রন্থাবলি :

উপন্যাস : যুঁই ফুলের শুভ্রতা; এক দিগন্তে দৃষ্টি; মুক্ত অভ্র; আধি; বেদনায় নীল প্রজাপতি; ফিরে এলো বসন্ত।

গল্পগ্রন্থ : রাহু; চিলেকোঠার আনন্দ; ভিজে মেঘের দুপুরে (সম্পাদিত); সব পাখি ঘরে ফেরে (সম্পাদিত)।

প্রবন্ধগ্রন্থ : তুই, আমি, আপনি; বাংলা ভাষা শিক্ষণ; রংপুরের লোকসাহিত্য; সময়ের সংলাপ; রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর নারী চরিত্র।

স্মৃতিচারণ : পাকিস্তানে আটক দিনগুলি

এক

অফিসের কাজে চট্টগ্রাম গেছে নাজিম চৌধুরী। ইচ্ছে ছিল নীলারও ওর সাথে যাওয়ার, কিন্তু নাজিম বলে, 'এবার তোমায় নিতে পারছি না। সংগে যাচ্ছেন আমাদের বস্। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ট্যুর।'

নীলা অধ্যাপনা করে ঢাকার একটা কলেজে। শুক্রবার কলেজ ছুটি। আর সে কারণে মেজাজটা বিগড়ে যায় ওর। বাসায় থাকা মানে শুধু কাজ আর কাজ। নাজিমের বাবা-মা সংগে থাকেন। বড় ভাই নাহিমও থাকে এ বাড়িতে। বিয়ের পর খুব ভালো লাগে নীলার। চমৎকার একটা পরিবার। সবাই কেমন বেশি বেশি আন্তরিক। সবার মাঝে প্রাণ আছে। ও ছোট বলে ভীষণ আদর পায়। তবুও আজ কেন যেন মনটা বিদ্রোহ করে। একটা ছুতো করে বাইরে বের হয়। মাকে বলে, 'আমি একটু নিউমার্কেটে যাচ্ছি। কিছু জামাকাপড় সেলাই করতে দিয়েছিলাম।'

রিয়া ভাবী বলে, 'তাড়াতাড়ি ফিরবে। আজ সবাই বাড়িতে। স্পেশাল ডিশ হচ্ছে। সবাই একসাথে খাবো।'

ছুটির দিনগুলোতে এমনই মজা হয়। ভাবী অবশ্য বললেন, 'নাজিমকে মিস করছি আমরা।'

নীলা বের হয়। হালকা নীল জামায় গোলাপি সুতোর কাজ। মাঝে মাঝে চমক দিচ্ছে চুম্‌কি। গোলাপি সালোয়ার ও ওড়না, কানে-গলায় পাথরের গয়না। সব মিলিয়ে ভালো লাগছে ওকে।

পথে নেমে মনটা একটু ফুরফুরে লাগলেও খুব বেশিক্ষণ নয়। ভুল হলো হিসেবে। বাড়িতেই ভালো লাগতো। বড় ভাইয়ের মেয়ে কথাকে নিয়ে মজা করা যেতো। মনে মনে ভাবে—বেশিক্ষণ মার্কেটে থাকবে না।

হঠাৎ চিন্তায় ছন্দপতন ঘটিয়ে একটা ছোট্ট গাড়ি থামে ওর কাছে। মুখ বাড়িয়ে শেলী বলে, 'আরে নীলা, যাচ্ছিস কোথায়?'

'একটু মার্কেটে।'

'বুঝেছি, যেতে হবে না। গাড়িতে উঠে বস্।'

'কিন্তু কেন?'

'উঠলেই বুঝতে পারবি।'

কথা না বাড়িয়ে উঠে বসে ওর গাড়িতে।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি এখনো বলিস নি।'

'প্রথমে যাবো উত্তরা। তারপর আশুলিয়া। আজ অনেক বেড়াবো।'

'কিন্তু বাসায় যে বলি নি।'

'ফিরে এসে একটা কিছু বলে দিলেই হবে।'

'আমার ভয় করছে। এমনিতে মা খুব ভালো। কিন্তু উলটা-পালটা কিছু করলে ছাড়েন না। বকা খেতেই হবে—আমি বা নাজিম যেই হই।'

'প্রয়োজন হলে বকা খেতেও মজা। তবে এখন চল্।'

'ফাগুন ভাই কি এখন উত্তরায়?'

'হ্যাঁ, ওর অফিসটা তো ওদিকেই। থাকেও তাই ওখানে।'

'আমাকে সঙ্গে নেয়াটা ঠিক হলো না। তোদের কূজনে বাধা পড়বে।'

'মোটেও না। তোমার মতো এমন সুন্দরী সাথে থাকলে খুব সহজ হয়ে যায় যাত্রাপথ।'

'মানে?'

'বুঝলি না? সুন্দরের জন্য পৃথিবীর সব পথ খোলা। কারণ, সুন্দরের প্রেমে মুগ্ধ সব মানুষ।'

'বুঝেছি। এখন বল্, ফাগুন ভাই আর তুই বিয়ে করছিস না কেন? বয়স তো কম হলো না। বিয়ের কনে বুড়িয়ে গেলে মোটেও ভালো লাগবে না।'

'ঠিক আছে, আমার হয়ে ওকালতি করবি আজ। ধেড়ে বর মোটেও ভালো না। বিয়ে না করার বায়না ধরেই আছে একটা না একটা। সে যাক, এখন নিজের কথা বল্, টোনাটুনির প্রেম চলছে কেমন?'

'ভালোই, তবে মাঝে মাঝে অসুবিধা হয় ভীষণ।'

'কী রকম?'

'আমি চিরদিন হাসিখুশি, কলকলিয়ে কথা বলি। আর নাজিম রাশ-গম্ভীর একটা মানুষ।'

'কিন্তু দেখে তো মনে হয় না। আমাদের সাথে তো খুব ফ্রি।'

'ও রকম মনে হয়, কিন্তু ভীষণ হিসেবি। মানুষটা ভালো এমনিতে। সাতে-পাঁচে নেই। কষ্ট দিতে জানে না।'

কথায় কথায় ওরা কখন পৌঁছে গেছে উত্তরায়। ফাগুন অপেক্ষা করছিল একটা শপিং সেন্টারের সামনে। এগিয়ে এলো।

'কী সৌভাগ্য, নীলা যে!'

'পথে পেলাম। বিরহিনী প্রিয়া পথ দিয়ে হাঁটছিল আনমনে। নাজিম ভাই ট্যুরে গেছেন চট্টগ্রাম।' হাসতে হাসতেই কথা বলে শেলী।

'তাই বলো। তা নীলা, আমাদের সাথে ভালো লাগবে তো আপনার?'

'এসে যখন পড়েছি, লাগবে নিশ্চয়।'

দুই

বিকেল গড়িয়ে গেলো, তবু বাসায় এলো না নীলা। অপেক্ষায় ছিল ওরা। সবাইকে খাইয়ে দিয়ে অপেক্ষা করছিল রিয়া একা। শাশুড়ি ভাত-ঘুমের পর উঠে এলেন।

'বড় বৌমা, নীলা আসে নি?'

'না মা, ও তো ফিরলো না এখনো।'

সবাই চিন্তিত—কোথায় গেলো মেয়েটা? এমন তো করে না কখনো। নাকি কোনো বিপদ হলো? মায়ের কাছে গেলো না তো আবার? অথবা কোনো বান্ধবীর বাড়ি?

শাশুড়ির কথামতো অনেক জায়গায় ফোন করলো রিয়া। কোথাও যায় নি সে।

সন্ধ্যার পর ফোন করলো নাজিম ঢাকার খবর জানবার জন্য। মা বললেন, 'নীলা বাইরে গেছে সকালে, ফেরে নি এখনো।'

'বলো কী মা! সংবাদ-অফিসে আর হসপিটালে খোঁজ নিতে বলো ভাইয়াকে।'

কী হতে পারে ব্যাপারটা—এ বাসার কেউ বুঝতে পারছে না। নাজিম ফোন করছে বারবার ওর খবরের জন্য। সবচেয়ে মজার ব্যাপার—নীলার মোবাইলটা পাওয়া গেলো বিছানায় বালিশের কাছে। তার মানে, কী হয়েছে বুঝবার কোনো উপায় নেই। নাহিম চৌধুরী খোঁজ নিয়েছে প্রায় সব জায়গাতে।

রাত আটটা বাজতেই ডোরবেল বেজে ওঠে। দ্রুত এগিয়ে দরজা খোলে রিয়া। কথাও ছুটে যায় মায়ের সাথে। ও আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে—'চাচি এসেছে!'

এক সংগে সবার প্রশ্ন—'কোথায় গিয়েছিলে নীলা? কোনো দুর্ঘটনা?'

'না মা, ওসব কিছু না।'

শাশুড়ির মুখ কঠিন হলো—'তাহলে?'

'জানো, আমরা কতো টেনশনে ছিলাম?' নাহিম বলে।

'স্যরি ভাইয়া।'

'বলো, কী হয়েছে?' সহজ ভাবেই বলে রিয়া।

'আমি নিউমার্কেটেই যাচ্ছিলাম। পথে দেখা হয়ে গেলো শেলীর সাথে। ওর সাথেই বেড়াতে গিয়েছিলাম আশুলিয়ায়।'

'বলো কী, অতো দূরে যাবে আমাদের না জানিয়ে? এটা কী রকম ব্যাপার হলো নীলা?'

'মা, আমাকে মাফ করে দিন। ভুল হয়ে গেছে আমার।'

'একটা ফোন তো করবে?'

'মোবাইলটা নিতে ভুলে গিয়েছিলাম মা। শেলীর মোবাইল ছিল, কিন্তু নেটওয়ার্ক ছিল না।'

'ঘরে যাও। এখনই নাজিম ফোন করবে।' শাশুড়ি বলেন।

'ও কি সব জানে?'

'ফোন করেছিল খবরাখবর নিতে। কী করবো জানিয়ে দিয়েছি।'

ঘরে ঢুকতে না ঢুকতে নাজিমের ফোন এলো।

'হ্যালো!'

'হ্যালো।'

'তুমি ফিরেছো? কোথায় গিয়েছিলে, বলো তো? টেনশন করছি গোটা পরিবার।'

'সত্যি, আজ আমি একটা অন্যায় করে ফেলেছি নাজিম।'

'অন্যায়টা কী?'

'মাকে বলে বেরিয়েছিলাম একটু মার্কেটে যাবো বলে। পথে শেলীর সাথে দেখা। ও এক রকম জোর করেই আমাকে গাড়িতে উঠালো। না বলার শক্তি ছিল না। জীবনে এই প্রথম কাউকে কিছু না বলে এ রকম একটা অন্যায় করলাম। এখন আমার ভাবতেই খারাপ লাগছে। কী চিন্তায় না ফেলেছিলাম সবাইকে।'

'তা গিয়েছিলে কোথায়?'

'আশুলিয়া।'

'তোমরা দুজনে?'

'না, ফাগুন ভাই ছিল।'

'তাই বলো। ঠিক আছে, আর বলতে হবে না। মাকে ম্যানেজ করে চলবে আজকের রাতটুকু। কাল ফিরছি আমি।'

হাঁফ ছেড়ে বাঁচে নীলা। তবুও ভালো ব্যাপারটা বুঝেছে ঐ হিসেবি মানুষটা। আচ্ছা করে বকা দিতে হবে শেলীকে। ওর কী, এখনো বিয়ে করে নি। আছে মজায়। যা খুশি করতে পারে। মা ও একটা ভাই আছে। শেলীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ওদের। চাকরি করে ও একটা এনজিওতে। শেলী নীলার ছোটবেলার বন্ধু। পড়াশুনাও করেছে দুজন একই সাথে।

সবাই শুয়ে পড়ার পর কণ্ঠস্বর কমিয়ে ফোন করে শেলীকে।

'হ্যালো।'

'কে, নীলা?'

'যা বিপদে পড়েছিলাম না। থানা, হাসপাতাল কিছুই বাদ রাখে নি আমাকে খুঁজতে।'

'ভালোই হয়েছে। বুঝুক একটু কেমন ইম্‌পর্টেন্স তোর। তোর বর জানেন?'

'সেও শুনেছে।'

'কথা হয়েছে ওর সাথে?'

'হ্যাঁ, তেমন কিছু ভাবে নি।'

'ব্যস, তাহলে আর চিন্তা কী? ঘুমিয়ে পড়্। কাল কলেজ আছে না?

'তা তো আছেই।'

'তবে হ্যাঁ, আমি কিন্তু রাগ করেছি তোর সাথে।'

'কেন বল্ তো?'

'আমার হয়ে ওকালতির জন্য নিয়ে গেলাম, কিন্তু চুপ মেরে গেলি, বললি না কিছুই।'

'ভালোই আছো বন্ধু। বিয়ের মালাটা কদিন পরেই দিও গলায়। ও খুব কঠিন জিনিস।'

'তাই বুঝি?'

তিন

নীলার কথাই ভাবছে নাজিম। খুব একটা ভাবনা হয়েছিল—কী হলো মেয়েটার। কোথায় যেন একটা পাগলামি আছে ওর। আর হবেই বা না কেন? এতো বড় একটা ঘটনা ঘটে গেলো ওদের পরিবারে। নীলার বাবা ছিলেন একটা সরকারি সংস্থার চিফ

ইঞ্জিনিয়ার। অফিসের কাজে ট্যুরে গিয়েছিলেন। যাওয়ার পথেই ঢাকাগামী একটা ট্রাকের সাথে সংঘর্ষে দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলেই নীলার বাবা রাজীব সাহেব আর তাঁর ছেলে নিকুন মারা যান। মা সাথী চোট পেয়েছিলেন এখানে-ওখানে, কিন্তু তেমন মারাত্মক নয়, অলৌকিক ভাবে বেঁচে যায় নীলা। সে ছিটকে পড়েছিল সদ্য লাঙ্গলচষা নরম জমিতে। এক সাগর দুঃখ সাঁতার দিয়ে সাথী যেন উঠে দাঁড়ালেন একদিন। তাঁকে বাঁচতে হবে ঐ একরত্তি মেয়ের জন্য। সরকারি বাসার ঠাঁইটি নড়ে নি। রাজীবের পেনশনটা পেতেন, সেটা দিয়েই চলতো কোনোরকম মা-মেয়ের। হাসতে ভুলেছিলেন সাথী ছেলে আর স্বামীকে হারিয়ে। পড়তে পড়তেই একটা শপিংমলে চাকরি নেয় নীলা। পড়াশুনার খরচ অনেক। এতো চালানো মায়ের পক্ষে সম্ভব নয় ।

অবসরে বাবার কথা মনে হয় নীলার। বয়স তো বেশি ছিল না। আজও চাকরি করতেন বাবা। ওদের জীবনটা কতো সুন্দর হতো। বাবা বিদেশে গেলে ওদের জন্য আনতেন কতো উপহার! সে-সব যত্নে রেখেছে নীলা। বাবার স্মৃতি ভুলবার নয়। হঠাৎ করেই মানুষের জীবনে এমন তমসার মেঘ নেমে আসে কেন? আগের সেই সুন্দর শাড়িগুলো পরেন না কখনো ওর মা। নীলা আবদার ধরলে বলেন, 'বিধবাদের অতো সাজতে নেই মা।'

'তপুর তো বাবা নেই, কিন্তু ওর মা যে কলেজে যায় কতো সাজগোজ করে।' নীলা বলে।

'এটা যার যার রুচি। আমার ইচ্ছে হয় না।' খুলে কতোটুকু বলা যায় মেয়েকে?

রাজীব যে কী সৌন্দর্য-বিলাসী ছিলেন! প্রতিটি শাড়ি ছিল তাঁর পছন্দে কেনা। শাড়ির প্যাকেট খুলে বলতেন, 'দেখো সাথী, এ শাড়িটা ওরা তৈরি করেছে শুধু তোমার জন্য।'

সাথী খুশিতে বলতেন, 'সত্যি দারুণ!'

'শুধু দারুণ নয়, তুমি ওটা পরলে আকাশ-পরীরা লজ্জা পাবে।'

খাওয়া নিয়ে কোনো ঝামেলা ছিল না রাজীবের। সাথীর রান্না ছিল অমৃত। বরং মাঝে মাঝে নীলা বেঁকে বসতো। এটা খাবে না, ওটা খাবে না। বাবা ওকে কাছে ডেকে বোঝাতেন, 'খাবার নিয়ে অমন করতে নেই। সব খেতে হয়, মা। হালাল যতো খাবার আছে সব খাবে।'

'কিন্তু বাবা, ওসব খেতে যে ভালো লাগে না।'

'ওটা অভ্যাস, নীলামণি। সব খাবার খেয়ে অভ্যাস করতে হয়। তোমার মা রেঁধেছেন এই মাছটা কষ্ট করে। আমি খাচ্ছি, নিকুন খাচ্ছে। শুধু তুমি জিদ করছো। খেয়ে দেখো অতো খারাপ লাগে না, তুমি যতোটা ভাবছো।'

বাবার জন্যই নীলা সব খাবার খেতে শিখেছিল। এখনো সব খায় লক্ষ্মী মেয়ের মতো। ছেলে হয়েও নিকুন ছিল খুব শান্ত। সারাদিন সে কী সব খেলা খেলতো। নীলা ওর খেলাগুলোর নাম দিয়েছিল 'আবিষ্কার-খেলা'। নিবিষ্ট মনে কোনো একটা খেলা নিয়ে মেতে উঠতো। যতোক্ষণ সেটা তার নাগালে না আসছে ততোক্ষণ নাওয়া-খাওয়া বন্ধ। সাথী রেগেই যেতেন—'এই ছেলেকে দিয়ে কিছু হবে না।'

'হবে না কী মা, ও তো বিজ্ঞানী হবে। এখন থেকে গর্ব করো মা, ভবিষ্যতে তুমি হচ্ছো একজন নামী বিজ্ঞানীর মা।'

নীলার আজও মনে হয় নিকুন বেঁচে থাকলে সত্যি সে আবিষ্কার করতো বড় একটা কিছু।

নীলাদের পরিবারের এতোসব কথা শুনেছে নাজিম বিয়ের পর নীলার কাছেই। মাঝে মাঝেই নীলা নাজিমকে বলে, 'এক সাগর নীল বিষ গিলে আমি নীলা।'

'সেজন্যই তুমি আমার দামি নীল পাথর।' হাসতে হাসতেই নাজিম বলে। ওর এমন একটা গুণ আছে যেজন্য সবাই ওকে ভালোবাসে। আপন করার সহজাত একটা ভাব, যা অন্য কারো নেই। এতোসব ভাবতে ভাবতেই সারাদিনের পরিশ্রান্ত নাজিম ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই স্বপ্ন দেখে তার নীলাকে। ট্রেনে চড়ে কোথায় যেন বেড়াতে যাচ্ছে ওরা। একটানা অনেক দূরের জার্নি। কী যে ভালো লাগছে! নীলা বলছে, 'মাঝে মাঝে তোমাকে বলি না, চলো না কোথাও বেড়িয়ে আসি। বেড়াতে গেলে মনটা বড় হয়ে যায় মানুষের। আমি তোমাকে বলে রাখলাম নাজিম, প্রতি বছর দেশের বাইরে কোথাও না কোথাও বেড়িয়ে আসবো। এবারে তবু সাধটা মিটবে দিল্লী-আগ্রা দেখার।'

নীলাকে নিয়ে তাজমহল দেখতে যাচ্ছে নাজিম।

ভোরবেলা দরজায় টোকা পড়ে মৃদু ভাবে। ঘুম ভেঙ্গে যায় নাজিমের। ওয়েটারকে বলে রেখেছিল ভোরবেলা জাগিয়ে দিতে। ইচ্ছে ঢাকায় ফেরার আগে একটু সমুদ্রের কাছে যাবে। এতো বড় মাপের খোদার সৃষ্টি, যার কাছে গেলে প্রসারিত হয় মন। সমুদ্র দেখতে নীলাও ভালোবাসে, আর তাই সুযোগ পেলেই দুজনেই আসে এখানে।

ফোন বেজে ওঠে—'হ্যালো।'

'কেমন আছো নাজিম? ঢাকায় ফিরছো ক'টায়?'

'রাত দশটা তো হবেই। সবাই ভালো তো?'

'হ্যাঁ।'

চার

মনটা ঝরঝরে লাগছে নীলার। নাজিম আসবে রাতে। ইচ্ছে করেই আজ শাড়ি পরলো ও। গোলাপি আর কালোতে মিলানো একটা চেক শাড়ি। শ্যাম্পু করা চুলের রাশি গুছিয়ে রূপ দিল খোঁপায়। খাওয়ার টেবিলে বড় ভাইয়ার সংগে দেখা।

'আজ তো নাজিম আসবে, তাই না?'

'জি ভাইয়া।'

'আমার আসতে দেরি হবে। ফেরার পথে বাবার ওসুধটা নিয়ে এসো।'

'ঠিক আছে ভাইয়া।'

'যাবার আগে মায়ের সংগে কথা বলে যেও। কাল তো তাঁর প্রেসার বাড়িয়ে দিয়েছিলে।'

রিয়ার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে নীলা। বলে, 'সে ম্যানেজ করে নিয়েছি রাতের বেলাতেই।'

'তুমি পারোও বাবা।' রিয়া হেসে ফেলে।

'রাতের রান্নাটা আমি করবো ভাবী। এখন তুমি হালকা কিছু করো। অনেক কষ্ট হয় তোমার।'

'কে বললো তোমাকে আমার কষ্ট হয়? বাসায় থাকি, এ এমন কিছু না। তাছাড়া বুয়া তো আছেই।'

'কথাকে যে দেখছি না ভাবী।'

'ও মায়ের কাছে খেলছে পুতুল নিয়ে।'

কথার কথা বলতে বলতেই ও কাছে এলো।

'চাচি, তুমি না বলেছিলে গয়না কিনে দেবে আমার পুতুল বউয়ের?'

'তাইতো সোনামণি, ভুলে গিয়েছিলাম একদম। ঠিক আছে মা, আজকে এনে দেবো।

পথে বেরিয়ে দেখা গেলো তেমন একটা রিকশা নেই। অনেক কষ্টে একটা রিকশা খুঁজে পাওয়া গেলো। কলেজে ঢুকে অবাক হলো নীলা। ছাত্রছাত্রী নেই। দারোয়ানকে প্রশ্ন করে, 'ছাত্রছাত্রী দেখছি না যে?'

'আজ ছাত্র ধর্মঘট আপা।'

'কেন?'

'ঐ যে ভার্সিটির মেয়েটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলো, ওর কারণেই।'

টিচার্স রুমে পাওয়া গেলো বেশ কয়েকজনকে। নীলাই বলে, 'আজ তো ক্লাস হবে না।'

'হ্যাঁ, এসেই যখন পড়েছি আড্ডা দিই। ক্লাসের চাপে মনের মতো আড্ডা দেয়া হয় না অনেক দিন।' মুনিরা খান বলে।

অলি আপা বলে, 'আড্ডা না হলে সবার খবর জানাও যায় না।'

'হ্যাঁ, আড্ডা জ্ঞান দেয় অনেক।' পলি আপা বলে।

'আপনি দেখছি সৈয়দ মুজতবা আলীর কথা বললেন।' নীলা বলে।

'কী রকম?'

'সৈয়দ মুজতবা আলীর কথা—আমি ভালোবাসি চায়ের দোকানটি। সেখানে সকাল-সন্ধ্যা হাজিরা দিই। পাড়ার পটলা, হাবুল আসে। সবাই মিলে বিড়ি ফুঁকে গোষ্ঠি-সুখ অনুভব করি আর উজির-নাজির মারি। আমার যা কিছু জ্ঞানগম্মি তা আড্ডারই ঝরতি-পড়তি মাল কুড়িয়ে নিয়ে।'

'তোমার স্মরণক্রিয়া খুব ভালো নীলা। কিভাবে মনে রেখেছো মুজতবা আলীর মূল্যবান কথাগুলো?

'হ্যাঁ মুনিরা আপা, আমার যে-কথা ভালো লাগে চেষ্টা করি তা ধরে রাখতে। মুখস্থই করে ফেলি অনেক কিছু।'

'এ একটা ভালো অভ্যাস।'

'এখনকার ছেলেমেয়েরা কবিতা মুখস্থ করে না। অথচ আমরা কিভাবে মুখস্থ করে ফেলতাম ভালো ভালো কবিতাগুলো। ছোটবেলার অনেক কবিতা আমি এখনো বলতে পারি গড়গড় করে।'

পলি আপা বলে, 'আমারও মনে আছে অনেক কবিতা। তার একটা কারণ আছে, আমরা তো পড়তাম ছন্দের কবিতা।'

'হ্যাঁ, ছন্দে বাঁধা কবিতা পড়ার আমেজই আলাদা।' নীলা বলে।

'কিন্তু ছন্দের ছুটি তো দিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে।' পলি বলে।

'কিভাবে?'

'উনি নিজেই গদ্য-কবিতা প্রসঙ্গে বলেছেন—ওর একটা গুণ আছে জানো, যখন যেদিকে সুবিধে দেখে সেইদিকে ছুটে পড়েছে। শেষের দিকে লিখলেনও গদ্য কবিতা রবীন্দ্রনাথ।'

'বই পড়াই ভুলে গেলাম আমরা।' পলি বলে।

'কথাটা ঠিক নয়। যারা পড়বার তারা পড়ে ঠিকই। কারণ, এখন মানুষ লিখছে বেশি। পড়ছে বলেই চেষ্টা করে লেখার।'

মুনিরা আপা বলে, 'যাই বলো, আমার মনে হয় বেশির ভাগ সময় কাটাই আমরা টিভি দেখে।'

'টিভি খোলা থাকলেও সব অনুষ্ঠান দেখি না আমরা। শুধুমাত্র দেখি নিজেদের পছন্দের অনুষ্ঠানগুলি।' পলি আপা বললো।

নীলা বলে, 'পলি আপার কথায় আমিও একমত। টিভি সারাদিন খোলা থাকলেও যে অনুষ্ঠান পছন্দ সেটাই আমরা দেখি। একটা সংবাদপত্র পড়া যায় এ টু জেড, কিন্তু টিভিতে তা সম্ভব নয়।'

'হ্যাঁ, বাংলাদেশে এখন অনেক সিরিয়াল হচ্ছে। কিন্তু সব দেখি না। বেছে বেছে পছন্দ অনুযায়ী দেখি দু-একটা। এখন যে অবস্থা, প্রত্যেকের বাসায় সেট থাকা উচিত কয়েকটা। তাহলে যার যার মতো দেখতে পারবে।'

নীলা বলে, 'ঠিক বলেছেন। আচ্ছা মুনিরা আপা, বাচ্চাদের টিভি দেখা নিয়ে আপনার কী মনে হয়?'

'এখন টিভিটা এমন একটা মাধ্যম যেখানে গোটা পৃথিবীটাই দেখা যেতে পারে ড্রইং রুমে বসে টিভির পর্দায়। আসলে এখানে আছে অনেক শিখবার, জানবার। বই পড়েও আমরা শিখতে পারি। কিন্তু যেটা চোখে দেখছি সেটা বেশি ফলপ্রদ। অতএব বাচ্চাদের টিভি দেখতে দেয়া উচিত।'

'নিষেধ করলে কষ্ট বাড়বে দ্বিগুণ, পড়াশুনা তো হবেই না।' পলি বলে।

'তবে পড়াশুনা করারও নিয়ম থাকবে। রুটিন অনুযায়ী পড়াটা তৈরি হচ্ছে কিনা দেখতে হবে সেটা।'

পথে নামতেই একটা রিকশা পেয়ে গেলো নীলা। উঠে বসলো। রিকশা থামিয়ে শ্বশুরের ওষুধ ও আরো কিছু প্রয়োজনীয় কেনাকাটা করলো। মাঝপথে শুরু হলো বৃষ্টি। বেশ লাগছে। নীলার বৃষ্টি খুব পছন্দ।

পাঁচ

আরো একজন নীলার মতোই বৃষ্টি ভালোবাসতো। ওর ভার্সিটির বন্ধু যোশেফ। ও কবিতা লিখতো। ফাঁক পেলেই দাঁড়িয়ে বলতো, 'ঐ গাছটার নিচে চল গিয়ে বসি। একটা কবিতা লিখেছি, তোকে শোনাবো।'

'আমি তো কবিতা বুঝি না।'

'বাংলাসাহিত্যে পড়িস আর কবিতা বুঝিস না? হতে পারে না, এ তাজ্জব কথা।'

'দেখ, আমি ইচ্ছে করে বাংলাসাহিত্যে পড়ি না। অন্য সাবজেক্টসে চান্স পাই নি বলেই এটা পড়ছি। কিন্তু এ বিষয়টাকে ভালোবাসতে পারি না মন থেকে।'

'তাহলে পাশ করবি কিভাবে?'

'মুখস্থ করে নেবো।'

'এই যা সেরেছে। বাংলাসাহিত্য কি বিজ্ঞান যে হুবহু মুখস্থ করে লিখে দিবি?'

'তাহলে?'

'কিছুটা মৌলিকত্ব থাকতে হবে।'

'ওমা, আমার তাহলে কী হবে? তোর তো মৌলিকত্ব আছে, কবিতা লিখিস।'

'আরে বোকা, ওসব কিছু না। বেশি বেশি বই পড়ু, পত্রিকা পড়ু। পড়তে পড়তেই দেখবি, কখন যেন তুই নিজেই লিখতে পারছিস।'

'তার মানে তোর মতো ওই গল্প-কবিতা? ও আমার আসবে না কিছুতেই।'

'ওসব না লিখলেও চলবে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের উত্তর যুৎসই হলেই হবে। মানে, ফলাফল ভালোর ব্যবস্থা।'

'একটা কাজ কর্ না, তোর নোটগুলো আমাকে দিস।'

'আমি তো অতো নোট করি না। পড়ি শুধু মৌলিক বই।'

'তাহলে আমাকে বুঝিয়ে দিবি কিছু কিছু জিনিস।'

'মাস্টারি করবো?'

'একটু কর্ না। আমি তোর বন্ধু। যদি ফেল করি শোভন হবে না।'

'আমি জানি। মন লাগিয়ে পড়লে তুই আমার চেয়েও ভালো করবি।'

'শোন্ যোশেফ, মা ডেকেছেন তোকে।' প্রসঙ্গ বদলিয়ে নীলা বলে।

'কেন রে? আজই যেতে হবে?'

'সেরকমই তো বললেন মা।'

যোশেফকে ভালোবাসতেন মা। হয়তোবা ওকে দেখে মনে পড়তো নিকুনকে। মায়ের অনেক কঠিন কাজ করে দিত যোশেফ। যোশেফের মা ছিল না। বাবার সংগে থাকতো ওদের পাশের ফ্ল্যাটে। ঐ বাড়িতে থাকতেন ওর কাকা-কাকি। কাকাতো বোন ডিনা। যোশেফ যেমন অনেক রকম কাজ করে দিত মায়ের, মা-ও ভালো খাবার হলে ডেকে পাঠাতেন ওকে। কবি-কবি ভাবটা ওর সেই ছোটবেলা থেকে। কচিকাঁচার

দাদাভাইয়ের আসরের কবি সে। ওর মুখেই গল্প শুনেছে—'জানিস নীলা, আমাদের অনেকেই না, কষ্ট করে কবিতা লেখে।'

'সে আবার কী রকম?'

'বসে বসে ছন্দ মিলায় অনেক কষ্টে।'

'তার মানে—কষ্টে কবি?'

'তাই।'

'তুই কিভাবে লিখিস?'

'আমি ঠিক বলতে পারি না। কিভাবে যেন কবিতা লিখে ফেলি। ছন্দটাও কেমন মিলে যায়।'

'আসলেই যোশেফ, তুই সত্যিকার একজন কবি। তোর ভেতরে আছে বিশাল কবি প্রতিভা।'

'তুই ঠাট্টা করছিস?'

'নাহ্। তুই খুব ভালো ছেলে। তোকে ঠাট্টা করা যায় না। বলতে হয় সত্য কথাটি।'

নীলার প্রতি জন্মদিনে যোশেফ ওকে গিফ্‌ট করতো বই। সেই বইয়ের প্রথম পাতায় লেখা থাকতো একটা কবিতা। বলতো—এ কবিতাটি লিখেছি তোর জন্য।

রিকশায় পর্দা ছিল না বলেই ভিজে একাকার হয়ে বাসায় ফিরলো নীলা। রিয়া বলে, 'তুমি যে কী করো নীলা, বৃষ্টিতে বুঝি কেউ রওনা দেয়?'

'আসলে বুঝতে পারি নি ভাবী। বৃষ্টি তো এসেছে মাঝপথে।'

'ভিজা কাপড়ে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। চেঞ্জ করে ফ্রেশ হও।'

'যাচ্ছি।'

খেতে বসেছে দুজনে। শ্বশুর-শাশুড়ির খাওয়া হয়েছে আগেই। কাঁচের বাটিতে শুটকির তরকারিটা দেখে খুশি হয় নীলা।

'যাক বাবা, মজা করে ভাত খাওয়া যাবে। আমার প্রিয় খাবার রেঁধেছো ভাবী।'

'খাঁটি সর্ষের তেলে আলুভর্তা, আমের আচার।'

খেতে খেতেই নীলা বলে, 'ঘরে বাজার আছে তো, ভাবী?'

'আছে কিছু। তারপরও অফিস-ফিরতি পথে আরো কিছু আনবে তোমার ভাই।'

'বাবার ওষুধগুলো এনেছি। কথা কোথায় ভাবী? ওর পুতুলের গয়না এনেছি আজ।'

'কথা ঘুমুচ্ছে। ওগুলো পেলে ভীষণ খুশি হবে। দামটা বেড়ে যাবে তোমার।'

'কথার মতো আমিও পুতুল খেলতে পছন্দ করতাম ছোটবেলায়। বাবা তো শাড়ি কিনে দিতেন আমার পুতুলের।'

'ছোটবেলার দিনগুলো ভাবলে কী ভালো লাগে, তাই না?'

'হ্যাঁ, ফিরে যেতে ইচ্ছে করে সেসব দিনে।'

'মাওই-মা ফোন করেছিলেন নীলা। অনেকদিন ও বাড়িতে যাও নি মনে হয়।'

'কিছু বলেছেন মা?'

'জমিজমা সংক্রান্ত ব্যাপারে। তোমার চাচারা সব জমিজমা ফিরিয়ে দেবেন, মাওই-মা এটাই বললেন।'

'এতোদিনে? কী হবে এখন ওসব দিয়ে? যা কষ্ট করার সে তো করেই ফেলেছি।'

'জমিজমা সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি আসলে খুব জটিল।'

'তুমি জানো না ভাবী, বাবা মারা যাওয়ার পর যতোদিন বাবার পেনশন পাই নি কষ্ট করেছি। তখন কিন্তু চাচারা একটুও সাহায্য করে নি আমাদের। বরং মা যদি টাকা-পয়সা চায় সেই কারণে ছেড়েই দিয়েছিল আমাদের বাসায় আসা।'

ছয়

সাথী মেয়ের বিয়ের কথা ভাবলেন নীলার ফাইনাল পরীক্ষার পর। আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব অনেকেই খোঁজ দিল ভালো ছেলের। এর মধ্যে কী মনে হলে সরাসরি নীলাকে ডেকে বলেন, 'আমি তোর বিয়ের কথা ভাবছি। তোর কি কোনো পছন্দ আছে নীলা?'

'না মা, ওরকম কিছু ঘটে নি। ওরকম কেউ এলে তোমাকেই আগে জানাতাম। তুমি শুধু মা নও, তুমি আমার বন্ধুও। তবে মা আর মেয়েতে আরো কিছুদিন থাকতে চেয়েছিলাম মা।'

'সে হয় না। কাজ করতে হয় সময় মতো। আমি বেশ কয়েকটা ছেলে দেখেছি এবং তারাও তোকে দেখে পছন্দ করেছে। এখন ছেড়ে দেবো তোর হাতে। তোকে যার ভালো মনে হবে, তাকেই মনোনয়ন দেয়া হবে একমাত্র জামাই হিসেবে।'

'কী সব যে বলো মা!'

'বাস্তবকে মেনে নিতে হয় নীলা।'

'ভালো কে সেটা কিভাবে বুঝবো?'

'সে তোকে চিন্তা করতে হবে না। ওদের সাথে পরিচয়ের ব্যবস্থা করেছি। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। তুই ওদের যাচাই করে নিবি।'

সাথী একটা কথা মেয়েকে বোঝাতেন, 'অর্থের যেমন দরকার আছে জীবনে, শান্তিরও দরকার আছে তেমনি। কাউকে পছন্দ করতে হলে তার জব, স্ট্যাটাস—এগুলো দেখতেই হয়। তারপরও কথা আছে—লোকটি কতোটুকু মানবিক হবে। কারো যদি এই উপাদান না থাকে, সারাজীবন কষ্ট পেতে হয়।'

'ভীষণ একটা কঠিন কথা বললে মা। এটা আমি কিভাবে বুঝবো?'

'মানুষের আচরণেই মানবিক বোধটুকু বেরিয়ে আসে। অবশ্য এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক নয়। ঠকতে হয় কখনো কখনো।'

'তাহলে?'

'সেটাই নিয়তি, খণ্ডন করা যায় না। আমি দোয়া করবো সন্তানের কল্যাণে। নিশ্চয়ই ভালো কাউকে পাবি।'

শেষ পর্যন্ত নীলা পছন্দ করে নাজিম চৌধুরীকে। সব মিলিয়ে মনে হয়েছিল ভালো। সাথী বলেন, 'মনে মনে একে পছন্দ করেছিলাম আমিও। যাক, এবারে তোর ভাগ্য।'

শুরু হয়ে গেলো বাড়িতে বিয়ের আয়োজন। যোশেফকে ডেকে মা বললেন, 'আমার তো আর কেউ নেই। তুমি কিন্তু এবারে সব করবে বাবা।'

'ঠিক আছে আন্টি, অসুবিধা হবে না। যখন যা করতে হবে বলবেন আমাকে।'

পাগলের মতো খেটেছে ওর বিয়েতে যোশেফ। মায়ের সংগে থেকে প্রায় সব কাজেই সাহায্য করেছে।

সুন্দর একটা বিয়ের আয়োজন। এনগেজমেন্ট, হলুদ, বিয়ে—প্রতিটি আয়োজনে কোনো রকম খুঁত ছিল না। ওদের আত্মীয়স্বজনরাও এসেছে সবাই। সাধ্যমতো সাহায্য করেছে। একটা ব্যাপারে মা খুশি। দূরে কোথাও যাচ্ছে না মেয়েটা। ঢাকাতেই থাকছে কাছাকাছি। নিজেদের বাড়ি আছে নাজিমের। দুটি ভাই ওরা। শাশুড়ি খুব অমায়িক। বিয়ের আগে এসে সাথীকে বলেন, 'আপনি খুব বেশি খরচ করবেন না। মেয়ের জন্য সংসারের বাড়তি কোনো কিছু দিতে হবে না। আমার সংসারেও তেমন লোক নেই। যা কিছু সবই ওদের দুই ভাইয়ের।'

'আমার যে ইচ্ছে ছিল মেয়েকে অনেক কিছু দেয়ার।'

'মেয়ে তো আপনার ওই একটিই। ভবিষ্যতে সবই ওর। এখন কিছুই করতে হবে না। শুধু দোয়া করেন ওরা যেন সুখী হয়। আমার মেয়ে নেই। আজ থেকে মেয়েটি আমার। আর আমার ছেলেটি আপনার।'

হেসে ফেলেন সাথী। ভদ্রমহিলা এতো সুন্দর করে কথা বলেন! মনটা ভরে গেলো। আর কিছুই চাইবার নেই ওঁর। শুধু মন-প্রাণ ভরে একটাই কামনা—ওরা সুখী হোক। আনন্দ যেন উপচে পড়ে ওদের সংসারে।

মেয়ের কাছে এসে দাঁড়ালেন সাথী। বললেন, 'মনে হয় ওরা খুব ভালো নীলা। আর তাই তোকেও সন্তুষ্ট রাখতে হবে ওদের।'

'দোয়া করো মা, আমি যেন তাই পারি।'

সাত

বিয়েতে নাজিমের মা বেশি খরচ না করলেও যা করেছেন খুব সুন্দর, রুচিসম্মত। ঢাকার আত্মীয়স্বজনরা প্রায় সবাই এসেছে বিয়েতে। সাথীর বান্ধবীরা বলাবলি করেন।

'খুব ভালো স্ট্যান্ডার্ড ফ্যামিলিতে বিয়েটা হচ্ছে।' আরেক বান্ধবী বলেন, 'বিয়ে-বাড়ির লোকজনের, আত্মীয়স্বজনের চালচলন, বেশভূষা দেখলেই সহজে অনুমান করা যায় তারা কোন ধরনের লোক। কাদের সাথে মেলামেশা করে।'

'হ্যাঁ, এর থেকে স্টাইল, কালচারও ধরা পড়ে। দেখো না, ছেলের বড় ভাবী কেমন সেজেছে, চমৎকার রুচি ভদ্রমহিলার।'

'অতো বলছিস কেন? নীলার শাশুড়িকে দেখ্ না, এই বয়সেও সাজ-সজ্জার ব্যাপারটা।'

'যাক, সাথী সার্থক। স্বামী মরার পর যা কষ্ট করেছে বেচারি! ভালো একটা পরিবারের সাথে আত্মীয়তা হলো, এখন কাটবে ভালো।'

ফুলে ফুলে সাজানো ঘরটায় বসিয়ে দিয়ে গেছে রিয়া ভাবী। নীলার কেমন ঘুম পাচ্ছে। মনে মনে ভাবে—যদি এক কাপ চা পাওয়া যেতো। এটা তো নিজেদের বাড়ি নয়, কাকেই বা ফরমাশ করবে।

নাজিম এলো। কাছে বসলো।

'ক্লান্তিতে তোমার ঘুম পাচ্ছে নীলা। এখনই ঘুম পালানোর ব্যবস্থা করছি।'

কয়েক মিনিট পরেই দু কাপ চা রাখলো নাজিম।

'চা কোথায় পেলে?'

'আমি বানিয়েছি। আমার ঘরে এ ব্যবস্থাটা রেখেছি। কারণ, যখন-তখন আমার চায়ের তেষ্টা পায়।'

'ভালোই তো।' নীলা মৃদু ভাবে হেসে বলে।

গল্পে গল্পে কেটে গেলো রাতটা। মাঝে মাঝেই মায়ের কথা মনে পড়েছে নীলার। অনেকগুলো বছর পর মা আজ একা হয়ে গেলো। নাজিম কিছুটা আঁচ করতে পেরেই বলে, 'তোমার মনে হয় খারাপ লাগছে নীলা।'

'না, খারাপ লাগছে না। তবে মায়ের তো আর কেউ নেই, মনে পড়ছে খুব।'

'আমি ভাবছি, অফিসে যাওয়ার আগে তোমাকে মায়ের কাছে আজ রেখে আসবো। নিয়ে আসবো ফিরতি পথে।'

শাশুড়ি আপত্তি করেন নি। বরং বলেছেন, 'আজকের দিনে মায়ের কাছে রেখে আয়। বেয়াইন নিশ্চয়ই মন খারাপ করে আছেন।'

মা ওকে দেখে খুশি হলেন। বললেন, 'সকালবেলায় চলে এলি যে?'

'তোমার জামাই অফিসে যাওয়ার পথে রেখে গেলো তোমার কথা ভেবে।'

'ছেলেটা আসলেই আমার মনের মতো হয়েছে।'

হঠাৎ করেই কথাটা মনে হলো নীলার। বলে, 'মা, বিয়ের দিন যোশেফকে তো দেখি নি।'

'হ্যাঁ, ও তো সবকিছু রেডি করে দিয়েছে। কোনো অসুবিধা হয় নি আমাদের।'

'অসুস্থ হয় নি তো মা আবার? আমি কি একটু যাবো?'

'একদম কাছেই তো, গিয়ে দেখে আয় কী হয়েছে।'

ডোরবেলা বাজতেই ডিনা দরজা খুলে দিল।

'ওমা, নীলা আপু! তুমি না শ্বশুরবাড়ি গেলে?'

'হ্যাঁ, তা তো গেছি। আবার আজ সকালে এসেছি মাকে দেখতে। তা ডিনা, যোশেফকে যে দেখছি না।'

'সব বলছি। আসো, দাদার ঘরেই বসবো।'

ডিনার সাথে যোশেফের ঘরে এলো নীলা। ঘরে ঢুকে একটা ধাক্কা খেলো। সারা ঘর জুড়ে শুধু নীলার ছবি।

'আমি তোমার জন্য চা নিয়ে আসি আপু?'

'চা আনতে হবে না ডিনা, তুমি বসো। এসব কী, ডিনা?'

'তুমি কি জানো না নীলা আপু, দাদা তোমাকে ভালোবাসে? সারা ঘর জুড়ে শুধু তোমার ছবি।'

'আমি এসব তো কখনো বুঝি নি ডিনা।'

'তোমার বিয়ের কথা শুনে ওর কী মন খারাপ! বারবার মাকে বলেছে—কাকি, তুমি একটি বার আন্টির কাছে যাও। তাঁকে বলো আমি নীলাকে ভালোবাসি। মা রাজি হয় নি। শুধু বলেছে—পাগলামো করিস নে যোশেফ। তোদের ধর্ম আলাদা। কখনো তোর আন্টি এ বিয়ে দেবেন না।'

ডিনা ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'দাদা তোমাকে ভালোবাসে, কিন্তু নীলা আপু, তুমি কি ওকে ভালোবাসো নি? তুমি কেন বিয়ে করলে?' বলতে বলতে কেঁদে ফেলে ডিনা।

নীলা পাথর। এসবের উত্তর ওর কাছে নেই। বন্ধু ছাড়া যোশেফকে যে আর কিছুই সে ভাবে নি। প্রথম থেকেই ওর ভেতরে কাজ করছে যোশেফ খ্রিস্টান। যোশেফ ওর ভালো বন্ধু। বন্ধুকে যতোটুকু ভালো মানুষ বাসে, ঠিক ততোটুকু ভালোই সে বেসেছে।

বাসায় এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে নীলা। 'এটা কী হলো মা?'

মা প্রশ্ন করেন, 'কী হয়েছে বলবি তো? আমি যে বুঝতে পারছি না কিছু।'

'মা, মাগো, যোশেফ আমাকে ভালোবাসতো এটা তো কখনো বুঝি নি।'

'যোশেফ কোথায়?'

'আমার বিয়ের দিন থেকেই সে নিখোঁজ।'

ছেলেটাকে মা-ও ভালোবাসতেন, কিন্তু এমন একটা ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। মেয়েকে অনেক বোঝালেন—'এতে তোর কোনো দোষ নেই নীলা। তুই তো বন্ধু ছাড়া অন্য কিছু কখনো ভাবিস নি, এটা আমি জানি। যোশেফের কথা ভুলেও তুই নাজিমকে বলিস না। এখানে তোর কোনো দোষ নেই। অযথা অশান্তি ডেকে আনিস না সংসারে।'

'ঠিক আছে মা। আমি কাউকে বলবো না এসব। তবে ওর খোঁজ পেলে জানাবে।'

অনেক পরে ডিনার কছেই জেনেছে নীলা—চট্টগ্রাম চলে গেছে যোশেফ। বিদেশী একটা সংস্থায় কাজ করছে। মনে মনে বলে নীলা—'সেই ভালো, আমাকে তুমি ভুলে যেও যোশেফ। শুধু ভাববে, নীলা নামের কাউকে কখনো তুমি জানতে না।'

যোশেফের দেয়া বইগুলো লুকিয়ে রেখেছে নীলা। ওগুলো যেন কখনো নাজিমের চোখে না পড়ে। ও যেন প্রশ্ন করতে না পারে—'যোশেফ কে নীলা?'

আট

শেলীর সঙ্গে আশুলিয়ায় গিয়েছিল খুব বেড়াবে বলে। হঠাৎ করেই দেখা হয়ে গেলো নীলার সাথে যোশেফের। একটা বিদেশী টিমের সাথে সে এখানে এসেছে বেড়াতে। যোশেফই উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, 'আরে নীলা, তুই?'

'তুই বা এখানে কিভাবে যোশেফ? তুই না থাকিস চট্টগ্রামে?'

'সেখান থেকেই এসেছি বেড়াতে। তা তোর খবর কী বল্?'

'তোর খবর বল্ যোশেফ। হঠাৎ করেই নিখোঁজ হয়ে গেলি যে?'

'অতি আপন জন যখন জীবন থেকে হারিয়ে যায়, তখন নিজে হারাতে দোষ কী? নাজিম সাহেব কেমন আছেন বললি না তো?'

'তাঁর কথা তো জানতে চাস নি।'

সরাসরি প্রশ্ন, 'লোকটা কেমন রে? তোকে ভালোবাসে তো?'

কথা না বলে মৃদু হাসিতে উত্তর দেয় নীলা।

'শোন্, তোর সংগে দেখা হয়ে বেশ হলো। আসলে সাধ ছিল তোকে দেখার। ঈশ্বর সেটা মিটিয়ে দিলেন।'

'তারপর?'

'তোকে বলাই হয় নি। আমি কাজ করছি যে সংস্থায় তার কাজ হলো সারাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল দেখা। এ পর্যন্ত ঘুরেছি অনেক। বলতে পারিস বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে সব দেখা হয়ে গেছে। এখন চলে যাবো অন্য কোনো দেশে।'

'ওদের সাথে অন্য দেশে না গেলেই নয় তোর?'

'এতে তোর লাভ?'

'জানি না।'

'আমি পরে বুঝেছি। চিনতে পারিস নি তোর নিজের মনটাকেই। সে যাক, নিয়তি বলেও কথা আছে। ছ'মাস পর চলে যাচ্ছি। আর হয়তো দেখা হবে না। এবার আমি ভুলতে পারবো তোকে। কারণ, একটা জিনিস উপলব্ধিতে এসেছে আমার। কাছে থাকাটা মানুষের জীবনে বড় ফ্যাক্টর। আমি তোকে ভুলতে পারছি না বাংলাদেশে আছি বলেই।'

যোশেফের সঙ্গে দেখা হওয়ায় একটা ভালো কাজ হয়েছে নীলার। ভেতরের অপরাধ বোধের জ্বালা থেকে মুক্ত করেছে যোশেফ ওকে। নীলার মনের আকাশটায় এখন স্বচ্ছতা। বারবার মনে মনে আওড়ায়—যোশেফ, তুমি ভালো থেকো। ভুলে যেও আমাকে।

• • •

রীতু আরাশিগে

খলিল মাহ্‌মুদ

উৎসর্গ :

তোকেই

লেখক-পরিচিতি

১৯৬৮ সালের ৩১ জুলাই ঢাকা জেলায় জন্ম। স্ত্রী ও দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে সুখের সংসার। এ পর্যন্ত ছয়টি গ্রন্থ বের হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য : **'অন্তরবাসিনী'** (উপন্যাস), **'খ্যাতির লাগিয়া'** (উপন্যাস), **'সুগন্ধী রুমাল'** (ছোটগল্পগ্রন্থ) ও **'অন্বেষা'** (কাব্য)।

এক

'আপনার এখান থেকে আমি বাংলাদেশে ফোন করতে চাই।'

শ্রীলংকার কুকুলেগংগা জেলার মাতুগামা উপশহরের এক টেলিফোন বুথে ঢুকে ইংরেজিতে এ কথা জিজ্ঞাসা করতেই দশ-বার বছরের কিশোরীটি তার মুখ-মণ্ডলে একটা অপূর্ব নির্মল মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো।

শ্রীলংকায় উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের সবাই ইংরেজি বলতে পারলেও দরিদ্র জনগণের ভাষা সিনহালা। দরিদ্র-সম্ভবা টেলি-অপারেটর কিশোরী তাই পরদেশী আগন্তুকের ইংরেজি বাচ্য বুঝলো না। কাজেই সে তার নিজস্ব সিনহালা ভাষায় কী যেন বলতে চাইলো, কিন্তু সেই ভাষা মেজর এজাজ রহমান চৌধুরির কাছে পাখির ভাষার মতোই দুর্বোধ্য মনে হলো।

মাত্র দুদিন হয়েছে তাঁরা শ্রীলংকায় এসেছেন। আমেরিকা, বাংলাদেশ, নেপাল, মংগলিয়া ও স্বাগতিক শ্রীলংকার যৌথ অংশগ্রহণে জাতিসংঘ মিশনে শান্তিরক্ষী বাহিনীর কার্যক্রমের ওপর প্রশিক্ষণের উদ্দেশে তাঁদের এখানে আগমন, যদিও সমস্ত ব্যয়ভার খোদ মার্কিন সরকার কর্তৃকই বহন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ থেকে আসার সময় মেজর বলে এসেছিলেন কুকুলেগংগায় পৌঁছেই বাসায় ফোন করবেন। কিন্তু এখানে আসার পর দেখা গেলো টেলিসংযোগ স্থাপিত হতে আরো চার-পাঁচ দিনের মতো সময় লাগবে। এতোদিন অপেক্ষা করা যায় না, দেশে পরিবারের সবাই খুব দুশ্চিন্তায় থাকবেন।

যেখানে মার্কিনিদের আগমন সেখানে জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গের প্রাচুর্য সুনিশ্চিত। কিন্তু আয়োজক কর্তৃপক্ষের নানাবিধ সীমাবদ্ধতা ও ব্যস্ততার দরুণ ভিনদেশীগণের কুকুলেগংগায় পৌঁছাবার সংগে সংগেই সেই প্রাচুর্যের সুব্যবস্থা হয় নি, এবং একই কারণে নিজ নিজ দেশে টেলিফোনে যোগাযোগের জন্য কাউকে ক্যাম্পের বাইরে নিকটস্থ শহরে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব হলো না।

পরদেশে প্রবেশের সাথে সাথেই কয়েকটি দরকারি কথা ও-দেশের ভাষায় শিখে নেয়া অত্যন্ত জরুরি। যেমন :

'আপনি কেমন আছেন?'

'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'একটু দয়া করে আমার কথাটি শুনবেন কি?'

'এই জিনিসটার দাম কতো?'

'আমি কলম্বো যেতে চাই।'

'অনুগ্রহ করে আমাকে ক্যান্ডি যাওয়ার পথ বলে দিন।'

মেজর মেয়েটিকে আবার জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার এখান থেকে কি বাংলাদেশে ফোন করা সম্ভব হবে?'

এ কথা বলার সংগে সংগে তাঁর বোধোদয় হয় যে, মেয়েটি হয়তো তাঁর ইংরেজি বাচন বুঝতে পারে নি। গত দু দিনে দু-একটা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা অতি সাধারণ সিনহালা শব্দ ও বাক্য শেখা হলেও টেলিফোন করার কথাটি কিভাবে বলতে হবে তা তাঁর জানা হয় নি, অথচ এখন মনে হচ্ছে এ কথাটি সর্বাগ্রে শেখা জরুরি ছিল।

কিন্তু বুদ্ধিমতী মেয়েটি তার টেলিফোনটি মেজরের দিকে এগিয়ে দিয়ে ইশারায় তার ডান পাশে দেয়ালে ঝোলানো চার্টটির দিকে নির্দেশ করে, সেখানে বাংলাদেশে ফোন করার প্রতিমিনিট কলচার্জ বাবদ ৪৫ রুপি লিপিবদ্ধ আছে।

'এটা ঠিক আছে।' বলে মেজর নিজের দিকে টেলিফোনটি টেনে এনে ডায়াল করতে থাকেন।

অপর প্রান্তে মেজরের আট বছর বয়সী কন্যা আবেগে কেঁদে ফেলে। সে বলে, 'আব্বু, তুমি এতো পরে আমার কাছে ফোন করলে কেন? আমি গত তিন দিন ধরে তোমার কথা শুনতে পাই না। তোমার জন্য আমার খুব খারাপ লাগছে। আমি তোমাকে খুব...খুউব মিস করছি আব্বু।'

এরপর মেজর তাঁর দশ বছর বয়সী ছেলের সাথে কথা বলেন। সে-ও কিশোর, কিন্তু কনিষ্ঠা ভগ্নির তুলনায় সে নিজেকে সর্বদা অধিকতর ব্যক্তিত্ববান, দায়িত্বশীল ও বোঝবান মনে করে। সে বলে, 'আব্বু, রীতু একটুও বোঝে না। তুমি তো চার সপ্তাহ পরেই চলে আসবে, তাই না আব্বু? তবু সে দিনভর তোমার জন্য কাঁদে। আমি সেজন্য ওকে অনেক বকা দিয়েছি।'

স্ত্রীর সাথে কথা হলে তিনি জানালেন ফোন করতে এতো বিলম্ব হওয়াতে গত দু দিন তিনি খুব দুশ্চিন্তায় কাটিয়েছেন।

ওপরের কথাগুলো দশ মিনিটের মধ্যেই শেষ করে মেজর অত্যন্ত তৃপ্তি ও সুখের সাথে জিন্‌সের পেছন পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করেন। মানিব্যাগের মুখ খুলতে খুলতে তিনি কিশোরীর দিকে তাকান, সে তখন এক পায়ে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে অপলক চোখে মেজরের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে—কী অদ্ভুত সুনির্মল তার হাসিভরা মুখখানি, সমস্ত মুখাবয়ব কী এক করুণ মায়াবী মমতায় ছেয়ে আছে—অকস্মাৎ মেয়েটির চোখের ওপর তাঁর চোখ পড়তেই মেজরের বুকটা হু হু করে ওঠে—ঠিক এ রকম, অবিকল এ রকম এক জোড়া চোখ তিনি তাঁর ঘরে সুদূর বাংলাদেশে রেখে এসেছেন, সেই চোখ দুটি এখন তাঁর জন্য দিনরাত অশ্রুতে ভিজে থাকে।

'স্যার...।'

ইউনিভার্সেল এই ইংরেজি সম্বোধনে মেজরের ধ্যানভঙ্গ হয়। তিনি মানিব্যাগ থেকে পাঁচটি এক শ রুপির নোট বের করে কিশোরীর হাতে দিয়ে সংকেতে বোঝাতে চেষ্টা

করেন, 'বাড়তি পঞ্চাশ রুপি ফেরত দিতে হবে না। দেশে আমার একটা কন্যা আছে, তার চোখ দুটো তোমার চোখের মতো। তার কথা মনে করে আমি তোমাকে অতিরিক্ত এই পঞ্চাশ রুপি বকশিস দিচ্ছি। তা দিয়ে তুমি চকোলেট কিনে খেয়ো।'

কিন্তু কিশোরী এ সংকেতের কোনো কিছুই বুঝলো না। সে পাঁচটি দশ রুপির নোট মেজরের দিকে বাড়িয়ে দেয়। ততোক্ষণে টেলিফোন বুথে আরো দু-চারজন শ্রীলংকান নাগরিক টেলিফোন করার উদ্দেশে এসে জড়ো হয়েছেন। কিন্তু কেউ তাঁর ইংরেজি বাচন ও সংকেতের অর্থ উদ্ধার করতে পারলেন না। অবশেষে পঞ্চাশ রুপি ফেরত নিয়ে মানিব্যাগে গুঁজলেন এবং কিশোরীর মাথায় দু বার হাত বুলিয়ে গুডবাই বলে বিদায় নিলেন।

রাতে একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলেন মেজর। টেলিফোন বুথের সামনে গিয়ে তিনি অনর্গল মেয়েটির সাথে কথা বলছেন। মেয়েটির ইংরেজি বাচন শুনে তাঁর মনেই হচ্ছে না যে সে কোনো দরিদ্র ঘরের ইংরেজি না-জানা টেলিফোন অপারেটর।

'তুমি কতোদিন ধরে এখানে আছো, খুকি?'

'তিন মাস হলো।'

'তুমি কি স্কুলে যাও?'

'আমি স্কুলে যাই না। আমার মা-বাবা কেউ জীবিত নেই। এটা আমার এক দূর সম্পর্কীয় খালুর টেলিফোন বুথ। মাসিক মাইনে নেই। পেটে-ভাতে তাঁদের বাসায় থাকি, আর এখানে কাজ করি।'

'আমি খুবই দুঃখিত যে তুমি একটা এতিম বালিকা।'

'আপনাকে ধন্যবাদ, আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্য।'

'তোমার নামটা কি আমাকে বলবে, খুকি?'

'নিশ্চয়ই। আমার নাম আরাশিগে।'

নামটি মেজরের কাছে খুব স্পষ্ট হলো না। ভ্রু-যুগল ও কপাল কুঞ্চিত করে মেয়েটির নাম পুনরাবৃত্তি করে বললেন, 'আরিচেগা? '

'না না, আপনি ভুল উচ্চারণ করছেন। আমি কাগজে লিখে দিচ্ছি। Arachchige. উচ্চারণ করুন—আ-রা-শি-গে।'

মেজর মেয়েটির মতো টেনে টেনে উচ্চারণ করলেন, 'আ-রা-শি-গে। হয়েছে?'

'চমৎকার।'

'আচ্ছা আরাশিগে, তুমি কি কখনো বাংলাদেশের নাম শুনেছো?'

'জি না স্যার।'

'স্যার' কথাটি উচ্চারিত হবার সাথে সাথেই তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। মানুষ বাস্তবে যা দেখে না বা শোনে না, স্বপ্নেও তা দেখতে কিংবা শুনতে পায় না। কিন্তু 'আরাশিগে' নামটি কিভাবে তাঁর স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে গেলো তা তিনি ভেবে পাচ্ছেন না। এখনো মেজরের কানের কাছে মেয়েটির নিজকণ্ঠে উচ্চারিত 'আরাশিগে' নামটি গানের সুরের মতো বাজছে।

মেয়েটির নাম কি সত্যিই আরাশিগে? এ কথা যখন ভাবছেন তখন হঠাৎ করে তাঁর একটা কথা মনে পড়ে যায়—টেলিফোন বুথের দেয়ালে কলচার্জের যে চার্টটি ঝোলানো ছিল, তার ওপরে কলম দিয়ে অসুন্দর ইংরেজি অক্ষরে এই নামটি লেখা ছিল।

কিন্তু এ থেকেই ধরে নেয়া যায় না যে মেয়েটির নাম আরাশিগে। প্রথমত, মানুষের নাম আরাশিগে হতে পারে এটা নিয়েও তাঁর মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। দ্বিতীয়ত, এটা যে একটা মেয়ে-নাম তা-ও নিশ্চিত করে বোঝার উপায় নেই।

মেয়েটার নাম জানতে মেজরের খুব ইচ্ছে করতে লাগলো, তার চাইতেও মেয়েটাকে দেখার ইচ্ছেটা তাঁর প্রবল হতে থাকলো।

কিন্তু এর পরের দুটি সপ্তাহ খুব ব্যস্তভাবে কাটলো। ইতোমধ্যে আবাসিক-ক্যাম্প এলাকায় টেলিসংযোগ স্থাপিত হয়েছে। দু-তিন দিন পরপর মেজর বাংলাদেশে পরিবারের সবার সাথে কথা বলেন।

'রীতু মামণি, তুমি ভালো আছো?'

'আমি ভালো আছি। তুমি?'

'আমিও। তুমি কি এখনো আমার জন্য কাঁদো?'

'কাঁদি। কিন্তু সব সময় না। রাতে ঘুমুবার সময় কাঁদি, আর ভাইয়া যখন আমাকে মারে তখন কাঁদি।'

'তুমি একটুও কেঁদো না। আমি বাড়ি এসে তোমার ভাইয়ার বিচার করে দিব। ঠিক আছে?'

'হুঁম। ওকে কান ধরিয়ে টেবিলের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখবে।'

'আচ্ছা রাখবো।'

'তারপর তিনবার ওঠ্-বস্ করাবে।'

'করাবো।'

'উঁহু, তিনবার না, দুইবার। তিনবার করালে ও বেশি কষ্ট পাবে।'

'আচ্ছা, তুমি যা বলবে তাই করবো।'

'তারপর ওকে বাথরুমে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিবে।'

'হুঁম দিব।'

'আব্বু, আর কতোদিন পর আসবে তুমি?'

'আরো দু সপ্তাহ পরে।'

'দু সপ্তাহে কি চৌদ্দ দিন হয়?'

'হ্যাঁ।'

'আমার জন্য কিন্তু চকোলেট আনবে। ভাইয়ার জন্য কিচ্ছু আনবে না।'

'ঠিক আছে। মামণি শুনতে পাচ্ছো?'

'শুনছি তো।'

'এখানে তোমার মতো একটা মেয়েকে দেখেছি।'

'সে কী করে?'

'টেলিফোনে কাজ করে।'

'একদম আমার মতো!'

'ওর চোখ দুটো তোমার চোখের মতো। তুমি যখন ওর সমান হবে তখন তোমাকে ওর মতোই দেখাবে।'

রীতু খিলখিল করে হেসে উঠে বলে, 'তাহলে তো দুটো রীতু হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, তবে ওর নাম কিন্তু রীতু নয়, আরাশিগে।'

আরাশিগেকে নিয়ে প্রতিবারই দু-একটা কথাবার্তা টেলিফোনে হয়। মেজরের স্ত্রীও তাকে নিয়ে খুব উৎসাহ প্রকাশ করেন। দেশে ফেরত যাবার সময় আরাশিগের একটা ছবিও সঙ্গে নিতে বলে দিলেন।

একদিন মেজর সামিরা নামক এক শ্রীলংকান অফিসারকে সংগে নিয়ে আরাশিগের টেলিফোন বুথে এলেন বাংলাদেশী মেজর। বুথে ঢোকামাত্র দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালো মেয়েটি এবং বাংলাদেশী মেজরকে যে সে চিনতে পেরেছে তা সে শ্রীলংকান মেজরের মাধ্যমে জানিয়ে দিল। দ্বিতীয়বারের মতো তার বুথে আগমন করায় সে যারপরনাই গর্বিত ও সম্মানিত বোধ করছে।

আগের বারের মতো আজ পারস্পরিক কথোপকথনে কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে না, কেননা, মেজর সামিরা আজ দোভাষীর কাজটি করে দিচ্ছেন।

'তোমার চোখ দেখলে আমার মেয়ের কথাটি মনে পড়ে যায়।'

'আপনার মেয়েটির বয়স কতো?'

'আট বছর।'

'আমার বয়স বিশ বছর।'

মেজর একটু বিব্রত হোন। মেয়েটির বয়স দশ-বারর মতো দেখায়, সেভাবেই এ যাবত তার সাথে আচরণ করছিলেন তিনি।

মেজর বলেন, 'তোমার সাথে আমার মেয়েটির প্রচুর মিল। এতো মিল যে সে যখন তোমার বয়সে পদার্পণ করবে তখন তাকে অবিকল তোমার মতো দেখাবে।'

আরাশিগে সলজ্জ হেসে নিচের দিকে তাকায়।

'তুমি কি বাংলাদেশে বেড়াতে যাবে, আমার প্রিয় কন্যা?'

'আমার বাবার প্রচুর অর্থকড়ি নেই। থাকলে নিশ্চয়ই আপনার মতো আমার আরেকজন বাবার দেশে বেড়াতে যাওয়াটা আমার জন্য বেজায় সুখকর হতো।'

'তুমি কদ্দূর লেখাপড়া করেছো?'

'আমি লেখাপড়া করতে পারি নি। আমার আট বছর বয়সে আমার মা মারা যান। বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন। তিনি বর্তমানে একজন অকাল-অবসরপ্রাপ্ত পঙ্গু সার্জেন্ট। জাফনা যুদ্ধে তিনি উরুতে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন।'

দুই মেজরই অবাক হোন এবং তার প্রতি সহানুভূতি জানাতে থাকেন।

মেয়েটি বলে, 'পেনশনের টাকার একটা অংশ দিয়ে এই টেলিফোন বুথটি করা হয়েছে। আমাদের চার ভাইবোনের মধ্যে আমিই বড়। বাকিরা লেখাপড়া করছে বলে এ কাজটি আমাকেই করতে হয়।'

'তোমার প্রতি আমার অশেষ সহানুভূতি রইলো বাছা। তুমি তোমার মনোবল, পরিশ্রম আর কর্মদক্ষতা দিয়ে তোমাদের সংসারটাকে টিকিয়ে রাখছো, তোমার মতো আর মেয়ে হয় না।'

'আপনাকেও অশেষ ধন্যবাদ।'

'তুমি আমার প্রিয়তমা কন্যার মতো। আমি এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে তোমাকে একটা সামান্য উপহার দিয়ে যেতে চাই। আমি খুবই খুশি হবো যদি তুমি আমাকে তোমার পছন্দের জিনিসটার কথা বলো, আমার আদরের কন্যাটি।'

'মহোদয়, আপনি আপনার এ মেয়েটিকে একটা উপহার দেয়ার কথা ভেবেছেন, এজন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ এবং আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। তবে দয়া করে আমাকে কিছু দেবার জন্য ব্যস্ত হবেন না, আপনি সারাটি জীবন আমার হৃদয়ে অবস্থান করবেন, ঠিক আমার জন্মদাতা পিতার মতোই।'

'আমার প্রিয় কন্যা, তোমার কথায় আমি খুবই সন্তুষ্ট হলাম।'

নিজ কন্যা কী পেতে ভালোবাসে তা তো তাকে জিজ্ঞাসা করা যায়ই। সলজ্জ বালিকা সবিনয়ে উপহার গ্রহণে অনিচ্ছার কথা জানালেও মেজর মনে মনে স্থির করলেন, দেশে ফেরত যাবার আগে এ মেয়েটিকে তিনি অবশ্যই একটা উপহার প্রদান করে যাবেন এবং কী দিবেন তা-ও তিনি স্থির করে ফেললেন।

কলম্বোর সর্বাধুনিক 'ম্যাজেস্টিক সিটি' শুধু শ্রীলংকায় তৈরি সামগ্রীর জন্যই বিখ্যাত নয়, বিশ্বের প্রায় সকল উন্নত ব্র্যান্ডের সামগ্রীই এখানে পাওয়া যায়। এসব সামগ্রীর আকাশ-ছোঁয়া মূল্যের কারণে ম্যাজেস্টিক সিটি মূলত শ্রীলংকান উচ্চবিত্ত ও অভিজাত শ্রেণী এবং ধনিক পর্যটকদের পারচেজ সেন্টার হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

ম্যাজেস্টিক সিটিতে গিয়ে নিজ পরিবারের সদস্যদের জন্য মেজর বেশ কিছু দুর্লভ ও আকর্ষণীয় উপঢৌকন ক্রয় করলেন। কিন্তু মনে মনে যা তিনি খুঁজছেন তা কোথাও পাচ্ছেন না। মাঝখানে অবশ্য 'হাউজ অব ফ্যাশন' থেকেও ঘুরে এলেন। হাউজ অব ফ্যাশনকে কলম্বোর সবচাইতে ব্যস্ত শপিং মল বলা যেতে পারে। এখানে নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে সবার জন্যই সর্বাধুনিক ফ্যাশনের পোশাকাদি ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যায়।

সন্ধ্যায় ক্যাম্পে ফেরার আগ দিয়ে আরেকবার সেই ম্যাজেস্টিক সিটিতে ঢুকলেন এবং দুটি দোকান পরই আরাশিগের জন্য চমৎকার একটা পোশাক পেয়ে গেলেন, ঠিক যেমনটি তিনি খুঁজছিলেন, যেটি পরলে আরাশিগেকে রাজকুমারীর মতো মনে হবে, রীতু যেদিন বড় হবে সেদিন ঠিক যেরকম তাকে দেখবেন বলে তিনি সর্বদা কল্পনা করেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরের দিনগুলো এতোই ব্যস্তভাবে কাটতে লাগলো যে দম ফেলবার মতো একদণ্ড অবসর পাওয়া গেলো না। বাংলাদেশে ফেরত যাবার দিন কলম্বো বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে কিছুটা ঘুরে মাতুগামা উপশহরে আসা হলো আরাশিগেকে উপহারটা দেয়ার জন্য। কিন্তু আরাশিগের টেলিফোন বুথ তখনো খোলা হয় নি। আশেপাশের দোকানও খোলা ছিল না। কিছুক্ষণ দিগ্বিদিক পায়চারি করার পর জনৈক

পথচারীকে জিজ্ঞাসা করতেই জানা গেলো যে, এখানে আজ ছুটির দিন। মেজরের মনটা খুব বেদনার্ত হয়ে ওঠে।

একটা পথ অবশ্য আছে, এর আগে যে শ্রীলংকান মেজরকে নিয়ে এখানে আসা হয়েছিল, সেই মেজর সামিরার কাছে এটা পাঠিয়ে দেয়া যেতে পারে, তিনি এটা ঠিক আরাশিগের কাছে পৌঁছে দেবার সুব্যবস্থা করবেন। এই ভেবে তাঁরা বিমানবন্দরের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন।

মাতুগামা উপশহর পার হয়েই মেজরের মনে পড়লো যে আজও আরাশিগের নাম সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেলো না। শেষবার যখন মেজর সামিরাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তখন কতো কথা হলো মেয়েটার সঙ্গে, অথচ তার নামটাই শুধু জিজ্ঞাসা করা হলো না। আরাশিগে নামটি তাঁর মনের ভিতরে এতোখানিই গেঁথেছিল যে তার সাথে কথা বলার সময় মেজরের মনেই হয় নি—তিনি মেয়েটির নাম জানেন না। সেদিন ক্যাম্পে ফেরত যাবার পর থেকেই মেয়েটির নাম জানার জন্য তাঁর মনের ব্যাকুলতা ক্রমশ বাড়ছিল। তিনি অবশ্য ধরেই নিয়েছিলেন যে ওর নাম আরাশিগে হওয়াটা খুবই সম্ভব—এমনকি টেলিফোন বুথের নামও যদি আরাশিগে শীর্ষক হয় তাহলেও ধরে নেয়া যায় যে আরাশিগের নামের ওপরেই টেলিফোন বুথের নামকরণ করা হয়েছে।

মাঝামাঝি জায়গায় আসার পর একটা উটকো ঝামেলায় পড়তে হলো, জিপ গাড়ির পেছনের একটি চাকা বার্স্ট হয়ে গেছে। ওটি বদলাতে প্রায় মিনিট বিশেকের মতো সময় চলে গেলো। ক্যাম্প থেকে সবাইকে নিয়ে একই কনভয় যোগে সরাসরি রাস্তায় অন্যান্য বাংলাদেশী এবং বাকি দেশগুলোর লোকজন রওনা হয়েছে। কেবল তাঁর জন্য আলাদা একটি জিপ যোগে এই বিশেষ ব্যবস্থাটি করা হয়েছিল, কারণ এখানে আরাশিগে নামক তাঁর একটি মেয়ে আছে এ কথাটি অনেকে জানতে পেরেছিলেন; বিদায়ের দিন সেই মেয়েটির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হোক কর্তৃপক্ষের জনৈক অফিসারের এই অতিমানবিক সৌজন্যবোধ জাগ্রত হয়েছিল।

মাতুগামা উপশহরে যেতে বাড়তি রাস্তা অতিক্রম করতে হবে এটা কর্তৃপক্ষ জানতেন, কিন্তু কনভয়বিহীন মাত্র একটি জিপ যোগে দ্রুততর গতিতে গাড়ি চালিয়ে মূল কনভয়ের আগেই বিমানবন্দরে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হবে বলে সকলের ধারণা ছিল। কিন্তু গাড়ির চাকা পাংচার ও বদলিসংক্রান্ত সময়ক্ষেপণের জন্য বিমান উড্ডয়নের পূর্ব-সময়টুকু মনে হতে লাগলো দ্রুত সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে। সঙ্গী শ্রীলংকান অফিসার সহ মেজরের মনে টেনশন বাড়তে থাকে।

বিমানবন্দরে পৌঁছে দেখেন যাবতীয় ফর্মালিটি সম্পন্ন করে সবাইকে ভিতরে পৌঁছে দিয়ে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় কনভয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্নেল তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁকে দেখেই অফিসারের মুখাবয়ব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সামনে এগিয়ে এসে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করেন, 'হ্যালো মেজর, আশা করি আপনার কন্যার সাথে শেষ সাক্ষাৎটি খুব মধুময় হয়েছে।'

'দুঃখিত কর্নেল, তার দেখা মেলে নি। তার দোকান বন্ধ ছিল, ঐ মার্কেটে আজ পূর্ণ ছুটির দিন কিনা।'

'ওউফ, ভেরি স্যাড।'

এ অবস্থায় তাঁর প্রতি কর্নেলের অপ্রসন্ন অভিব্যক্তির পরিবর্তে অসাধারণ সৌজন্য প্রকাশে বাংলাদেশী মেজর খুব মুগ্ধ হলেন। কিন্তু সময় খুবই সংক্ষিপ্ত, সঙ্গী সেনা-জোয়ানরা ধরাধরি করে ব্যস্তভাবে তাঁর মালামাল নামাচ্ছেন, মেজর নিজেও তাঁদের সাথে যোগ দিলেন।

বিমান উড্ডয়নের সঙ্গে সঙ্গে মেজরের মনে পড়লো যে ভুলবশত এবং ব্যস্ততার জন্য আরাশিগের জন্য কেনা উপহারটা তাঁর সঙ্গেই চলে এসেছে।

এর পরের বছরখানেক সময় খুব হাসি-আনন্দে কেটে যেতে লাগলো মেজর পরিবারে। প্রথম-প্রথম খুব বিচ্ছিন্নভাবে তাঁদের আলোচনায় আরাশিগের নাম উচ্চারিত হতো। এরপর আরাশিগে তাঁদের আলোচনায় এমনই একটা স্থান জুড়ে নিল যে মনে হতে পারে আরাশিগে এই পরিবারেরই একটা অতি আদরণীয় কন্যা, যে তার পিতামাতা ও কনিষ্ঠ ভাইবোনকে ছেড়ে দ্বীপদেশীয় শ্রীলংকায় প্রবাসী হয়েছে।

আরাশিগের জন্য কেনা ঝলমলে পোশাকের প্যাকেটটা একদিন খোলা হয়েছিল। শখ করে রীতুকে যখন পরানো হলো তখন সে খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেলো। আরাশিগে যদিও বয়সে তার চেয়ে বার বছরের বড়, কিন্তু তার শারীরিক কোষ বৃদ্ধির হার আরাশিগের চেয়ে বেশি এবং তজ্জন্য পরবর্তী বছর তিনেকের মধ্যেই সে আরাশিগের সমান শারীরিক গঠন অর্জন করতে সক্ষম হবে বলেই মেজর মনে করেন।

রীতুকে পরানোর পর পোশাকটি পুনরায় প্যাকেটবন্দি করে রাখা হয়েছে। শ্রীলংকা থেকে প্রতি বছর অসংখ্য সেনা অফিসার বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে আসেন। এমনকি বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতেও কমিশন লাভের জন্য বহু শ্রীলংকান জেন্টলম্যান ক্যাডেট প্রশিক্ষণরত আছেন। তাঁদের যে কোনো একজনের মাধ্যমে এই প্যাকেটটি শ্রীলংকায় মেজর সামিরার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে। তিনি অবশ্যই আরাশিগের কাছে ওটি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবেন।

কিন্তু বিভিন্ন ব্যস্ততার দরুণ অতি সহসাই কোনো শ্রীলংকান সেনাসদস্যের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হলো না। ঠিক এমন সময়ে মেজর পরিবারে এক বিষাদময় ও হৃদয়বিদারক কাহিনীর সূচনা হতে থাকলো। এবং পরবর্তী দু বছর সময়টাতে সৃষ্টি হলো তাঁদের পরিবারের করুণতম ইতিহাস।

দুই

পনর বছর পরের কথা।

শ্রীলংকান সরকারের আমন্ত্রণে শ্রীলংকায় এসেছেন মেজর জেনারেল এজাজ রহমান চৌধুরি। এদেশে এখনো তামিল টাইগারদের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের সাথে সফল

শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন পৃথিবীর ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এল.টি.টি.ই.দের সাথে কিভাবে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত করা যায় সে ব্যাপারে কলম্বোয় একটি সিম্পোজিয়ম অনুষ্ঠিত হবে। নরওয়ে, ভারত, আমেরিকা ও বাংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রায় দশটি দেশের প্রতিনিধিগণ এই সিম্পোজিয়মে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন। বাংলাদেশের ওপরও একটি বিশেষ কেইস স্টাডি থাকবে যাতে মেজর জেনারেল এজাজ রহমান চৌধুরি তাঁর বিশেষজ্ঞ মতামত উপস্থাপন করবেন।

তিনদিনব্যাপী সিম্পোজিয়মের প্রাত্যহিক কর্মসূচিতে দম ফেলবার ফুরসত নেই। ইতোমধ্যে তিনি মেজর সামিরার অনুসন্ধান করেছেন। পনর বছর আগের কথা, তাঁরও এতোদিনে মেজর জেনারেল হয়ে যাওয়ার কথা, নিদেনপক্ষে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল। বয়স ও চাকরির ক্ষেত্রে অবশ্য সামিরা এজাজ রহামন চৌধুরির চেয়ে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। সেই হিসেবে অবশ্য এমনও হতে পারে যে এতোদিনে তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন।

মেজর সামিরার খোঁজ নিতে কর্তৃপক্ষ প্রচুর তৎপরতা প্রদর্শন করলেন। একই নামে আরো বহু অফিসার আছেন। কোন মেজর সামিরা পনর বছর আগে কুকুলেগংগায় বহুজাতিক সামরিক শান্তিরক্ষী প্রশিক্ষণে দায়িত্ব পালন করেছিলেন তার হদিস মিললো না।

সিম্পোজিয়মে এক কর্নেলের সাথে আলাপ প্রসঙ্গে মেজর সামিরার কথা তুলতেই তিনি উজ্জ্বল হয়ে বলে উঠলেন, হ্যাঁ, তিনি ঐ মেজর সামিরাকে চিনেন। ঐ সময় তিনি ক্যাপ্টেন ছিলেন, তাঁর নাম কালনা, মেজর সামিরার অধীনে থেকেই তিনি ঐ সময় মহড়ায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে দুঃখের বিষয়টি হচ্ছে সামরিক মহড়ার পরের বছরই মেজর সামিরা জাফনায় এক দুর্ধর্ষ যুদ্ধের সময় বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ হারান।

জেনারেলের মন খারাপ হয়। একজন পুরনো বন্ধুর পনর বছর আগেকার স্মৃতি মনে করার চেষ্টা করলেন। সেসব এখন কেবলই দুঃখ দিয়ে যায়।

তৃতীয় দিন বেলা এগারটায় সিম্পোজিয়মের সমাপনী অধিবেশন শেষ হলো। একই দিন রাত দশটায় জেনারেলের ফিরতি ফ্লাইট। বাসস্থান থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ বের হয়ে যেতে হবে, তার আগের সাত-আট ঘণ্টা সময় সম্পূর্ণ তাঁর নিজের, পুরোটা সময় তাঁর অখণ্ড অবসর।

কিন্তু প্রকৃত অর্থেই তা অখণ্ড অবসর ছিল না। দেশ থেকেই তিনি কিছু পরিকল্পনা করে এসেছেন। এতোটুকু সম্পূর্ণ নিজস্ব সময় হাতে পেলেই তিনি সেই পরিকল্পনা মতো কাজটি করতে বেরুবেন—কলম্বো শহর থেকে সড়কপথে প্রায় আড়াই ঘণ্টা যাত্রার পর সেই মাতুগামা উপশহরে যাবেন, পনর বছর আগে সেখানে তিনি তাঁর আরাশিগেকে দেখে গেছেন, তাকে পুনর্বার আরেক নজর দেখবার জন্য সেই কতোকাল থেকে তাঁর বুকটা অবিরাম হাহাকার করছে।

কিন্তু মাতুগামা অনেক বদলে গেছে। ছোট উপশহরটি এখন চারদিকে বহুদূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। অত্যাধুকিক অট্টালিকা গড়ে উঠেছে, সারি সারি বিলাশবহুল এ্যাপার্টমেন্ট, ফ্যাশনেবল দোকানপাট, রাস্তাঘাট—সবকিছু বদলে গেছে, উন্নত হয়েছে।

আরাশিগের টেলিফোন বুথটি ঠিক কোন জায়গায় ছিল তা ঠাওর করা গেলো না। সেদিনের আরাশিগেকে আজও এখানে অবিকল সেদিনের মতোই পাবেন—তিনি অবশ্য

আদৌ এতোখানি আশা করেন নি। অবশ্য তার টেলিফোন বুথটিও যে খুঁজে পাওয়া যাবে এ ব্যাপারেও তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন না। তবে একটা ব্যাপারে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন, আরাশিগে তাঁকে দেখামাত্রই চিনতে পারবে, কখনো কোথাও এ রকম হয় কিনা বা হয়েছে কিনা তা তিনি জানেন না, তিনি খুব সুনিশ্চিত ছিলেন যে আরাশিগেও তাঁকে দেখার জন্য অন্তপ্রাণ হয়ে উঠেছিল। সেই পনর বছর আগের দেখা, কিন্তু তাঁকে দেখামাত্রই সে টেলিফোন বুথ থেকে লাফিয়ে ছুটে এসে জেনারেলের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

প্রায় ঘন্টাখানেক খোঁজাখুঁজির পর ক্ষুদ্র একটা তথ্য পাওয়া গেলো—তা হলো, বহুদিন আগে শহরের মাঝামাঝি স্থানে বেশ কয়েকটা টেলিফোন বুথ ছিল, যার একটির নাম ছিল 'আরাশিগে টেলিফোন সেন্টার'।

কিন্তু শহরের মাঝামাঝি জায়গা, পনর বছর আগে যা উপশহরের প্রান্ত থেকেও কিছুটা দূরে অবস্থিত ছিল, আজ বড় বড় দালান-কোঠায় ভরে গেছে।

এমন কি হতে পারে না যে এসব দালানের একটির মালিক আরাশিগে নিজে? সময় তো বদলায়, যে কারোরই।

কিন্তু আরাশিগের সন্ধান মিললো না।

মাত্র কিছুক্ষণ জেনারেল ভাবলেন। তারপর তাঁর সঙ্গী অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের দেশে কি বৃক্ষরোপণের কোনো প্রচলন আছে?'

'শ্রীলংকায় এ ধরনের প্রচলন গড়ে ওঠে নি। কারণ, আমাদের পুরো দেশটাই বৃক্ষে পরিপূর্ণ। প্রাকৃতিকভাবেই এখানে সব গাছ জন্মায় ও বড় হয়।'

'কিন্তু তবুও আমি একটা গাছ রোপণ করতে চাই।'

'এটা করার জন্য সর্বদাই আপনাকে স্বাগতম।'

শ্রীলংকায় বটগাছের সংখ্যা কেমন তা জেনারেলের জানা নেই। তাঁর ইচ্ছে ছিল একটা বটবৃক্ষের চারা রোপণ করবেন। কিন্তু বটবৃক্ষ কেন, অন্য কোনো গাছের চারা সংগ্রহ করাও সহজ নয়, কেননা, এখানে কোনো নার্সারি নেই।

তীক্ষ্ণ প্রত্যুৎপন্নমতি সম্পন্ন সঙ্গী অফিসার ত্বরিত জেনারেলকে সঙ্গে নিয়ে শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে এলেন। স্থানীয় এক লোকের সাহায্যে রাস্তার ধার থেকে একটা অজানা চারাগাছ উত্তোলন করলেন।

'আমি এটা কোথায় রোপণ করতে পারি?' জেনারেল জিজ্ঞাসা করেন তাঁর সঙ্গী অফিসারকে।

'মাতুগামা সবচাইতে উপযুক্ত স্থান হয়', সঙ্গী অফিসার বলেন, 'কিন্তু সেখানে এটা রোপণ করবার জন্য কোনো পতিত জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

জেনারেল আর কিছু বলেন না। চারাটি সমেত গাড়িতে উঠে কলম্বোর উদ্দেশে যাত্রা শুরু করতে বলেন।

মাতুগামা থেকে বের হয়ে মিনিট দশেক গাড়ি চালাবার পর রাস্তার এক ধারে একটা ফাঁকা জায়গা পাওয়া যায়। সেখানে গাড়ি থামাতে বললেন জেনারেল।

'আমি যদি ঐ মাঠের মাঝখানটায় এই চারাগাছটি রোপণ করি তাহলে কেমন হয়?' জেনারেল জিজ্ঞাসা করেন।

'উত্তম প্রস্তাব। আমার মনে হয় এটা পতিত জায়গা। এখানে আগামী পঞ্চাশ বছরেও বসতি গড়ে উঠবার কোনো আশঙ্কা নেই।' সঙ্গী অফিসার বলেন।

'তাহলে অনুগ্রহ করে এখানে এটা রোপণ করবার ব্যবস্থা করুন।'

গ্রামবাসীদের সহায়তায় অজানা বৃক্ষের চারাটি ওখানে রোপণ করে কলম্বোর উদ্দেশে পুনরায় গাড়িতে উঠে বসলেন।

সমস্ত রাস্তা অত্যন্ত করুণ নীরবতার মধ্য দিয়ে পার করে নিজ কক্ষে ফেরত এলেন জেনারেল। বিমানবন্দরে যাওয়ার আগে আরো ঘন্টা দুয়েক সময় অবশিষ্ট আছে। ইচ্ছে করলে তিনি শহরে বেরুতে পারেন। কিন্তু বেরুবেন না। ঘোরাঘুরির অভ্যাস তাঁর আগে ছিল। তাঁর ছেলেমেয়েরা যখন ছোট ছিল স্ত্রীসহ তাদের নিয়ে তিনি প্রচুর ঘুরতে বেরুতেন। প্রায় বছর খানেক ভোগান্তির পর যে বছর রীতুর ক্যান্সারে মৃত্যু হলো মূলত সে-বছর থেকেই তিনি অনেক গুটিয়ে গেছেন—বহুদিন পর্যন্ত তাঁর কেবলই মনে পড়তো, তিনি গোসল সেরে বাইরে বেরিয়েছেন, রীতু দৌড়ে ছুটে এসে তাঁর শরীর শুঁকছে আর বলছে, 'আব্বু, তোমার শরীরে কী যে ঘ্রাণ! এতো ঘ্রাণ কি সাবানে হয়? আমার হয় না কেন?'

রীতুর মৃত্যুর পরের বছর যখন তাঁদের ছেলেটাও চলন্ত বাসের তলায় পিষ্ট হয়ে মারা গেলো—তার পর থেকে তিনি অন্তরে অন্তরে শুষ্ক ধুধু মরুভূমি হয়ে আছেন। তাঁর কিছুই ভালো লাগে না। ছোট একটা মেয়েকে দত্তক নিয়েছেন। মেয়েটির আসল নাম পালটে তার নাম রেখেছেন রীতু আরাশিগে। রীতু আরাশিগে খুব অদ্ভুত মেয়ে। রীতুর মতোই সে বড্ড জেদী। এতোটা জেদী ও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে সে দিনে দিনে যে মাঝে মাঝেই সে উচ্চস্বরে চেঁচিয়ে বলে ওঠে, 'আমার নাম রীতু আরাশিগে রেখেছো কেন, আমার নাম রেহানা।'

জেনারেলের তন্দ্রা ছুটে যায়। আসলে রীতু আরাশিগে কখনোই বলে নি, 'আমার নাম রীতু আরাশিগে রেখেছো কেন, আমার নাম রেহানা।' এ কথাটি তিনি তন্দ্রার মধ্যে স্বপ্নে শুনেছেন।

তিনি আজকাল খুব নিষ্ঠুরও হয়ে উঠেছেন। ই-মেইল, ফোন, ইত্যাদি কতো সুবিধাদি আছে, অথচ দেশে একবারও ফোন করেন নি—এ কথা মনে হতেই তাঁর মন খুব খারাপ হয়ে যায়। হঠাৎ বোধোদয় হয়, হাতের কাছেই টেলিফোন, তিনি ডায়াল করতে থাকেন।

জেনারেলের স্ত্রী অপর প্রান্ত থেকে বলে ওঠেন, 'কী ব্যাপার, এতো ঘন ঘন ফোন করছো কেন? এরই মধ্যে দুবার হয়ে গেলো। খুব খারাপ লাগছে?'

'না না, খারাপ লাগছে না। রীতু আরাশিগের হাতে দাও। ওর জন্য কী কী আনবো জেনে নিই।'

'রীতু আরাশিগে কে?'

'ঐ যে আমাদের দত্তক মেয়েটা।'

'তুমি যে কী! রীতু আরাশিগে সেই কবে চলে গেছে না? আর ওর নাম তো রীতু আরাশিগে ছিল না, ওর নাম ছিল আরিশেগা। এখনো তুমি ওর কথা মনে রেখেছো? এসব কথা কেন তুমি এতো মনে করো? এসব ভাবতে ভাবতেই তুমি শেষ হয়ে গেলে। তুমি আর

ফোন করো না লক্ষ্মীটি, চোখ বন্ধ করে সারাক্ষণ শুধু আল্লাহ্‌র নাম জপবে, বুঝেছো? তবেই দেখবে তোমার ঠিক সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি।'

জেনারেলের আজকাল যেন কিছুই মনে থাকে না। তাঁর কি মাথায় কিছু ঘটেছে? হয়েছে? তাঁর হাতে সর্বদাই একটা মোবাইল থাকে। বাসা থেকে স্ত্রী ফোন করেন, এখান থেকে তিনি। প্রতিদিনই তিনি দু-একবার করে স্ত্রীর সাথে কথা বলছেন, কিন্তু এখন তাঁর সেসব কিছুই মনে পড়ছে না। তাঁর কী হয়েছে? মাতুগামায় গেলেন, আরাশিগেকে খুঁজলেন, চারা রোপণ করলেন, সব মনে পড়ে, কিন্তু তারপরেও মনে হচ্ছে তাঁর মাথায় সবকিছু জট পাকিয়ে আসছে। মদ্যপান করলে মানুষের এমন হয় অপরাপর বন্ধুদের কাছে তিনি শুনেছেন, নিজে যদিও জীবনে এক ফোঁটা মদ চেখে দেখেন নি। তিনি ভেবেই পাচ্ছেন না তাঁর এরূপ স্মৃতিভ্রম হচ্ছে কেন। তিনি কি খুবই ক্লান্ত?

অতি সত্বর বিশ্রাম নেয়া দরকার, অতি শীঘ্র। জেনারেল মনে মনে ভাবেন।

দরজায় টোকা দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সঙ্গী অফিসার কক্ষে প্রবেশ করেন। বলেন, 'মহোদয়, আপনার জন্য কি সামান্য চা-নাস্তার ব্যবস্থা করবো?'

'নো নো ইয়াং ম্যান, আরেকটু পরে তো ডিনারই করবো। তুমি বরং একটু বসো, তোমাকে আমি একটা কাজ দিতে চাই, আশা করি হাসি মুখে তা করবে।'

'নিশ্চয়ই মহোদয়। দয়া করে আপনার কাজের কথাটি আমাকে বলুন।'

'আজ যেখানে আমি চারাটি রোপণ করে এলাম, তুমি আরেকবার সেখানে যাবে। কিন্তু তার আগে আরেকটা কাজ করবে। আমি এ কাগজটায় লিখে দিচ্ছি, একটা টিনবোর্ড বা অন্য যে কোনো উপযুক্ত বোর্ডের ওপর সুন্দর করে এ কথাগুলো লিখাবে। তারপর গাছটির গোড়ার সন্নিকটে বোর্ডটা পুঁতে দিবে। আর এজন্য যাবতীয় খরচ বাবদ তোমাকে সামান্য এই রুপি ক'টা দিচ্ছি।'

'আমি এর সবই করবো মহোদয়, এগুলো সুসম্পন্ন করতে পারাটা আমার জন্য অনেক আনন্দের হবে, তবে এ সামান্য কাজটুকুর জন্য আমি কোনো রুপি গ্রহণ করতে রাজি নই, প্রিয় মহোদয়।'

'অবশ্যই তুমি রুপি গ্রহণ করবে।'

'কিন্তু এ তো প্রচুর রুপি।'

'খরচের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা দিয়ে তুমি চকোলেট খাবে, প্রিয় বালক, কেমন? তোমরা তো বিশ্ববিখ্যাত চকোলেট প্রস্তুত করো, তাই না?'

'জি মহোদয়। আপনাকে বলছি, আমার চেয়ে আমার স্ত্রীই চকোলেট অধিক পছন্দ করেন।'

'আমার ভুল হয়ে গেছে, আমার উচিত ছিল তোমার স্ত্রীর জন্য একটা উপহার প্রদান করা।'

'মহোদয়, আপনার অসামান্য বদান্যতা যে আপনি এতোখানি সৌজন্য প্রকাশ করছেন। আমি অবশ্যই অখরচকৃত সবগুলো রুপি দিয়ে ব্যাগভর্তি চকোলেট কিনে আমার স্ত্রীর জন্য নিয়ে যাবো, তাঁকে বলবো এক বাংলাদেশী সহৃদয় ও মহৎ জেনারেল এগুলো

তোমার জন্য উপঢৌকন স্বরূপ পাঠিয়েছেন। তাতে আমার স্ত্রী যে কী পরিমাণ আহ্‌লাদিত হয়ে উঠবে তা আপনাকে আমি বোঝাতে পারবো না।'

'তোমাকে বাছা আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।'

'দেশে ফেরত গিয়ে অবশ্যই মহোদয়াকে আমার সালাম ও শুভেচ্ছা জানাবেন।'

'তুমিও তোমার স্ত্রীকে আমার ভালোবাসা আর মমতা পৌঁছে দিও।'

'অবশ্যই মহোদয়।'

'একবার আমার দেশে তোমার বউকে নিয়ে বেড়াতে এসো। বাংলাদেশ পৃথিবীর সুন্দরতম দেশগুলোর মধ্যে একটি, যেমন তোমার দেশটিকেও আমার আমৃত্য ভালো লাগবে।'

'সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা আপনার বাংলাদেশ, আমি এ কথা জানি মহোদয়। আপনারা বীরের জাতি। মাতৃভাষার দাবিতে শহীদ-হওয়া জাতি আপনারা। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য হাসি মুখে আত্মাহুতি দেয়া জাতি আপনারা। এমন একটি দেশের মানুষের সঙ্গে আমি কিছুদিন কাটালাম, এ আমার সারা জনমের গৌরবোজ্জ্বল প্রাপ্তি। আপনার দেশে ভ্রমণে যাবার সুযোগ পেলে স্বর্গলাভের চেয়েও তা হবে শ্রেয়তর। অবশ্যই যাবো এবং আপনার আতিথেয়তা গ্রহণ করবো।'

বিমান উড্ডয়নের পর জেনারেল লক্ষ করেন তাঁর পকেটে এক টুকরো কাগজ পড়ে আছে। ওটা বের করে এনে চোখের সামনে ধরেন :

One Arachchige, My Beloved Daughter
Once I Met Her Here.

এখানে একদিন আরাশিগে নামক একটা মেয়ের সাথে দেখা হয়েছিল
যে ছিল আমার প্রিয়তমা কন্যার মতো।

তত্ত্বাবধায়ক সঙ্গী অফিসারের হাতে কি কাগজের টুকরোটা দেয়া হয় নি তাহলে? ভালো করে চোখ বুলান তিনি। না, ভুল দেখেছেন। এটাতে সেই সঙ্গী অফিসারের ঠিকানা লেখা রয়েছে। ঠিকানা লেখার জন্য আগে ছোট নোটবই ব্যবহার করতেন। আজকাল ছোট ছোট কাগজের টুকরো ও ভিজিটিং কার্ড দিয়ে মানিব্যাগ ভরে ফেলেন। ভুলবশত মানিব্যাগ থেকে মাঝে মধ্যে টাকা ঝরে পড়ে যায়, ঠিকানাও।

জেনারেল হাতের কাগজটা তাঁর মানিব্যাগে পুরে রাখলেন।

• • •

পানিশমেন্ট

ইমরান আহমেদ

উৎসর্গ :

লেখক-পরিচিতি

ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার নারিশা গ্রামে ইমরান আহমেদের জন্ম। স্থানীয় মালিকান্দা মেঘুলা হাইস্কুল থেকে এসএসসি এবং তেজগাঁও কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্স সহ মাস্টার্স করেন।

ইমরান আহমেদ যদিও বেশ মেধাবী ছাত্র ছিলেন, কিন্তু স্কুল ও কলেজ-জীবনে সাহিত্যের প্রতি তাঁর একরত্তি টান বা নেশা ছিল না। লেখালেখির জগতে তাঁর প্রবেশ নিয়ে একটি মজার ঘটনা আছে। ইমরান তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। একদিন ক্লাসে জনৈকা ম্যাডামের সাথে কথা বলার প্রাক্কালে হঠাৎ করেই ম্যাডাম বলেন, 'দেখি তো তোর হাত।' ইমরান হাত দেখান। ম্যাডাম হাত দেখে বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তুই কি লিখিস? লিখিস না কেন? তোর তো লিখার হাত!' ব্যস, ইমরান মন্ত্র পেয়ে গেলেন, লিখতে শুরু করলেন, অবিরল লিখতে থাকলেন। এখন অবিরাম লিখছেন।

তিন ভাই ও চার বোনের মধ্যে 'এখনো কিশোর' ইমরান দ্বিতীয়।

প্রকাশিত গ্রন্থাবলি :

সোনালি সৈকত, ছোটগল্প
সুখের ঠিকানা, ছোটগল্প
একটু ভালোবাসার জন্য, উপন্যাস
দূর থেকে দূরে, উপন্যাস
সেখানে একটু অনুভব, উপন্যাস
মেঘ ছেয়েছে আকাশ, উপন্যাস
দূরের অতিথি ছোটগল্পের অণুগ্রন্থ, সবুজ অঙ্গন সাহিত্য সংকলন ২০০৫-ভুক্ত
বৃষ্টির গন্ধে একদিন, অণুকাব্যগ্রন্থ, সবুজ অঙ্গন সাহিত্য সংকলন ২০০৫-ভুক্ত

অফিস ছুটির পর বাদুড়ঝোলা হয়ে বাসায় ফিরে আবিদ। সারা দিনের ক্লান্তি আর গরমের যন্ত্রণায় প্রায় নিঃশেষিত। পুরনো গৎবাঁধা রুটিন। ফ্রেশ হয়ে বারান্দায় বসে এক কাপ চা খাওয়া, সাথে একটা সিগ্রেট। শরীরটা ধীরে ধীরে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তারপর টিভি সেটের সামনে বসে একটার পর একটা চ্যানেল ঘুরানো। দশটায় ভয়েস অব আমেরিকা শুনতে শুনতে রাতের খাবার সেরে নেয়। অফিসের কিছু ডকুমেন্টে চোখ বুলিয়ে এগারটা থেকে সোয়া এগারটার মধ্যে শুয়ে পড়ে।

বাসায় পৌঁছার পর আবিদের মন খুব ফুরফুরে। মিলি ম্যাসেজ পাঠিয়েছে—আই এ্যাম কামিং টুমোরো এ্যাট টেন এএম। এ ছোট ম্যাসেজটিতে হয়তো কোনো সংবাদ নেই, কিন্তু আবিদের মধ্যে হুলস্থুল পড়ে গেলো। অবসাদ পালিয়ে গেছে। সদ্য দলে ফেরা তরুণ পেসারের মতো ফুরফুরে মেজাজে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় রাস্তায়। ভালো একটা সেলুনে চুল কাটাতে হবে। আবিদের কোনো হেয়ার স্টাইলই মিলির পছন্দ নয়। কতোবার কতোভাবে চুল কেটে এসেছে, প্রতিবারই কোনো না কোনো খুঁত ধরা চাই।

'এভাবে চুল কাটিয়েছো কেন? এ রকম করে তো বাচ্চারা চুল কাটে।'

'এটা উঠতি বয়সের ছেলেদের স্টাইল।'

'এটা গুণ্ডা-পাণ্ডা, মাস্তানদের স্টাইল।'

আবিদ রেগে যায়। বলে, 'ঠিক আছে, আর কখনো চুল কাটাবো না। বাউলদের মতো চুল রেখে দেবো।'

মিলির এক কলেজ-মেটের বিয়ে। দীপালী। হিন্দু মেয়ে। হিন্দুদের বিয়ে হয় রাতে। মিলি সারারাত থাকবে। আবিদকে যেতে বলেছে। মিলি বারবার স্মরণ করিয়ে দিল যেন চুল-দাঁড়ি ঠিকমতো কেটে আসে। মিলির এ খুঁতখুঁতে স্বভাব আবিদের বিরক্তি ধরায়, আবার আনন্দও লাগে। সেবার মিলিকে চমকে দেবার জন্য আবিদ মাথা ন্যাড়া করে ফেলে। মিলির কী কান্না—'আমার ভাগ্যে একটা খবিশ জুটেছে। আমি যে কী পাপ করেছি!' মিলি রেগে সাজগোজ নষ্ট করে ফেললো। বিয়ে-বাড়িতে যাবে না। বান্ধবীদের সামনে ওকে ছোটলোক-খবিশ এবং আরো অনেক গালিগালাজ (ব্যক্তিগত বানানো) ব্যবহার করলো।

মিলির বান্ধবী ইলা খুব এক্সাইটেড। দারুণ লাগছে আবিদকে। এতো কাছ থেকে কারো ন্যাড়া মাথা দেখে নি। কী দারুণ চকচক করছে! আবিদ রোনালডো সেজেছে। অনেক বোঝানোর পর মিলিকে রাজি করানো গেলো। আবিদের মাথায় পরচুলা পরতে হবে। আবিদ গো-বেচারার মতো তা মেনে নেয়। যদিও দু-বার চুল পড়ে গিয়েছিল, ভাগ্যিস মিলি তা দেখে নি। গভীর রাতে সবাই যখন বিয়ে পড়ানো দেখছে, আবিদ বাসার এক কোণে চেয়ারে বসে ঝিমুচ্ছে। মিলি আবিদের পাশে দাঁড়ায়।

'বর দেখতে হাবাগোবা। একটুও স্মার্টনেস নেই। চলো, তোমাকে কফি খাওয়াবো।'

আবিদ বিস্মিত হয়ে বলে, 'তুমি বিয়ে দেখবে না? কফি পরে খাওয়া যাবে।'

'অন্যের বিয়ে দেখে মজা নেই, নিজের বিয়ে করতে ইচ্ছে করে। এতো নিয়ম কানুন মেনে বিয়ে করা সম্ভব না। বিয়ে মাত্র দুজনের ব্যাপার। এতো আদিখ্যেতার দরকার কী? শর্টকাট সার্ভিস। কোর্ট ম্যারেজ করবো।'

'তোমাকে ওরা খুঁজবে, তুমি যাও।'

'নিশুতি রাতে গল্প করার মজাই আলাদা। এসো, বনলতা সেনের মতো কিছুক্ষণ মুখোমুখি বসে থাকি।'

'মুখোমুখি বসে কী লাভ?'

'নীরবতায় অনেক কিছু বুঝে নেয়া যায়। চেষ্টা করো, পারবে।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারি না, অদ্ভুত সব চিন্তা এসে জড়ো হয়। এগুলো সাধু সন্ন্যাসীদের কারবার। তাঁরা ধ্যানের মাধ্যমে অনেক কিছু উপলব্ধি করতে পারেন।'

'আমার মনে হয় তুমি সত্যিকারের প্রেমিক নও। সত্যিকারের প্রেমিকরা অনেক কিছু করতে পারে।'

আবিদ কোনো উত্তর দেয় না। চুপ করে থাকে। মিলি বলে, 'এই বলো না, তুমি কি আর কখনো ন্যাড়া হবে? ন্যাড়া অবস্থায় তোমাকে গেছো ভূতের মতো দেখায়। গেছো ভূতদের মাথায় চুল থাকে না। জন্মের পর মা-ভূত এদের মাথার চুল ছেঁটে ফেলে এক ধরনের মলম লাগিয়ে দেয়। এরপর থেকে এদের মাথায় আর চুল গজায় না।'

'এ গল্প তোমাকে কে বলেছে?'

'বই পড়ে জেনেছি। এই গেছো ভূতগুলো একটু হাবা টাইপের হয়। এক গাছ থেকে অন্য গাছে যাবার সময় এদের লম্বা চুলগুলো ডালপালার সাথে জড়িয়ে যায়। ফলে দ্রুত পালিয়ে যেতে পারে না।'

'ভূতের গল্প বাচ্চারা শুনতে বেশি পছন্দ করে। এরা মানুষকে জানার পর অতি প্রাকৃত কিছু বিষয় জানতে চায়।'

'আচ্ছা, তোমাকে তাহলে একটা কবিতা শুনাই, আমার প্রিয় কবিতা—

সুরঞ্জনা, ঐখানে যেয়ো নাকো তুমি,
বলো নাকো কথা ঐ যুবকের সাথে।
ফিরে এসো সুরঞ্জনা
নক্ষত্রের রুপালি আগুন-ঝরা রাতে।'

'এতো শাসন-অনুশাসনের কবিতা ভালো লাগে না। তোমার প্রিয় জিনিসের সাথে তোমার ক্যারেকটারের হুবহু মিল। কবিরা অলস প্রকৃতির হয়। জাগতিক কাজকর্মে ফাঁকি দিয়ে কবিতায় মগ্ন থাকে। আমার পছন্দ পৃথিবীর কর্মঠ লোকদের। এই ধরো, বিল গেট্‌স, ইয়াসির আরাফাত, নেলসন ম্যান্ডেলা, প্রমুখ।'

'তুমি একটা লোভী। বিল গেট্‌সের কারি কারি টাকা।'

'সেজন্য নয়। বিল গেট্‌সের আর্থিক সচ্ছলতা আর কবিদের আর্থিক দুরবস্থা আমাকে কবিতা-বিমুখ করেছে।'

দীপালীর ছোট ভাই বিপুল এসে মিলিকে ডাকে—'দীপা তোমাকে যেতে বলেছে।'

বিপুল দাঁড়িয়ে আছে। আরো কিছু হয়তো বলবে। মিলি উঠে এসে ওকে ফিসফিসিয়ে কী যেন বললো। বিপুল আর দেরি করে না, চলে যায়। মিলি আবিদের খুব কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপর বলে, 'চলো, ছাদে যাই।'

'ছাদে কেন? এখানেই ভালো আছি।'

'তুমি পা মেলে বসবে আর আমি তোমার কোলে মাথা রেখে কিছুক্ষণ ঘুমাবো। রাত জাগতে পারি না। রাত জাগলে সৌন্দর্যের ওপর প্রভাব পড়ে।'

মিলি মাঝে মাঝে এমন সব অন্যায় আবদার করে যা বাস্তবায়ন করা কখনো হয়ে ওঠে না। বাচ্চাদের মতো কিছুক্ষণ পিড়াপিড়ি করবে, তারপর ভুলে যায়, অথবা ভুলে যাবার ভান করে। কিন্তু আজ রাতের মিলি অন্যরকম। উচ্চ আদালতের বিচারকের মতো কঠোর। সে তার সিদ্ধান্ত বা হুকুম তামিল করতে বদ্ধ পরিকর।

বিয়ে-বাড়ির কোথাও ফাঁকা থাকার কথা নয়। ছাদেও মানুষজন কম নয়। দশ-বার জন ছেলে কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে কিছু একটা করছে। হয় সিগ্রেট টানছে নতুবা বিয়ারের ক্যান খালি করছে। আবিদ আর মিলিকে দেখে ওরা সতর্ক দৃষ্টিতে তাকায়। খানিক সময় সংযত থেকে ওরা শুরু করে দেয় ওদের কার্যকলাপ।

মিলি ছাদের এক কোণে আধাভাঙ্গা এক চেয়ারে খুব সতর্কভাবে হেলান দিয়ে বসে। আবিদ ছাদের রেলিংয়ে দু হাত বিছিয়ে উপুড় হয়ে দাঁড়ায়।

'তুমি ঘুমাতে চেষ্টা করো, আমি পাশে আছি।' আবিদ বলে।

মিলি আহ্লাদের সুরে বলে, 'দেখো না, একটা চেয়ার পাওয়া যায় কিনা। ঘুমন্ত মানুষ সব সময় বেখেয়ালি।'

'চেয়ার কোথায় পাবো আমি? কাউকে চিনি না, জানি না।'

'একটু চেষ্টা করতে দোষ কী? তুমি আগেই হাল ছেড়ে বসে থাকো। হাঁদারাম কোথাকার। তুমি বসে ঘুমাও, আমি যাই।'

মিলি সারারাতে আর ফিরে আসে নি। একা একা ছাদে বসে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছে আবিদ। তার ওপর মশার উপদ্রব তো আছেই অবিরাম। কয়েকবার বাসায় চলে যাবার কথাও ভেবেছে। গভীর রাতে রাস্তায় নানা রকম সমস্যার কথা ভেবে যায় নি। একবার সে একটু বেশি রাত করে বাসায় ফিরছিল। টহল পুলিশের একটি দল তাকে আটক করে। ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশি চালায়। অনেক ফন্দি-ফিকির করে যখন লাভ হলো না, তখন মিথ্যার আশ্রয় নেয় আবিদ। মৃত বাবাকে জীবিত করে বলে, 'বাবা গুরুতর অসুস্থ, ডাক্তারের খোঁজে বের হয়েছি।' এতো কিছুর পরও পুলিশকে বিশ্বাস করানো যায় নি। ঘণ্টা দুই আটক রেখে পরে ছেড়ে দেয়। পুলিশের নির্যাতনের চেয়ে মিলির নির্যাতন ঢের ভালো। পুলিশের আটকাদেশে জীবনের ওপর কালিমা পড়ে। মিলির টর্চার আভ্যন্তরীণ, বাইরের কেউ এগুলো জানতে পারবে না।

ভোরের দিকে মিলিকে একবার দেখা গেলো। দীপার গলায় হাত রেখে শোবার ঘরে যাচ্ছে। আবিদ কাছাকাছি দাঁড়ানো ছিল। মিলি ওর দিকে ফিরেও তাকায় নি।

সেলুনের আরামদায়ক চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে আবিদ। অল্প বয়সের নাপিত ছেলেটি ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে আবিদকে স্বাভাবিক করতে না পেরে বিরস মুখে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে।

কাঁচির অনবরত ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে আবিদ জেগে ওঠে। নিজেকে সেলুনের চেয়ারে আবিষ্কার করে মর্মাহত হয়। যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যাস আর গেলো না। এবার শুরু হলো নাপিত ছেলেটির অত্যাচার।

'উঠলেন ক্যান? আরো ঘুমান। আপনের মতো কাস্টমার জীবনেও দেহি নাই। চুল কাটা শুরু করতে না করতেই ঘুমাইয়া পড়লেন। একবার ডানদিকে তো আরেকবার বাঁও দিকে। কয়েকবার ঝাঁকুনি দেয়ার পরও লাভ হইলো না। দিলাম বন্ধ কইরা। কান-মাথা কাইট্টা গেলে কী করুম? হাই ওয়েতে ড্রাইভারদের সাবধান করার জন্য বড় বড় সাইনবোট লেইখ্যা দেয়—চোখ্‌খে ঘুম লইয়া গাড়ি চালাবেন না। আমাগো সেলুনেও একটা সাইনবোট লাগাইয়া দিতে হবে—চোখ্‌খে ঘুম লইয়া চুল কাটাইতে আসবেন না।'

আবিদ সমস্ত অপমান চোখ বুজে সহ্য করে—কোনো প্রতিবাদ করে না।

রাস্তা দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফেরার সময় আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে নির্জীব স্মৃতিগুলো সজীব হয়ে পুরো মানুষকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। আবিদ স্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে থাকে।

বাসায় পৌঁছে বড় লুকিং গ্লাসের সামনে দাঁড়ায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজেকে আবিষ্কার করে। মুখের অবয়বে আগের গ্লামার আর নেই। বয়সের ছাপ, নাকি চিন্তার ফসল, কোনোটাই ভেবে উঠতে পারে না।

রাতে ভালো ঘুম হয় না আবিদের। অদ্ভুত সব চিন্তা-চেতনা স্বপ্নের প্রতিফলনে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় নিয়ে যায়। আধো ঘুম আধো জাগরণে রাতের বেশি সময় পার হয়। শেষ রাতের দিকে ঘুম জেঁকে বসে। সিলিং ফ্যান ও টেবিল ফ্যানের হাওয়ায় শরীরে ঠাণ্ডা লেগে গেছে। গলার স্বর অস্বাভাবিক—ফ্যাস-ফ্যাস করছে। আবিদের হাঁচির ব্যামো আছে। অপরিচিত কেউ কাছে এলে হাঁচি আসে। মিলির কাছে স্বাভাবিক আচরণ করতে পারে না। কোনো অন্তরঙ্গ মুহূর্ত এলে হাঁচি এসে পড়ে। পকেটে প্রায়ই রুমাল থাকে না। হাঁচির পূর্ব মুহূর্তে মুখ বিকৃতি বড্ড অসুন্দর। বেমানান। তখন দু হাত দিয়ে মুখ চাপা দেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

ভোর হতেই হাঁচি দেয়া শুরু হয়েছে আবিদের। হাতের কাছে গামছা, তোয়ালে যা ছিল তা দিয়ে মুখ চেপে ধরেছে। হাঁচি নিয়ে সে যতোটা চিন্তিত তার চেয়ে বেশি চিন্তিত ভাঙ্গা গলা নিয়ে। চট করে মাথায় বুদ্ধি খেলে গেলো। গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করলে কেমন হয়? বুয়া চলে এলে ভালো হতো। গ্যাসের চুলায় আগুন ধরানো অভ্যাসের ব্যাপার। আবিদ বরাবর এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য। বেশিক্ষণ এ নিয়ে ভাবতে হয় না। বুয়া ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সাথে কয়েকটি লবণের দানা, এলাচ ও লবঙ্গ মেশানো হয়েছে। ফ্লেবার হয়েছে দাঁত-মাজা পেস্টের মতো। আবিদ বাথরুমে গিয়ে জোরে জোরে গড়গড়া করছে। বুয়া এসে বাথরুমের দরজা ধাক্কা দিয়ে বলে, 'ও ভাইজান, কী অইছে আপনের? এমন গোঁৎ গোঁৎ শব্দ করছেন ক্যান? মনে হইতেছে কেউ আপনারে

জবাই করছে। জবাই করা গরু-ছাগল এমন গোঁৎ গোঁৎ শব্দ করে।' আবিদ শরমে চুপসে যায়। মুখের ওপর দুটো কথা শুনিয়ে দিতে পারলে ভালো হতো।

বুয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে দেখে। কয়েকটি চুলে পাক ধরেছে। মুখের অবয়বে কোমলতা নেই। গত এক বছরে এতো পরিবর্তন! মনের দিক থেকে তো এখনো সতর বছরের তরুণ। এতো দ্রুত নেতিয়ে পড়লো বাহ্যিক যৌবন! গত এক বছরে জীবনের ওপর ধকলও কম যায় নি। বাবার মৃত্যু, মায়ের অসুস্থতা, নদী ভাঙ্গন, জমিজমা নিয়ে বিরোধ, পারিবারিক অশান্তি জীবনে আষ্টেপৃষ্ঠে ধরেছে। পারিবারিক দুশ্চিন্তা, সংসারের টানাপোড়েন, আন্তঃসংঘাত, জীবনের বাহ্যিক ও ভিতরের অবয়বে রূঢ় আঁচড় কাটে।

মাঝে তমার সাথে আবিদের সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। তমা মালিকের মেয়ে। অফিসে আসা যাওয়ার পথে পরিচয়। টেলিফোন, মোবাইলে কথোপকথন। এক সাথে ডিনার-লাঞ্চ করেছে কয়েকবার। ফ্যান্টাসটিক এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড। আমেরিকার কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফ্যাশন ডিজাইনের ওপর এমএ করছে। ইন্টিরিয়র আর্কিটেকচারের ওপর ডিপ্লোমা করছে। ঢাকায় অফিস নিয়েছে। বছরের বেশির ভাগ সময় বাইরে কাটায় বলে ব্যবসা জমে ওঠে। রাজশাহীতে একটা কাজ পেয়েছিল তমা। সে নিজে উপস্থিত থেকে কাজটি বুঝিয়ে দিচ্ছিল। মন্ত্রীর বাড়ির গেস্ট রুম। যদিও শহর, তবুও গ্রামের ছোঁয়া বেশি। অনেক ভেবেচিন্তে ঘরের পেইন্ট, ডেকোরেশন, আসবাবপত্র সিলেক্ট করেছে। কয়েকদিন থাকতে হবে, তাই হাঁপিয়ে উঠেছে। এক রাতে আবিদকে মোবাইল করে—'কাল সকালে রাজশাহী চলে এসো। ঠিকানাটা ঝটপট লিখে নাও।'

'অফিসে সমস্যা হবে। চাকুরি চলে যেতে পারে।'

'তোমাকে ভাবতে হবে না। ওদিক আমি সামলাবো। ড্যাডিকে ফোন করে দিচ্ছি। এক কাজ করো। এগারটার বাসে উঠে পড়ো। এখনো দু ঘণ্টার মতো বাকি, আমি তোমাকে খুব মিস করছি।'

আবিদের কিছু বলার সুযোগ নেই, তমা মোবাইল রেখে দিয়েছে।

আবিদ কিছু না ভেবেই গোছগাছ করে বেরিয়ে পড়ে। গত ছয় মাসে ছয়টি শুক্রবারে বন্ধ পেয়েছে আবিদ। কাজের প্রচণ্ড চাপ। মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে চার দেয়ালে বন্দি আবিদ হাঁপিয়ে উঠেছে। রাজশাহী বিভাগ এখনো ভালো করে দেখা হয় নি ওর।

বাসে চমৎকার একটি সিট পেয়ে গেলো। বুকিং ছাড়া এতো চমৎকার সিটের কথা ভাবতে পারে নি আবিদ। ঢাকা শহরের যানজট পার হবার আগেই ঘুমিয়ে পড়ে।

সুসময়ে ঘড়ির কাঁটা দ্রুত চলে। রাতটা ভালোভাবে পার করেছে আবিদ। তাড়াহুড়ো করে আসার সময় মোবাইল এবং ঠিকানা ফেলে এসেছে। অস্বস্তিতে পড়ে আবিদ। তমার মোবাইল নম্বরও মনে নেই। মোবাইলের মেমোরিতে সবার নম্বর সেভ করা বলে মুখস্থ করা হয় নি। ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে। কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে হোটেলে এসে চা-পরোটা খেয়ে নেয়—ধকল সইবার প্রাথমিক প্রস্তুতি। সারাদিন ঘোরাঘুরি করে রাতের বাসে চলে যাবে। স্টেশনের গেট পার হবার আগে তমাকে দেখে ভূত দেখার

মতো শিউরে ওঠে। কালো জিন্‌স, স্ট্রাইপ্‌ট গেঞ্জি, চোখে কালো সানগ্লাস। সাদা মারুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তমা।

আবিদের মুখে কথা আটকে গেছে। বেশ সময় নিয়ে অস্পষ্ট স্বরে বললো, 'তুমি! এতো কষ্ট করে এখানে আসার কী দরকার ছিল?'

'সারারাত ধরে মনে হচ্ছিল কিছু একটা ভুল হয়ে গেছে। তোমাকে মোবাইলে পাওয়া যাচ্ছিল না। রিং হতে হতে থেমে যাচ্ছে। তাড়াহুড়ো করার সময় ফেলে এসেছো নিশ্চয়।'

'ঠিক বলেছো। কিন্তু কী করে বুঝলে?'

'একদম সহজ। এতোবার রিং হবার পর কেউ রিসিভ করে নি।'

'ইচ্ছে করে করলে কিভাবে বুঝতে?'

'মানুষের ধৈর্য্যশক্তি সীমিত। বারবার রিং বাজতে থাকলে মোবাইল অফ্ করে রাখতে। অতি উৎসাহী মানুষগুলো ভুলো মনের হয়। যারা মানুষের জন্য নিবেদিত প্রাণ, তারা ভুলের চক্রে বেশি ঘুরপাক খায়। ফলশ্রুতিতে ভাগ্যে জোটে নিন্দা। যেমন ধরো, তুমি রাজশাহী এসে ঠিকানা না জেনে ফিরে গিয়েছো। কারো কাছে এ কথা বিশ্বাস করাতে পারবে? যদিও কেউ বিশ্বাস করে, তারা তোমাকে বোকা ভাববে। এটা হবে কোনো রকম সিমপ্যাথি ছাড়া কষ্ট সহ্য করে নেয়া। গাড়িতে ওঠো। তোমার কিছু বলার থাকলে বাসায় গিয়ে বলবে।'

'তোমার ড্রাইভার কই?'

'আসে নি। তেমন প্রয়োজন পড়ে না। তাই দেরি করে আসে।'

চলন্ত গাড়ির চালকের সাথে আলাপে মত্ত হওয়া মানে কোনো দুর্ঘটনাকে স্বাগত জানানো। আবিদ জানালা দিয়ে নিশ্চুপ বাইরে তাকিয়ে থাকে।

পাশাপাশি বসে চুপচাপ থাকা মানে সম্পর্কের অবনতি। মৌনতায় মনের দাবি উপেক্ষিত হবার সম্ভাবনা থাকায় তমা কথা বলে।

'তুমি কি প্রতিজ্ঞা করেছো যে কোনো কথা বলবে না? সন্ন্যাসীদের মতো জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে?'

'তা কেন? চালকদের নীরবতা দরকার। নীরবতায় ড্রাইভিংয়ের প্রতি গভীর মনোযোগ থাকে।' আবিদ বলে।

'আমি মনে করি এর উলটোটা ঠিক। নীরবতায় মন বেশি দুরন্ত হয়ে এদিক-ওদিক ছোটে।'

'তোমার ডেকোরেশনের কাজ কেমন চলছে?' আবিদ জিজ্ঞাসা করে।

'ডেকোরেশন মানে! বলো ইন্টিরিয়র আর্কিটেকচারের কাজ কেমন চলছে। তা চলছে মোটামুটি। যেমন চলার কথা তেমন চলছে না। কাজের ডিজাইনটা আরো আপগ্রেড করলাম। বলতে পারো পুরো থিম পালটে দিয়েছি। তিরিশ ভাগের মতো কাজ শেষ, আরো সপ্তাহ খানেকের মতো লাগবে। কাল রাতে পেছনের দেয়ালের ওয়ালমেটে পোর্ট্রেট করলাম। রাত এগারটার দিকে বসলাম। ভোরে শেষ হলো। মজার ব্যাপার হলো পাশে এক ফ্লাস্কভর্তি কফি রেখেছিলাম। খেতে মনে পড়ে নি।'

'পোর্ট্রেট কি কোনো ল্যান্ডস্কেপের?'

'মিক্সড। ল্যান্ড এ্যান্ড ওয়াটার স্কেপ। ব্যাকগ্রাউন্ড উন্মত্ত পদ্মার ঢেউ। তার ওপর ভাসমান কয়েক গাছি কচুরিপানা। একটু নিচে অস্তগামী সূর্য ও জেলেদের মাছ ধরার আয়োজন। বৃষ্টির ভারে নুয়ে পড়েছে কদমগাছের সাদা-হলুদ ফুল। এক রমণী। আটপৌরে। খোলা চুল, বাতাসে আঁচলের সাথে উড়ছে। কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে আছে রমণী। ভাঙ্গা ছাতা ও থলে হাতে এক বৃদ্ধের দ্রুত পথ চলা।'

আবিদ বলে, 'তোমার আইডিয়াটা চমৎকার।'

'ওয়ালমেটের সাথে রাতে লাইটিংয়ের ব্যবহার থাকবে। কোনো কিছু কি ছন্নছাড়া মনে হচ্ছে?'

'কয়েকটি বুনো ফুল থাকলে আরেকটু বেশি ন্যাচারাল মনে হতো।'

'ব্যাপারটা আমি ভেবে দেখবো।'

তমার কথা শেষ না হতেই গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, 'এটা আমার থাকার জায়গা।'

আবিদ বলে, 'এটা তো একটা সরকারি ডাকবাংলো।'

'হ্যাঁ। কী করে বুঝলে?'

'বাইরে সাইনবোর্ড লাগানো আছে।'

তমা বলে, 'আমার নজরে পড়ে নি। আমি অবশ্য কিছুই ভালো ভাবে দেখি নি।'

'এতো বড় বাংলোয় কি তুমি একা থাকো?'

'দুজন ইঞ্জিনিয়ার সহ মোট সাতজন আছি।'

'ওরা কোথায়?'

'সাইটে গেছে।'

আবিদ জিজ্ঞাসা করে, 'একা থাকতে তোমার অসুবিধা হয় না?'

তমা বলে, 'অসুবিধা হচ্ছে বলেই তোমাকে তলব করা। অধীনস্তদের সাথে মন খুলে কথা বলা যায় না। ওরা ওদের মতো, আমি আমার মতো।'

'তোমাকে নিয়ে ওরা মুখরোচক সমালোচনা করবে না?'

'আমি সমাজ এবং মানুষ কাউকে পরোয়া করি না। মন যেটায় সায় দেয় আমি তাই করে থাকি। সে যাকগে, তুমি ফ্রেশ হয়ে নাও। আমার একটা হেভি শাওয়ার দরকার। ঠিক পঁয়ত্রিশ মিনিট পর তোমার সাথে নাস্তার টেবিলে দেখা হবে। ওটা তোমার রুম। কেয়ারটেকার সব ব্যবস্থা করে রেখেছে।'

গরম কফির কাপে আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়ায় তমা। হাতে তুলে রাখা অবস্থায় জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন লাগছে তোমার, আবিদ?'

'এতো গাছপালা, ফুলের বাগান, পাখিদের আড্ডা, সবুজের সমারোহ, মনে হচ্ছে আমি প্রকৃতির সাথে মিশে যাচ্ছি, খালি পায়ে কচি ঘাসের ডগা মাড়িয়ে পথ চলতে সুড়সুড়ি লাগে। বালকবেলার কথাগুলো মনে পড়ছে।'

'তুমি নাস্তা খেয়ে বিশ্রাম নাও। আমি ঘণ্টা তিনেক ঘুমাবো। দুপুরে একসাথে লাঞ্চ করে সাইটে যাবো। কিছু লাগলে কেয়ারটেকারকে বলো। ওর নাম লেনিন।'

তমা চলে গেলো ওর রুমে। আবিদ পুরো বাংলো ঘুরে দেখে। বাংলোয় কেয়ারটেকার ছাড়াও আরো দুজন কর্মচারি আছে। একজন মালি, অপরজন বাবুর্চি।

বাংলোর শেষ প্রান্তে একটি কুঁড়েঘর। সেখানে মালি পরিবার সহ থাকে। বাংলোর গাছগাছালির পাশে ছোট ছোট সতর্কীকরণ সাইনবোর্ড ঝুলছে—কেউ যেন গাছের পাতা, ফুল না ছিঁড়ে। বেশ কিছু সময় বাইরে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে আবিদ।

তমার ঘরের দরজা বন্ধ। আজকের পত্রিকা হাতে নিয়ে শুয়ে পড়ে আবিদ। হেডলাইনে চোখ রাখে। ডিটেইল্‌স পড়তে ভালো লাগে না। পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলো হাওয়ায় দাপাদাপি করছে। ফ্যান বন্ধ করে দিতে পারলে ভালো হতো। অলসতা জেঁকে ধরে। কাগজগুলো গুছিয়ে বালিশের নিচে গুঁজে রাখে। ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙ্গে অনেক বেলায়। দুপুর গড়িয়ে বিকেল ছুঁই ছুঁই। উঠবে, না আরেকটু ঘুমাবে, সেটা সময়ের ওপর ছেড়ে দিয়ে ঘড়ি দেখে—চারটা বাজে। ঝটপট উঠে পড়ে।

খাবার টেবিলে বসে আবিদ জানতে পারে তমা বেরিয়ে গেছে অনেক আগে। প্লেটে তরকারি তুলে নিতে গেলে বাবুর্চি বাধা দেয়—'স্যার, এক মিনিট অপেক্ষা করুন। একটু গরম করে দেই।'

'গরম কেন করবে? খাবার তো বাসি হয়ে যায় নি।'

'গরম খাবার একটু বেশি সুস্বাদু লাগে। আপামণিও তাই বলেন।'

'আমার বেলায় উলটো। আমি গরম কিন্তু একেবারেই পছন্দ করি না। গরম খাবার খাওয়া মানে সব সময় সতর্ক থাকা। একটু আনমনা হলেই মুখ পুড়ে যাবে, হাত পুড়ে যাবে। আমি হলাম বেখেয়ালি, আরামপ্রিয়।'

'তাহলে আপনার চা কিভাবে দেবো?'

'চা-কফির দরকার নেই। সকাল-বিকাল দু গ্লাস শরবত দিলেই হবে।'

'আপনি কি শরবত খাবেন? লেবুর শরবত, বেলের শরবত, ইসবগুলের শরবত, গাছগাছালির শরবত?'

'রুস্তম মিয়া, আমার খাবার নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। সবকিছুতেই আমার অভ্যাস আছে। তোমার আপা কিছু বলে গেছেন?'

'হ। আপনি যদি সাইটে যেতে চান যেতে বলছে। গাড়ি এবং ড্রাইভার পাঠিয়ে দিছে। ড্রাইভারকে ডাক দিব?'

'না থাক। উনি কোথায় এখন?'

'কী আর কমু স্যার? উনারে ঘুমের বেরামে পাইছে। একটু সময় পাইলে বসে বসে ঝিমায়।'

খাবার শেষে পোশাক পালটে নেয় আবিদ। গরম পড়েছে খুব। গায়ে একটু পারফিউম মেখে নেয়। বাইরে বের হবার আগেই ড্রাইভারের সাথে দেখা।

'গাড়ি বের করুম স্যার?'

'তুমি উঠে পড়লে কখন?'

'গরীবদের চউখে কি আর ঘুম থাকে? তন্দ্রা যখন আসে তখন ঝিমাই। ঘুমাইতে গেলে তো আর চাকরি থাকবে না। কারে কখন, কোথায় লইয়া যাইতে হয় কে জানে?'

'এক কাজ করো। তুমি ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম নাও, আমি একটু ঘুরে আসি।'

'এইডা কেমন কতা কন? আপনে আমাগো কুটুম। ইষ্টি-কুটুমের সমাদর করুম না? তা ছাড়া আপনে আমাগো ম্যাডামের কুটুম।'

'আমার গাড়িতে চড়তে ভালো লাগে না, রিকশা করে ঘুরবো।'

'বুঝছি স্যার। আপনে গাড়িতে উঠতে ডরাইতেছেন। আমার একটা ভালো গুণ হইলো স্টিয়ারিং হাতে নিলে ঘুম ফুরুত। একটা কতা কই স্যার, আমরা হইলাম জাত ড্রাইভার। আমার বাপদাদা সবাই ড্রাইভার ছিল। বয়সের চাইতে আমার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি।'

'আরেকজন ড্রাইভার আছে না, মালেক ড্রাইভার?'

'শুধু ফটর ফটর করে, কবে যে কোন দুর্ঘটনা ঘটাইবো আল্লাহ্ মালুম।'

খুব অল্প সময়ের মধ্যে আবিদ পৌঁছে যায় তমার সাইটে। তমা কাজে ব্যস্ত। কখনো রংতুলি, কখনো আবার হাতুড়ি-বাটাল নিয়ে কাজ করছে। নিকট-দূর থেকে তমাকে দেখে বের হয়ে আসে। কাজের সময় কাউকে ডিস্টার্ব করা মানে মনোযোগ সরিয়ে নেয়া। আবিদ নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়। মন্ত্রীর বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখে। তমার ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে কথা হয়। এ বাড়িতে অনেক দর্শনার্থীর ভিড়। মন্ত্রীর অস্থায়ী কার্যালয়। কয়েকজন পুলিশ বিরস মুখে একটি বেঞ্চে বসে আছে।

কিছুটা সময় পার করে তমার কাজের জায়গায় আসে। তমা টেবিলে উপুড় হয়ে বসে আছে। চোখ বন্ধ। সামনে কফির কাপ। হালকা ধোঁয়া সময় নিয়ে উড়ে যাচ্ছে। একটু দাঁড়িয়ে থেকে পরিস্থিতি আঁচ করতে চেষ্টা করে আবিদ। তারপর জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কি খুব ক্লান্ত?'

তমা চোখ বন্ধ করে বলে, 'একটু বসো! কফি দিতে বলি?'

'বলতে পারো। চোখ বন্ধ করে রাখছো কেন?'

'পুরো প্লানিং সাজিয়ে ভুল-ত্রুটি দেখছি। বিশ্লেষণ করছি।'

'সেটা তো চোখ খোলা রেখেও করা যায়।'

'যাবে না কেন? যায়। চোখ খোলা, না বন্ধ, সেটা মুখ্য বিষয় নয়। আসল কথা হলো অন্তর্দৃষ্টি। অন্তর্দৃষ্টি প্রখর না হলে তখন দৃষ্টিভঙ্গি পড়বে সাধারণ কাতারে।'

'কাজ ভালোই চলছে নাকি?'

তমা বলে, 'বুঝতে পারছি না। শৈল্পিক কাজের কোনো শেষ নেই। একেকটা তুলির আঁচড় নতুন নতুন মাত্রা সংযোজন বা বিয়োজন করে। আলটিমেট থিমে পৌঁছতে হলে এ সংযোজন বা বিয়োজনের বিন্যাস ঘটাতে হবে বারবার।'

'এভাবে যদি কোনো মাত্রার বিন্যাস ঘটতে থাকে তাহলে রেজাল্ট হবে ইনফিনিটিভ।'

'যদি ওভাবে ভাবি তাহলে কোনো কাজের শেষ নেই। আমাদের মধ্যে বেশির ভাগ লোক শুধু রেজাল্ট দেখে। পার্থিব জগতে কোনো কাজেরই শেষ নেই। আমার মতে কোনো না কোনো খুঁত থেকেই যায়। কাজের কথা থাক। এবার নিজেদের প্রসঙ্গ নিয়ে ভাবি। দুপুরে ঘুম কেমন হলো?' তমা জানতে চায়।

'ঘুমে আমার কোনো সমস্যা নেই। শোয়ার জায়গা না পেলেও সমস্যা নেই। বসে বসেই ঘুমাতে পারি। তুমি ফিরবে কখন?'

'আজ নাও ফিরতে পারি। রাতের নিরিবিলিতে ফাইনাল ডিসিশন নিয়ে নিব। নিশুতি রাত হলো ভালো কিছু চিন্তা-চেতনার মোক্ষম সময়। মনীষীরা সারারাত জেগে জেগে ধ্যান করতেন। তুমিও থেকে যেতে পারো।'

'আমি কী করবো?'

'পর্যবেক্ষণ করবে। আমাকে, আমার কাজকে।'

'তোমার সমস্যা হবে না?'

তমা বলে, 'খুব বেশি বকবক করলে সমস্যা হবে। মৌনতার পর্দা জড়িয়ে নিতে হবে। তুমি হবে নীরব সমালোচক। আমার কোনো ভুল হলেও ধরিয়ে দিবে না।'

'অসম্ভব। সেটা আমি কেন, কেউ সহ্য করবে না। মানুষের ইনজাস্টিস অন্য মানুষদেরকে খোঁচাতে থাকে। ধীরে ধীরে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এ রকম পরিস্থিতি সামাল দেয়া কঠিন। উদাহরণ দেই—'

'বুঝতি পারছি। উদাহরণের প্রয়োজন নেই। মানুষ যখন ভুল করে তাকে শুধরে নেবার ক্ষমতাও আল্লাহ্ তাকে দেন। যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা ভুলগুলো সংশোধন করেন। আর যারা তা না করে তাদের ভুলত্রুটি গুণোত্তর ধারায় বৃদ্ধি পায়।'

সকালে কলিংবেলের আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে যায় আবিদের। অনেক বেলা হয়েছে। এখনো নিজেকে প্রস্তুত করা হয় নি—আজ মিলি আসবে। ধড়ফড়িয়ে উঠে দরজা খুলে দেয়। হকার। পেপার নিয়ে এসেছে।

'স্যার, আপনার ছয় মাসের বিল বকেয়া।'

হকারের সাথে দেখা হয় না। বিল পরিশোধের কথা মনে থাকে না। লজ্জিত আবিদ বিল পরিশোধ করে দেয়।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। এ বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়ে মিলির আসার সম্ভাবনা খুব কম। পেপার হাতে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। ছেলেবেলার অভ্যাস, শুয়ে শুয়ে পড়লে ঘুমের রাজ্যে ডুবে যায়। বড় হলে ছেলেবেলার অনেক অভ্যাস পরিবর্তিত হয়। আবিদের কুঅভ্যাসগুলো আগের মতো আষ্টেপৃষ্টে আছে।

তন্দ্রা কেটে যায়। শোয়া থেকে উঠে বসে। পাখার আওয়াজে দৃষ্টি বাইরে চলে যায়। মিলি আপন খেয়ালে বসে আছে।

'কখন এলে? আমাকে ডাকো নি কেন?'

'সময় বেশি হয় নি। মিনিট দশেক হবে। তোমাকে এমন মনমরা, রোগা মনে হচ্ছে কেন?'

'অনেকদিন পর দেখছো, তাই অন্যরকম মনে হচ্ছে। প্রায় বছর ঘুরে এলো, তাই না?'

'এগার মাস চব্বিশ দিন পর। তোমার খবর কী?'

আবিদ বলে, 'বাবা মারা গেলেন। সংসারের দায়িত্ব সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছি। তুমি তো মাস্টার্স ফাইনাল দিচ্ছ, না?'

'শুধু মাস্টার্স ফাইনাল নয়, জীবনেরও ফাইনাল কিছু হতে যাচ্ছে।'

'বুঝলাম।'

'তোমার এতো কিছু বোঝার দরকার নেই। যেমন আছো তেমন থাকো।'

'আমি কোনোভাবেই পেরে উঠি নি। অফিসের ব্যস্ততা, জমিজমার বিরোধ...।'

মিলি ধমকের সুরে বলে, 'থাক, আর বলতে হবে না। বান্ধবীকে নিয়ে রাজশাহী ঘুরে এলে। তখন সময় ছিল।'

আবিদ মিথ্যার আশ্রয় নেয়। বলে, 'বান্ধবী? ও তো বসের মেয়ে। অফিসের কাজে যেতে হয়েছে। তোমাদের বাসায় কয়েকবার গিয়েছি। তুমি ছিলে না।'

'মানুষ এতো বেড়ায় কিভাবে?'

আবিদ নমনীয় ভাবে বলে, 'প্লিজ, এতোদিন পর দেখা, ঝগড়া-বিবাদে না জড়িয়ে এসো আমরা আনন্দদায়ক ভাবে সময়টুকু পাস করি।'

'সে সুযোগ কোথায়?' মিলি রাগত সুরে বলে।

'যদি তুমি-আমি ঠিক থাকি, আগের মতো হতে পারবো।'

মিলি বলে, 'বাবা আমার বিয়ে ঠিক করেছেন।'

'মেয়ে বড় হলে বাবা-মা এমন অনেক বিয়ে ঠিক করেন, আবার ভেঙ্গেও দেন।'

মিলি বলতে থাকে, 'তুমি আমার বাবাকে চেনো? তিনি এক কথার মানুষ। সিদ্ধান্ত বদলাবেন না। বড় আপুর বেলায় যা ঘটেছিল, আমার বেলাও তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে যাচ্ছে। কাল রিং পরাবে, সপ্তাহ খানেকের মধ্যে উঠিয়ে নিয়ে যাবে।'

'বর কী করেন, কোথায় থাকেন? আমি তার কাছে গিয়ে সব বলবো।'

'আমি কিচ্ছু জানি না।'

'তোমার মতামত নিবে না?'

মিলি বলে, 'আমার মতামতের কোনো দাম নেই। আমার বাবা এ পর্যন্ত যতোগুলো পাত্র ঠিক করেছেন সবাই সাংসারিক জীবনে খুব সুখী।'

আবিদ বলে, 'তুমি সুখের চিন্তায় বিভোর হয়ে আছো।'

'বাজে বকো না। তোমাকে কিংবা বাবা-মা, কাউকেই ছাড়তে পারবো না। চলো, নিজেদের সিদ্ধান্তটা নিজেরা নিয়ে নিই।'

'এতোটা স্বার্থপর হতে পারবো না।'

'আমাকে ঘিরে সাধ-আহ্লাদ, স্বপ্ন, সবকিছু স্মৃতির অতলে ডুবে থাক, তা তুমি চাও?'

'তাঁদের ইচ্ছে পূরণ আর আমাদের জীবনের বলিদান। কী করবে এখন?'

মিলি অস্থিরভাবে বলে, 'আমার সবকিছু হিজিবিজি হয়ে যাচ্ছে। বেসামাল আমি।'

'তুমি জানো যে, ভালোবাসার বস্তু হারালে বেঁচে থাকার সাধ মরে যায়।'

মিলি ধমকের সুরে বলে, 'ভণিতা রাখো। এতোদিন কোনো খোঁজ-খবর নেই। এখন চোখের সামনে পেয়ে দরদ উথলে উঠছে। বলো তো, তোমাকে আমি কতোগুলো চিঠি দিয়েছি?'

আবিদ বলে, 'ওম...একটু দাঁড়াও, হিসেব করে দেখি।'

মিলি বলে, 'পারবে না। তোমরা পুরুষ মানুষেরা সেভেন-আপ, পেপসির মতো একবারে ফুসিয়ে উঠে নেতিয়ে পড়ো। তোমাদের আবেগ চটজলদি পরিবর্তন হয়।'

'ব্যাচেলরদের কাছে প্রেমিকা ও চিঠি কোনোটাই নিরাপদ নয়।'

'কেন?'

'ঘন ঘন মেস পরিবর্তন, অন্যের সাথে শেয়ার করে থাকা-খাওয়া, অনেক কিছু হারিয়ে যায়।'

মিলি বলে, 'ইচ্ছে থাকলে আগলে রাখা যায়।'

আবিদ জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কি তোমার চিঠির প্রতিজ্ঞাগুলো মনে রেখেছো?'

'আমার দাবি-দাওয়া-প্রতিজ্ঞা সীমিত। ছোট একটি সার্কেল। বারবার ঘুরে একই পথে আসে।'

আবিদ বলে, 'তুমি আমাকে বাহাত্তরটা চিঠি দিয়েছো। তোমাকে একজাক্ট উত্তর দিলাম। সাতটি চিরকুট ও পঁয়ষট্টিটি চিঠি। এর মধ্যে পঁয়ত্রিশটি নীল থলে, বিশটি হলুদ ও সাদা খামে এবং দশটি দিয়েছো নরমাল খামে। আর চিরকুট পাঠিয়েছো তোমার মহল্লার ছোট ভাই খোকনকে দিয়ে।'

মিলি জিজ্ঞাসা করে, 'তাহলে এতো ভণিতা করলে কেন?'

'কোনো কোনো বুদ্ধিজীবীরা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার পরেও সময় নেন। তাৎক্ষণিক উত্তর দেন না।'

মিলি বলে, 'নিজেকে খুব বিচক্ষণ ভাবো, তাই না।'

'খুব না, অল্প অল্প।'

'আমি উঠি।'

'এতো উঠি-উঠি করো কেন? কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই বৈঠক মূলতবি হচ্ছে।'

'সব সিদ্ধান্ত ৭৩ নম্বর চিঠিতে লেখা আছে। আমি আসবো। আমি আবার ফিরে আসবো।'

আবিদ ঠাট্টা করে বলে, 'বিয়ের পর?'

'যখন আসি আসবো। ভালো কথা, আমার মহল্লার কিছু বখাটে ছেলের কথা তোমাকে বলেছিলাম না? ওরা খুব ডিস্টার্ব করছে। আমি যেখানে যাই ফলো করে। আজও আসার সময় ফলো করছিল। আমি হুট করে রিকশাঅলাকে একটা গলিতে ঢুকিয়ে দিতে বলি। একটা খাবারের হোটেলে ঢুকে কিছুক্ষণ বসে চা খেলাম। এদিক ওদিক দেখে নিশ্চিত হয়ে তারপর রিকশা চেঞ্জ করে এখানে এলাম।'

'এখন র‍্যাব বাহিনী আইন শৃঙ্খলা উন্নতির দায়িত্বে নিয়োজিত। ওদেরকে তা বলতে পারো।'

'কিছুদিন না হয় জেলের ভিতর থাকবে। বের হবার পর আরো হিংস্র হয়ে উঠবে। সাময়িক নয়, আমি একটা স্থায়ী সমাধান খুঁজছি।'

'একজন মানুষকে নিয়ে যদি এতো সমস্যা হয়, তবে কোন দিক সামাল দিব?'

মিলি বলে, 'বর্তমান যুগে প্রত্যেকটি মেয়েকে নিয়েই সমস্যা। যে যে-পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত, সে শুধু সেটাই জানে।'

'তাহলে এখন কী করবে?'

'ভাবছি। বাবা সেজন্যাই বেশি চিন্তিত। শেষ পর্যন্ত একটা মাস্তানের হাতে জিম্মি হলাম।'

আবিদ বলে, 'তুমি ওর সাথে কথা বলে দেখো।'

'ওকে দেখলে ঘৃণায় গা শিরশির করে, আবার ওর সাথে কথা বলবো?'

'এটা তোমার অহমিকা। যাকে নিয়ে সমস্যা তার সাথে আলাপ করা শ্রেয়। সমস্যা দ্রুত ও সহজে নিরসন হয়।'

'তোমার কথা ভেবে দেখবো।'

'চলো, তোমাকে এগিয়ে দেই।'

মিলি বলে, 'একা এসেছি, একাই যেতে পারবো।'

আবিদ বলে, 'আমি অন্য কিছু মিন করি নি। জাস্ট ফর গিভিং কম্প্যানি। কতোদিন তোমার পাশাপাশি পথ চলি নি। যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তুমি দূর-মানুষ হয়ে যাবে। এখন এটা তো শুধু সময়ের ব্যাপার। তাই এ লোভ সামলাতে পারছি না।'

জীবন এ চোরাবালির মোহনায় এসে ভিড় করলো, সেখান থেকে বের হবার পথ মিলির জানা নেই। চুপ করে মৌন সম্মতি দেয়।

বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশে রোদের ঝিলিক। ব্যস্ত শহরের মানুষগুলো ছুটে চলেছে অবিরাম। মিলি ও আবিদ পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করলেও একটু পরেই তাদের ছন্দপতন ঘটে। অন্যকে সাইড দিতে হয়। দুজনে আগ-পিছ হয়ে যায়। আবিদ দাঁড়ায়। বলে, 'এভাবে কষ্ট না করে তুমি রিকশা নিয়ে চলে যাও।' মিলি গভীর মমতা নিয়ে আবিদের দিকে তাকায়। আবিদও মিষ্টি হাসে। বিদায়ের স্মৃতি আনন্দময় হয়ে থাকে দুজনের মনে।

বাসায় ফিরে খাম খোলে আবিদ। চিঠি পড়ার আগ্রহ আজ কেন তার এতো বেশি তাড়া করছে, সে জানে না। বুকের ভিতরে কে যেন হাতুড়ি পেটা করে চলছে অবিরত।

> এখন আমরা এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি, চিঠি লেখার মতো ছেলেমানুষি খেলা ভালো লাগে না। চিঠির মাধ্যমে অনেক কথা খোলামেলা বলা যায়। মুখে তা বলা যায় না। তোমাকে যা বলার আগেই বলেছি। একজনের সাথে এতো দিনের সম্পর্ক ভেঙ্গে নতুন সম্পর্ক করা সম্ভব নয়। আমরা বিয়ে করবো। খুব শীঘ্রই। তুমি প্রস্তুত থেকো। বখাটে মাস্তানদের কাছ থেকে মুক্তি পাবার পথ জানি না। তবুও ভরসা রেখো। আমি ঠিকই চলে আসবো।

মিলির চিঠিতে কোনো সম্বোধন বা ইতি নেই। এতো ছোট চিঠি একবারের বেশি পড়তে হয় না, মুখস্থ হয়ে যায়। চিঠিটা ভাঁজ করে বাক্সে ঢুকিয়ে রাখে।

মিলি বাসায় এসে বাবার সাথে আলোচনায় বসে। বাবা বিভিন্ন যুক্তি-তর্ক দেখাতে থাকেন। মিলি কোনোটাই মেনে নিচ্ছে না।

'তুমি আমার সুখের জন্য সবকিছু করবে, তাই না? অর্থ-সম্পদে আসল সুখ নেই। সুখ জিনিসটা একান্তই ব্যক্তিগত। আবিদকে আমি কথা দিয়েছি বাবা। ওকে আমি কী করে না করি? মানুষের সাথে প্রতারণা করতে পারবো না। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অন্যকে ঠকালে জীবনের এক পর্যায়ে আমিও ঠকে যাবো।'

'মা মিলি, জীবন ছেলেখেলা নয়। তুমি ইচ্ছে করলেও এ খেলা ভেঙ্গে দিতে পারবে না। সময় নিয়ে ভেবেচিন্তে বলো।'

'বাবা, আমি সাত বছর যাবত ভাবছি—বিয়ে-শাদি এক ধরনের লটারি। নিয়তিও বলতে পারো। এই গ্যাম্বলিংয়ে কে জিতবে, কে হারবে বলা মুশকিল। তবুও পরিস্থিতি জানা থাকলে প্রটেস্ট করতে সুবিধা হয়।'

'মা, তোমার বোনদের কেউ আমার কথার প্রতিবাদ করে নি। যুগ পাল্টিয়েছে। সবসময় আমার সিদ্ধান্ত যে ঠিক হবে তাও নয়। এখন সবাই ছেলেমেয়েদের মতের

ওপর প্রাধান্য দিচ্ছে। আমিও তোমাকে সে সুযোগ দিলাম। সুযোগের অপব্যবহার করো না।'

রাতে মোবাইলে মিলি ওর বাবার সিদ্ধান্ত এবং ওর নিজের মতামত আবিদকে জানায়। বাবা রাজি হয়েছেন। আবিদের ফুরফুরে মেজাজ এখন। সফলতা মানুষকে আনন্দের সাগরে অবগাহন করতে সাহায্য করে। আবিদ কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। জীবন জুড়ে শুধু ব্যর্থতা। মিলি পাশে থাকলে সফলতার সিঁড়ি অনায়াসে হাতড়ে পাবে। ব্যর্থতার সব কলঙ্ক, গ্লানি এক নিমিষে দৌড়ে পালাবে।

পরদিন অফিস থেকে ফেরার পথে শপিং কমপ্লেক্সে যায় আবিদ। বিয়ের আগে নিজেকে গুছিয়ে নেয়া দরকার। কয়েকটা ভালো প্যান্ট-শার্ট, এক জোড়া জুতা কিনতে হবে। একবারে সবকিছু কেনার সামর্থ্য নেই। অল্প অল্প করে পর্যায়ক্রমে কিনতে হবে।

আবিদ শার্ট পছন্দ করতে পারছে না—স্ট্রাইপ, না এক-কালার কিনবে। মিলি পাশে থাকলে ভালো হতো। কেনাকাটার সময় অন্যের সুপারিশ, পরামর্শ পেলে সুবিধা হয়।

এক মেয়েলি কণ্ঠের ডাকে এদিক-ওদিক ফিরে তাকায়। বাচ্চাসহ এক ভদ্রমহিলা এগিয়ে আসছেন। আবিদ ঠিক বুঝতে পারছে না এখানে আবিদ নামে অন্য কেউ আছে কিনা। ভদ্রমহিলা আবিদের পাশে এসে দাঁড়ান। আবিদের কিছুই মনে পড়ছে না। চেনার ভান করে মিষ্টি হাসে।

'আপনার বন্ধুর মৃত্যুর পর মাত্র একবার গিয়েছিলেন। চারদিনের মিলাদ মাহফিলে। এরপর আর কোনো খোঁজ-খবর নেন নি।'

আবিদের চোখের সামনে থেকের স্মৃতির পর্দা সরে যেতে থাকে। রেহমানের স্ত্রী রুমা ভাবী। রেহমান সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিল।

'কেমন আছেন?'

'ভালো।'

আবিদ বাচ্চাকে কোলে নেয়ার চেষ্টা করে। আসে না। মায়ের কাপড় ধরে আগলে থাকে।

রুমা ভাবী বলেন, 'যাও আম্মু, তোমার চাচ্চু।' কোনো লাভ হয় না। আবিদ বলে, 'চলুন, কোথাও গিয়ে বসি।'

'বিয়ে-শাদি তো করেন নি। মার্কেটে একা দেখে বুঝতে পারলাম।'

আবিদ কিছু বলে না। একটু হাসে। ভাবী জিজ্ঞাসা করেন, 'আগের জব করছেন?'

'চেঞ্জ করেছি। আমার ভিজিটিং কার্ড দিচ্ছি।' মানিব্যাগ হাতড়িয়ে একটা কার্ড বের করে রুমা ভাবীর হাতে দেয়। ভাবী ভালো করে চোখ বুলিয়ে নেন, তারপর বলেন, 'আপনি এখানে বসুন।' আবিদ বসে।

'এটা কার নাম?' ভাবী জিজ্ঞাসা করেন। আবিদ কার্ড হাতে নিয়ে দেখে এটা অন্য একজনের কার্ড।

'স্যরি ভাবী, আমারটা দিচ্ছি। এটা আরেকজনের।' বলে মানিব্যাগ কয়েকবার খুঁজে দেখে। আবিদের মনে পড়ে ওর ভিজিটিং কার্ডগুলো শেষ হয়ে গেছে। বলে, 'ভাবী, পরে আমি বাসায় পৌঁছে দিব।'

'আপনি ঠিক আপনার বন্ধুর মতো। আমি ওর মানিব্যাগ চেক করে ভিজিটিং কার্ড, খুচরা টাকা ঢুকিয়ে রাখতাম। একবার এক রিকশাঅলার সাথে তর্ক জুড়ে দিল—রিকশা

যখন চালাবে তখন ভাংতি রাখবে না কেন? এই পুরো একশত টাকা দিলাম। বাংলাদেশ ব্যাংকে গিয়ে চকচকে নোট নিয়ে ভাংতি করে রাখবে।'

'ভাবী, কিছু মনে না করলে একটা পার্সোনাল প্রশ্ন করি? আপনি কি অন্যকিছু ভাবছেন?'

'আপনি যা বলতে চেয়েছেন তা আমি বুঝেছি। না, এ ধরনের কোনো চিন্তাচেতনা আমার মধ্যে নেই। শ্বশুর-শাশুড়ি অনেক পিড়াপিড়ি করেছেন। আমি রাজি হই নি। মেয়ে বড় হলে আমাকে স্বার্থপর-লোভী ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারবে না।'

'ভাবী আসুন, বসে এক কাপ চা খাই।'

'খাদ্যে ভেজাল। পত্রিকায় ফলাও করে প্রচার হবার পর বাইরের খাবার বন্ধ করে দিয়েছি। বাসায় আসুন। গল্প করতে করতে চা খাওয়া যাবে।'

'আপনি কি ইস্কাটনের বাসায় আছেন?'

'ইস্কাটন নয়, কাটাবন। পরীবাগ। পিজি হাসপাতালের পিছনে।'

'স্যরি ভাবী। সব ভুলে যাই। বাচ্চার নাম কী রেখেছেন?'

'আপনার বন্ধু রেখেছিল প্রাপ্তি।'

'রেহমান মারা গেলো এক বছর হবে না ভাবী?'

'আজ এক বছর চার দিন।'

'আম্মু, তুমি কী খাবে?' আবিদ বাচ্চাকে আদর করে জিজ্ঞাসা করে। সে বলে, 'আইসক্রিম, চকোলেট।'

'ভাবী একটু দাঁড়ান। আমি ওর জন্য একটা আইসক্রিম নিয়ে আসি। আপনার জন্য একটা আনি?'

'না, থাক।'

'আজ না হয় ইচ্ছে করেই শরীরের কিছু ক্ষতি করি। মাত্র একটা আইসক্রিম!'

রুমা বাধা দেয় না। আবিদ চটপটে চলে যায়। আইসক্রিম কেনার পর ভাবীকে খুঁজে পায় না। কোথায় দাঁড়ানো ছিল ভালো করে খেয়াল করে নি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন পাওয়া গেলো তখন আইসক্রিম গলে গেছে। আবিদ বোকার মতো হাসে।

'দোষ আপনার নয়। আমি ইচ্ছে করে একটু সরে গিয়েছিলাম। আপনি তবুও খুঁজে পেলেন। আপনার বন্ধু পারতো না। বিয়ের পর প্রথম মার্কেটে এসেছি। কিছু কেনাকাটা আছে। গরমের দিন ছিল। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল। ওকে বললাম, তুমি দুটো ঠাণ্ডা সফ্‌ট ড্রিঙ্কস নিয়ে এসো। ড্রিঙ্কস কেনার পর আমাকে আর খুঁজে পায় নি। সারা মার্কেট কয়েকবার রাউন্ড দিয়েছে। আমি খুঁজি ওকে, ও খোঁজে আমাকে। দু ঘণ্টার বেশি সময় পার হয়ে গেছে। নতুন বউ। একাও বাসায় ফিরতে পারছি না।'

'তখন কী করলেন?'

'মেয়েমানুষ, কী করবো? এক দোকানে বেশি সময় দাঁড়িয়ে থাকতে সংকোচ বোধ হয়। দোকানিরা ভিন্ন দৃষ্টিতে তাকায়। আমার কাছে যা টাকা ছিল তা দিয়ে কেনাকাটা করলাম। ফিরে যাবার পথে গেটের সামনে ওর সাথে দেখা।'

'ভাবী, একদিন আমার ওখানে আসুন।'

'আসবো। ভালো কথা, আমি একটা পুনর্বাসনকেন্দ্র স্থাপন করেছি। একদিন আসুন না, আমাদের কার্যক্রম দেখে যান।'

'ফান্ড কালেক্ট করেন কিভাবে?'

'ব্যক্তিগত উদ্যোগে। নিজে যা পারি দিচ্ছি। তারপর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, সমাজের বিত্তশালীদের কাছে হাত পাততে হয়।'

আবিদ এর প্রশংসা করে বলে, 'একটা মহতী উদ্যোগ। আপনার এখানে কোন ধরনের মহিলারা বেশি আসেন?'

'এসিডদগ্ধ, তালাকপ্রাপ্তা, অসহায়, দুঃস্থ মহিলারাই বেশি।'

মিলির মোবাইল বন্ধ। কয়েকদিন যাবত যোগাযোগ নেই। দুশ্চিন্তায় ভালো ঘুম হয় না আবিদের। একের পর এক অশুভ চিন্তা তাড়া করে। কয়েকবার মিলিদের বাসায় যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিয়ে ঠিক হওয়া হবু জামাইদের শ্বশুর বাড়ি যাওয়ায় অলিখিত নিষেধ। এতোসব সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, বিধি-নিষেধ মেনে চলা মানে নিজের দুঃখকে লালন করা।

একদিন সমস্ত নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা না করে চলে আসে মিলিদের বাসায়। গেট পার হবার পর কেমন জানি অগোছালো মনে হয়। গেটের বরাবর লনে সারি সারি ফুলের টব। এক নজর দেখে যা মনে হলো—গাছে পানি দেয়া হচ্ছে না অনেকদিন। অযত্নে মরতে যাচ্ছে সবগুলো সজীব, বাড়ন্ত গাছ। বাড়িতে নিস্তব্ধতা। গেটের সামনে দারোয়ান নেই। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে যায় আবিদ। কলিংবেল বাজতে থাকে। কেউ জবাব দেয় না। নেমে আসে সে। কাউকে না পেয়ে আবারো ওপরে আসে। অপরিচিত এক বয়স্কা মহিলার কণ্ঠ।

'বাসায় কেউ নেই। আপনি কয়েকদিন পর আসুন।'

আবিদ কিছু বলার আগেই মহিলার চলে যাওয়ার শব্দ পেলো। ভালো করে লক্ষ করে দেখে—বাইরে থেকে তালা ঝুলছে। দ্রুত নিচে নেমে আসে। দারোয়ানকে গেটের সামেন দেখতে পেয়ে ছুটে যায় তার কাছে। মিলিরা কেউ বাসায় নেই।

'আপনি আবিদ সাহেব?'

আবিদ হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ে।

'আপনি কিছুই জানেন না?'

'না, আমি কিছুই জানি না। চুপ করে থাকবেন না। প্লিজ বলুন।'

দারোয়ান দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে। তারপর বলে, 'মিলি আপুকে সন্ত্রাসীরা এসিড ছুঁড়েছে।'

আবিদের পৃথিবী এলোমেলো হয়ে যায়। বলে, 'এসিড ছুড়েছে! কারা?'

'আমি কিছু জানি না।'

দু-তিন মিনিট পর স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করে। জিজ্ঞাসা করে, 'মিলি এখন কোথায়?'

'ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বার্ন ইউনিটের তিন নম্বর কেবিনে।'

'মিলি বাঁচবে তো?'

'আমাকে কেউ কিছু বলে না। মুখ বিকৃত হয়ে গেছে। দেখলে ভয় করে।'

আবিদ গেট থেকে বের হয়। সিএনজি, রিকশা, বাস, কোনটা নেবে? আলোর গতি হলে ভালো হতো, এক সেকেন্ডের মধ্যে পৌঁছে যেতে পারতো। একটা সিএনজিতে

করে হাসপাতালে চলে আসে। সিএনজি থেকে নেমে হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। আগেও এ হাসপাতালে এসেছে। এখনকার মতো এতো অপরিচিত মনে হয় নি। পুরো হাসপাতালকে মনে হচ্ছে একটি বড় গুহা। যে কোনো একটি প্রবেশপথ দিয়ে ভেতরে ঢুকলে ফিরে আসার রাস্তা হারিয়ে ফেলবে। ভয়, সঙ্কোচ, দুশ্চিন্তায় এক পা-ও বাড়াতে পারছে না। পা দুটো ভারী হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, কে যেন শিকল জড়িয়ে দিয়েছে। ছোট একটি বাচ্চার সাথে ধাক্কা লেগে সম্বিত ফিরে পায়।

ডাক্তারি পড়ুয়া এক ছেলে গেট দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। আবিদ তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'প্লিজ ভাইয়া, বার্ন ইউনিট কোথায়?'

ছেলেটি আবিদের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে। কী যেন বুঝে নেয়। তারপর বলে, 'চলুন আমার সাথে।'

অন্ধের মতো ছেলেটিকে আঁকড়ে ধরে বার্ন ইউনিটে আসে আবিদ।

'এটা বার্ন ইউনিট। আপনার পেশেন্টের নাম?'

'মিলি।'

'হ্যাঁ, সপ্তাহ খানেক আগের পেশেন্ট। আপনি পেশেন্টের কী হোন?'

আবিদ এ প্রশ্নের উত্তর দেয় না। বলে, 'আমি কি তাকে দেখতে পারবো?'

'আসুন আমার সাথে।'

কেবিনের ভিতর ঢোকে আবিদ। চতুর্পাশে আত্মীয়স্বজনদের ভিড়। সে মিলির বেডের পাশে দাঁড়ায়। নিথর হয়ে পড়ে আছে মিলি। মাথা থেকে বুক অবধি সাদা কাপড়ে মোড়া।

মিলির বাবা-মা এসে আবিদকে বাইরে নিয়ে যান। মিলির মা হাঁউমাঁউ করে কেঁদে ফেলেন।

'আমরা কারো অনিষ্ট করি নি। তবু কেন আমাদের এতো বড় সর্বনাশ হয়ে গেলো?' আবিদ সান্ত্বনা দেবার ভাষা হারিয়ে ফেলে। দু চোখ বেয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ে।

'আমাকে খবর দেন নি কেন?'

'এ সর্বনাশের খবর কি কাউকে দেয়া যায় বাবা? আমার এতো সুন্দরী মেয়ে অসুস্থ সমাজ ব্যবস্থার শিকার। যে মেয়ে ছিল সমাজের সম্পদ, সে এখন সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।' মিলির মা কাঁদতে কাঁদতে বলেন।

'খালাম্মা, আপনি শান্ত হোন। এগুলো ভাবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আগে ওকে সুস্থ করে তুলতে হবে। মানসিকভাবে চাঙ্গা রাখতে হবে।'

'বিকৃত চেহারার মেয়েকে কে বিয়ে করবে? কে ওকে স্ত্রীর মর্যাদা দেবে? তুমি কি পারবে বাবা?'

'আপনি নার্ভাস ফিল করবেন না। আমি তো আছি। সময় বলে দেবে কী করা দরকার। আমরা মহান আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করি, তিনি যেন ওকে দ্রুত সুস্থ করে দেন।'

আবিদ ছুটির পর প্রতিদিন হাসপাতালে ছুটে আসে। অনেক রাত পর্যন্ত থাকে। ভাগ্যের ওপর দোষ চাপিয়ে মিলিকে সান্ত্বনা দেয়। মিলি কিছুতেই ভরসা পায় না। দীর্ঘদিন হাসপাতালের বেডে শুয়ে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছে সে। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে। মুখের ঘা এখনো বীভৎস। তবু মিলি আমতা আমতা করে কথা বলে।

পুলিশ কয়েকবার মিলির স্টেটমেন্ট নিয়েছে আসামিকে গ্রেফতারের জন্য। সন্দেহভাজন লোকদের তালিকা চেয়েছে পুলিশ। মিলি পাড়ার মাস্তান সোহেলের নাম একবারও বলে নি। মিলির এখনো দৃঢ় বিশ্বাস সোহেল এ কাজ করে নি। দফায় দফায় পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে মিলি কোনো স্বীকারোক্তি দেয় নি। সোহেলের সাথে মিলির কথা হয়েছে কয়েকবার। কাউকে ভালোবাসলে তার ওপর প্রতিশোধ নেয়ার প্রশ্ন ওঠে না। সোহেলের সাথে অন্য মানুষের যে সম্পর্কই থাকুক না কেন, মিলির কোনো ক্ষতি হতে দেবে না। সোহেলের আচার-আচরণে সে রকম লক্ষণ ফুঠে উঠেছে।

মিলির বাবা-মা ও আত্মীয়স্বজনদের ক্ষোভ সোহেলের ওপর। সোহেলকে এক নম্বর আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। সোহেল নিজেকে লুকানোর কোনো চেষ্টা করে নি।

পুলিশ সোহেলদের বাড়ি থেকে ওকে গ্রেফতার করেছে অনেক আগে। সে এখন জেলে বন্দি। দ্রুত বিচার-মামলায় বিচার হচ্ছে। বিভিন্ন সংগঠন এর সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংগঠনও পিছিয়ে নেই। তারা দ্রুত বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট সহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে।

আবিদ অফিস থেকে ছুটি নিয়ে রুমা ভাবীর পুনর্বাসনকেন্দ্রে এসে হাজির হয়। ভাবী খুব খুশি।

'এতোদিন পরে মনে পড়লো বুঝি! বুঝলেন ভাই, অন্যান্য অফিসের মতো ডেকোরেশন, ফার্নিচার, লাইটিং দেখে প্রথম দর্শনে মুগ্ধ হবার মতো কিছুই আমাদের নেই। তবে আমাদের দুরবস্থা সত্ত্বেও আমরা হাত গুটিয়ে বসে নেই। সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে অনেককে স্বাবলম্বী করে গড়ার লক্ষে লড়াই করছি। চূড়ান্ত বিজয় আমাদের হবে কিনা জানা নেই। নিজেদেরক আমরা ঠিকই সেপারেট করতে পারবো, অন্যের করুণা বা দয়ার হাত থেকে।'

পনর জন এসিডদগ্ধ মহিলা বিকৃত চেহারা নিয়ে এ আলোকিত সমাজে ফিরে যাবার চেষ্টা করছে। প্রথমে আবিদের কাছে ভৌতিক পরিবেশ মনে হলেও পরে স্বাভাবিক হতে পারছে। মানুষের দুঃখ-কষ্ট শেয়ার করে নেয়ার মধ্যে এতো আনন্দ, আবিদের তা জানা ছিল না।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায় মিলি। ছুটির দিনগুলোতে আবিদ প্রায়ই মিলিকে ওর ওখানে নিয়ে আসে। সারাদিন থাকে। সন্ধ্যার পর বাড়িতে দিয়ে আসে। অন্যান্য দিন আবিদ যায় মিলিদের বাসায়। থাকে অনেক রাত পর্যন্ত। রাতের খাবার সেরে ফিরে আসে। মিলিকে স্বাভাবিক রাখার জন্য ওদের প্রস্তুতির কোনো ঘাটতি নেই। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়াপড়শি সকলেই উদার সহযোগিতা করছে।

এক ছুটির সকালে মিলি এসে আবিদের ঘুম ভাঙ্গায়।

'তোমাকে নিয়ে যাবো এক জায়গায়। তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও।'

'কোথায় যাবে?'

'এটা তোমার জন্য সারপ্রাইজ। আবার তোমার ভালো নাও লাগতে পারে।'

আবিদ আর প্রশ্ন করে নি। মিলির সাথে বের হয়। মিলি গাড়ি ভাড়া করেছিল। আবিদের কিছু জানার সামান্যতম সুযোগ ছিল না। ওর ঘুম থেকে বেলা করে ওঠার অভ্যাস। ঘুমের রেশ কাটে নি। মিলির পাশে বসে ঝিমুতে থাকে।

গাড়ি গাজীপুর এসে থামে। মিলি আবিদকে জাগিয়ে দেয়। আবিদের চোখ পড়ে অদূরে একটি সাইনবোর্ডের ওপর—গাজীপুর কারাবাস।

আবিদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। মনের মধ্যে একত্রে অনেকগুলো প্রশ্ন উঁকি দেয়। মিলিকে কিছু জিজ্ঞাসা করার অবস্থা থাকে না। গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে থাকে আবিদ। মিলি পার্স থেকে টাকা বের করে ভাড়া মিটিয়ে দেয়। আবিদ অনুতপ্ত হয়। গাড়ি ভাড়া ওরই দেয়া উচিত ছিল। নিজের কর্তব্য ভুলে গিয়েছিল। নিজের ওপর বিরক্ত হয়। মিলি কী ভাববে কে জানে?

'এই, এদিকে এসো।'

আবিদ মিলির কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। তারপর জিজ্ঞাসা করে, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'ঐ দেখো সাইনবোর্ড। পড়লে বুঝতে পারবে।'

'এখানে কেন? এখানে থাকে সব অপরাধীরা, যাদের বিচারের পর দীর্ঘমেয়াদী সাজা হয়ে গেছে। তুমি যা করো না। কয়েদীদের মধ্যে এসে আবার কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে?'

মিলি উত্তেজিত হয় না। ধৈর্য্য ধরে হাঁটতে থাকে। বলে, 'জানো আবিদ, এখানে যাঁরা থাকেন তাঁরা সবাই অপরাধী নন। এখানে অনেক ভালো লোক সাজা ভোগ করছেন।'

'তোমার কথা একেবারে যে মিথ্যা তা নয়। কিন্তু তার জন্য মানবাধিকার সংস্থাগুলো রয়েছে। কতো বড় বিপদ থেকে বেঁচে গেছো। আবারো ঝামেলায় জড়াচ্ছো কেন?'

'আমি নিজে ভুক্তভোগী বলে খুব সহজে অন্যের দুঃখকষ্ট উপলব্ধি করতে পারি। সুখের সময় দ্রুত পার হয়ে গেলেও দুঃখের মুহূর্তগুলো অনেক ভারী, যন্ত্রণাদায়ক। আমি এমন একজন নিরপরাধ লোককে ছাড়িয়ে নিতে এসেছি।'

মিলির হাতে সোহেলের রিলিজের কাগজপত্র। অফিসকক্ষে বসে মিলি জেল কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ করে নেয়। জেলার জানায়, 'হলিডেতে রিলিজের ব্যবস্থা করা কষ্টকর। আপনি কাগজপত্র রেখে যান, আমরা কাল ব্যবস্থা করে দিব।'

'দয়া করে সোহেলকে একটু ডেকে দিবেন?'

'অবশ্যই। আপনারা কি কোনো সংস্থার পক্ষ থেকে এসেছেন?'

মিলি নিজের পরিচয় দেয়—'আমরা সাধারণ লোক। সোহেল আমার পরিচিত।'

'অনেকে সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের এড়িয়ে চলে। কারো কারো বাবা-মা, আত্মীয়স্বজনও খোঁজ নেন না। আর আপনি পরিচিত কারো জন্য এতো কিছু করছেন?'

মিলি কোনো জবাব দেয় না।

সোহেল এসে গেছে। পরিচিত কাউকে না দেখে ইতস্তত করে।

'কেমন আছো সোহেল?' মিলির কথায় ফিরে তাকায়। মিলিকে খোঁজে।

'এই যে আমি। তুমি আমাকে চিনতে পারো নি?'

'কণ্ঠ শুনে বুঝেছি। তোমাকে কখনো বোরখা পরতে দেখি নি।'

'এখনো দেখতে না। সব আমার নিয়তি।'

'তুমি বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে এসিড ছুঁড়ি নি। কামালের গ্রুপের ছোটন এসিড ছুঁড়েছে, আমাকে ফাঁসিয়ে দেয়ার জন্য। তোমার বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন সবাই ভাবছে, তোমার বিয়ে ঠিক হয়েছে, তাই আমি তোমাকে এসিড ছুঁড়েছি।'

'আমি জানি।'

'তুমি বিশ্বাস করো, এ কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া এ কাজ করলে আমি পালিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু কেউ আমাকে বিশ্বাস করলো না। তুমি একবার মুখ খোলো। আমি তোমাকে দেখি।'

অনেক পিড়াপিড়ির পর মিলি মুখ খোলে।

সোহেল মুখ ঢেকে দেয়। অস্থির হয়ে ওঠে। 'তুমি কোনো চিন্তা করো না। আমি এর প্রতিশোধ নেবো। ওদের গোষ্ঠি সহ আসমানে পাঠিয়ে দিব। আমার সাজার মেয়াদ দ্রুত কমে যাচ্ছে। আর মাত্র পাঁচ-ছয় বছর। ওদের সবাইকে খুন করে আমি নিজেই ধরা দিব। এরপর আমার যা হবার হবে।'

'শান্ত হও সোহেল। ছোটনকে আমি কথা দিয়েছি ওদের কোনো ক্ষতি করবো না। ছোটন আর আমার স্টেটমেন্টের ভিত্তিতে তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করেছি।'

'এ তুমি কী করলে? আমি এ মুক্তি চাই না। মুক্তি মানে তো আত্মার মুক্তি। বিবেকের মুক্তি। যতোবার তোমার কথা মনে হবে, ততোবার আমি অপরাধী হবো। এ অপরাধ বোধ থেকে জীবনেও আমার মুক্তি মিলবে না। বাহ্যিক মুক্তি আসল মুক্তি নয়।'

'পাগলামি করো না সোহেল। প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তাচেতনা সমাজের শান্তি বিনষ্ট করে। আমরা যদি নমনীয় হই, অন্যকে ক্ষমা করে দেই, সমাজ বদলে যাবে। প্রতিহিংসা, অন্যায়-অবিচার পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটে চলছে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়।'

সোহেল কথা বাড়ায় না। চুপ করে থাকে। মুক্তির স্বাদ অনেকেই বোঝে না। মুক্তি মানে ঘরে ফিরা এবং উদার নীতি মেনে চলা।

আবিদ পাশে দাঁড়িয়ে চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। মিলি আবিদের হাতে হাত রাখে। তারপর বলে, 'তুমি রাগ করো নি তো?'

আবিদ মিষ্টি করে হাসে। বলে, 'রাগ করবো কেন? তুমি অনেক চমৎকার কাজ করেছো। যেখানে বেশির ভাগ মানুষ নিজেদের দায়িত্ব অবহেলা করে, সেখানে অন্যের জন্য নিবেদিত প্রাণ আমাদের অহংকার, আমাদের গর্ব।'

আবিদকে না জানিয়ে এতো কিছু করার জন্য ক্ষমা চায় মিলি। আবিদ বলে, 'কাউকে না জানিয়ে অপরাধ করলে ক্ষমা চাইতে হয়। কিন্তু কারো অগোচরে, অলক্ষে ভালো কাজ করলে তার জন্য ক্ষমা নয়, থাকে আশীর্বাদ, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা।

আমি কখনো কারো উপকারে আসি নি। এখন থেকে তোমার প্রত্যেকটি কাজে আমাকে সাথে রাখবে।'

মিলি আনন্দের হাসি হাসে। কিন্তু আবিদের ঘোর কাটে না। মিলি এতো কাছের হয়েও কতো অপরিচিত। এ মিলির আবির্ভাব যেন এইমাত্র, সম্পূর্ণ অচেনা, নতুন আঙ্গিকে। মধুর এ যন্ত্রণায় বারবার দগ্ধ হতে চায় আবিদ।

• • •

শেষ দেখা

আর এ জামাল

উৎসর্গ :

আমার প্রাণপ্রিয় মা
রোকেয়া বেগম

লেখক-পরিচিতি

জন্ম ১ ডিসেম্বর ১৯৭০, ভোলায়। মা গৃহিণী, বাবা পরলোকগত। নয় ভাইবোনের মধ্যে আর এ জামাল চতুর্থ। লেখালেখিতে প্রাপ্তি এটুকুই যে, সবুজ অঙ্গন সাহিত্য পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক তিনি; এ ছাড়া, যায় যায় দিন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় তাঁর কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

ছায়া-ছায়া অন্ধকার চারদিকে। যেন কোনো জ্যোৎস্না রাত—এমন আলো-অন্ধকার সর্বত্র। ভয়াল চারদিক। গাছ-গাছালির ছায়ায় অন্ধকার জমাট হয়ে আছে। আর বাকি বিশ্ব জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হওয়ার কথা। অথচ তেমন ঝকঝকে জ্যোৎস্না নয়। কেমন ম্লান-ম্লান জ্যোৎস্না। পৃথিবীটা ছবির মতো স্থির। নীরবতা যেন মূর্ত হয়ে উঠছে প্রকৃতিতে। কাঁচা রাস্তার দু পাশে আলুক্ষেত। কোনো কোনো ক্ষেতে আলু তোলা হয়েছে, এখন শুকনো খড়খড়ে সাদা মাটিগুলো খুলে খুবলে আছে। আবার কোনো কোনো জমিতে এখনো আলু তোলা হয় নি। তাই ক্ষেতের বেশির ভাগ আলুগাছ মরে শুকিয়ে আছে বাদামি রং ধরে। আর কিছু কিছু আলুগাছ এখনো বেঁচে আছে, হালকা সবুজ রং তাদের।

চারদিকে এমন চিত্র। কামাল স্যার স্বপ্নের মধ্যে সেই কাঁচা রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলছেন। হাঁটছেন তো হাঁটছেনই। এ চলার শেষ কোথায় তিনি জানেন না। এ পথের শেষ কোথায় তা-ও তাঁর জানা নেই। স্বপ্নের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতেই অনুমান করলেন—এ রাস্তার এক্কেবারে শেষ প্রান্তে এসে দেখতে পাবেন বিশাল এক নদী, এর পরে আর রাস্তা নেই। তখন তিনি কী করবেন? রাস্তার শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে থাকবেন, নাকি ঝাঁপ দিয়ে নদীতে পড়বেন? কোনটা করবেন সে-অনুমান করতে পারছেন না।

তিনি হাঁটছেন তো হাঁটছেনই। যেন বিরাম নেই হাঁটার। তিনি যে এতো হাঁটছেন তবুও যেন ক্লান্ত বোধ করছেন না। এ পথ-ভ্রমণের অনুভূতিটা কেমন তা তিনি বুঝতেও পারছেন না, অনুভবও করতে পারছেন না।

হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার শেষ প্রান্তে এসে গেছেন। সম্মুখে বিশাল এক রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি—এর পরে আর কোনো পথ নেই। এভাবে এসে পথটা শেষ হয়ে যাবে তা বুঝতে পারেন নি। মনটা খারাপ হয়ে যায়। পথ, তুই মানুষকে ঘরে পৌঁছে দিস, অথচ তোর নিজের ঘর নেই। তোর জন্য আমার খুব খারাপ লাগছে রে...। পথের তো শেষ হতে নেই, পথ তো চলতেই থাকবে। এক পৃথিবী থেকে আরেক পৃথিবী পর্যন্ত। অথচ তুই থেমে গেলি এখানে এসে? কেন থামতে গেলি তুই? তুই কি পারতিস না ঐ প্রাসাদটিকে তোর একপাশে বসিয়ে দূর থেকে সুদূরে চলে যেতে? তবেই তোর মহত্ব থাকতো। এখন তো তুই হয়ে গেছিস তুচ্ছাতিতুচ্ছ। বিশ্ব এসে এখন তোর সাথে মিলবে না। তোর সীমা ঐ বাড়ি পর্যন্ত।

মন খারাপ নিয়েই কামাল স্যার পথশেষের বাড়িতে প্রবেশ করেন। সুনসান নীরবতা প্রাসাদের চারদিকে। সেই একই রকম আবছা ছায়া ছায়া আলো। জনমানবহীন প্রাসাদটিকে ভূতুড়ে-ভূতুড়ে লাগছে। ভয়ে তাঁর গা ছমছম করার কথা, অথচ কামাল স্যারের ভয় লাগছে না।

প্রাসাদের প্রতিটি দেয়ালে খাঁজ কাটা, থাকে-থাকে সাজানো আছে নরমুণ্ডুর এবং মহিষের শিংবিহীন কংকাল। কোনো কোনো মাথার খুলিতে এক পাটি দাঁত আছে। কোনো কোনো খুলিতে কোনো দাঁত নেই। এমন মাথার খুলি দু-একটা নয়, যেন লক্ষ লক্ষ মানুষ এবং মহিষের মাথার খুলি।

কামাল স্যার বিদেশী পর্যটকের মতো সেসব দেখতে থাকেন। স্ত্রী জোবেদা বেগমের ডাকে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়।

'ওডেন, তাড়াতাড়ি ওডেন, ফজরের আজান হইয়া গেছে, নামাজ পড়তে যান।'

স্যার উঠে বসেন। তাঁর বুক ঢিপঢিপ করছে এখনো। তাঁর মনে হয় তিনি স্বপ্নের মধ্যে খুব ভয় পেয়েছিলেন। এসব স্বপ্নের মানে কী?

মসজিদ থেকে ফজরের নামাজ আদায় করে এসে 'খোয়াবনামা' নিয়ে বসেন। পাতার পর পাতা উলটাতে থাকেন। মনমতো কোনো বিষয় খুঁজে পান না। দাঁত পড়া দেখলে মৃত্যু, সাপে ছোবল দেয়া মানে শত্রুর আক্রমণ। আপন দেখলে পরের হয়, পরকে দেখলে নিজের হয়, ইত্যাদি নানা বিষয় দেখা যায়। অথচ স্বপ্নে যা দেখেছেন সে-বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ খুঁজে পান না।

দৈনন্দিন মানুষ যেসব কাজ করে বা ভাবে, তাই কি স্বপ্নে দেখে? নিজের মনে কামাল স্যার প্রশ্ন করেন। হতেও পারে। খোয়াবনামা বন্ধ করে বসে বসে তখনো ভাবছেন। মনে মনে স্বপ্নটার একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাবার চেষ্টা করছেন। মাটির একটিমাত্র রাস্তা মানে কি মৃত্যুর সেই চিরন্তন পথ? আর ঐ বিশাল মৃত্যুপুরীই কি কবর? তবে কি মৃত্যু অত্যাসন্ন? ভয়ের হিমস্রোত নামে তাঁর মেরুদণ্ড বেয়ে।

দুপুরে ভাত খেতে বসে তাঁর অনুশোচনা হচ্ছে। কী শখ করে আজ ইলিশ মাছ এনেছেন! কচু দিয়ে রান্না করতে বলেছিলেন জোবেদা বেগমকে। স্কুল থেকে ফিরে এসে হাতমুখ ধুয়ে শখের রান্না মুখে দিয়েই মুখটা বিকৃত করে ফেলেন। ইশ, একটুও স্বাদ লাগছে না মুখে। থুথু করে ফেলে দেন তিনি। 'এইগুলো কী রানছো, নুন হয় নাই। ক্যামুন পানসা-পানসা।'

'কী কন? ঘরের বেবাকতেই তো কইলো আইজকার রান্ধনডা ভালা হইছে। হগলেই তো আইজ বেশি বেশি কইরা খাইলো। হুদা আপনের মুখেই স্বাদ ঠেকলো না। কে জানে, জিবলা থেইক্যা স্বাদ উইঠ্যা গেলো কিনা?'

কামাল স্যারের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। সত্যি সত্যি কি জিহ্বার স্বাদ নষ্ট হয়ে গেছে? মরার চল্লিশ দিন আগে থেকেই মানুষের রিজিক বন্ধ হয়ে যায়। তবে কি আমারও? ইলিশ মাছের আস্ত মাথাটা তাঁর থালায় পড়ে আছে। ভাত তাঁর পেটে যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে কাঁচা মাছের মাথা প্লেটে দেয়া হয়েছে। কেমন তাকিয়ে আছেন তার দিকে জ্বলজ্বলে চোখে। ইলিশ মাছের চোখে যেন অশুভ কিছু দেখতে পাচ্ছেন। কী দেখতে পাচ্ছেন তিনি?

তাঁর বয়স তখন সাত কি আট হবে। গ্রামের হাটে কী একটা সওদা করতে গিয়েছেন। হাটের মধ্যে নানান কিসিমের মানুষ। শনিবারের হাট ছিল। তাই লোকজন বেশি। কেউ কিনতে এসেছে, কেউ বিক্রি করতে এসেছে। কতো কিছু উঠেছে হাটে!

বাচ্চাদের হরেকরকম মনোলোভা জিনিসপত্র। খাবার জিনিস, বাদাম, নকুন দানা, (বাদাম চিনি একত্রে মিশিয়ে যে-খাবার তৈরি হয়), আলুর দম, আরো কতো কী।

কোনো কোনো স্থানে বড় ক্যাসেটপ্লেয়ার বেজে চলছে জোর ভলিউমে। কী সব কথা বলছে, সামনে লতাপাতা, গাছ-গাছড়ার শিকড়-বাকড়, ইত্যাদি। এখানে কী বিক্রি করা হচ্ছে, তিনি বুঝতে পারছেন না। অন্যস্থানে জাদু দেখাচ্ছে এক লোক। প্রচুর আগ্রহে গিয়ে দাঁড়ান, বুক দুরুদুরু করে ভয়ে। তবুও এসব জাদু দেখতে ভালো লাগে। কেমন যেন ভয়-মেশানো আনন্দ-উত্তেজনা। একবার দেখতেও ইচ্ছে করে। আবার না দেখে চলে যেতেও ইচ্ছে করে না। এমন অদ্ভুত নেশা এ জাদু প্রর্দশনীতে।

উঁচু করে তাবু টানানো হয়েছে। ভিতরে একটা বার-তের বৎসরের ছেলে ঢুকেছে একটু আগে। তাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। জাদুকর ইয়া বড় ছুরি সবাইকে দেখাচ্ছে। ইস্পাতের বা স্প্রিংয়ের নয় ছুরিগুলো। একেবারে অরিজিন্যাল লোহার ছুরি। জাদুকর বৃত্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদেরকে দেখাচ্ছে। সবাই শ্বাসরুদ্ধকর ভাবে তাকিয়ে আছে পরবর্তী দৃশ্য দেখার জন্য। জাদুকর ভীত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে হুকুম দিল—'সবাই হাতের মুঠো ছেড়ে দিন, খবরদার, এক মুহূর্তের জন্যেও নড়বেন-চড়বেন না। তাহলে শেষ হয়ে যাবে ছেলেটি।' ভয়ে সবাই অস্থির। যেন নিঃশ্বাস নিতে ভুলে গেছে দর্শক। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সবাই জাদুকরের দিকে। হাতের বিশাল ছুরিটা ধীরে ধীরে তাবুর মধ্যে ঢুকিয়ে দিল তাবুর মধ্যে শুয়ে থাকা ছেলেটির পেটে। 'মা...' বলে তাবুর মধ্যে থেকে চিৎকার করে ওঠে ছেলেটি। জাদুকরের হাত রক্তে ভেসে যাচ্ছে। দু-একজন দর্শক রক্ত দেখে ভিরমি খেয়ে ঢলে পড়ছে আরেকজনের গায়ে। অথচ কামাল স্যার নির্বিকার, নিস্পলক চোখে স্বাভাবিক একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের মতো ভয়হীনভাবে দেখছেন। যেন এ জাদুর আসল রহস্য জানেন। এ যে চোখের ভেলকি, চোখে ধুলো দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়, তা যেন স্যার স্পষ্ট বুঝতে পারছেন।

জাদু প্রদর্শনী শেষ হয়েছে অনেক আগেই। সবাই চলে গেছে, জাদুকর তখন মাটি থেকে টাকা পয়সা তুলতে ব্যস্ত। সাথে ঐ ছেলেটিও। তখনোও কামাল স্যার দাঁড়িয়ে থাকেন। একসময় জাদুকর তার নিকটে এসে দাঁড়ায়। জানতে চায়, 'বাড়ি কই? এখনো দাঁড়িয়ে আছো কেন?'

কামাল স্যার হেসে বলেন, 'আমি কিন্তু আপনার ভেলকিবাজি ধরে ফেলেছি।'

'কিভাবে ধরলে তুমি?' আশ্চর্য হয়ে জাদুকর বলে।

'বলবো না, তবে বুঝছি।'

জাদুকর স্যারের ডান হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বিস্ময়াভিভূত দৃষ্টিতে কী যেন দেখলো। হাতটা ছেড়ে দিল তারপর। বললো, 'হ্যাঁ বাবা, তুমি অনেক কিছু বুঝতে পারো। তোমার ওপর 'আছর' আছে।'

'আছর কী?'

'আছর হলো অশুভ শক্তির অশুভ দৃষ্টি। দাঁড়াও বাছা, তোমাকে একটা তাবিজ দেই। এই তাবিজটা গলায় পরে থেকো আজীবন।' গলায় তাবিজটা ঝুলিয়ে দিতে

দিতে বললো জাদুকর, 'আল্লার ইচ্ছায় পীর-মুর্শিদের দোয়ায় তারা তোমার আর কোনো ক্ষতি করতে পারবো না।'

সত্যি কি তাঁর ওপর আবার অশুভ দৃষ্টির প্রভাব পড়তে শুরু করেছে? ইলিশ মাছের চোখের দিকে তাকিয়ে কামাল স্যার নিজেকে প্রশ্ন করেন। নিজের অজান্তে গলায় হাত দেন। না নেই, সেই তাবিজটা গলায় নেই। হঠাৎই চেতনা ফিরে তাঁর। তবে গেলো কই তাবিজটা, যা এতোটা বছরেও হারান নি? কাউকে পর্যন্ত বলেন নি সে-তাবিজের মাহাত্ম্য সম্পর্কে। কতোজন কতো ভাবে টিপ্পনি কেটেছে তাবিজ নিয়ে—'ও জন্ম নেয় আর বারবার মরে, তাই মাদুলি গলায় দিয়েছে।' আরো কতো কী।

কিন্তু কামাল স্যার কোনোদিন কাউকেই এ বিষয়ে কিছু বলেন নি। এমনকি বাবা-মাকেও না, যা তাঁর একান্ত নিজের বিষয় ভেবে গোপন করে রেখেছিলেন এ চল্লিশ-বিয়াল্লিশটি বছর পর্যন্ত। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাবিজটার ওপর। আজ কখন কিভাবে হারিয়ে গেলো তাবিজটি? তবে কি সত্যি সত্যি কোনো অশুভ শক্তি নতুন করে তার ওপর 'ভর' করেছে? তাহলে কবে থেকে তাঁর ওপর দৃষ্টির নজর পড়েছে? সেই ছেলেবেলা থেকে? হতে পারে।

এতোদিন হয়তো তাবিজের কারণে দূরে দূরে থেকেছে অশুভ শক্তি। এখন তাবিজ নেই বিধায় আবার 'ভর' করতে শুরু করেছে। ছোটবেলার সেই ঘটনার কথা তাঁর মনে পড়ে যায়। বড় লম্বা দরজাঅলা তাঁদের গ্রামের বাড়ি। বাড়ি থেকে প্রায় দু-শ গজ পর্যন্ত বাড়ির দরজার রাস্তা। তারপর বড় পাকা সড়ক। এ দু-শ গজ রাস্তা শীতকালে শুকিয়ে বালি-বালি হয়ে থাকতো। সে বালি দিয়ে স্যার কতো ঘরবাড়ি বানাতেন। আঙুলের ডগা দিয়ে ফুল-পাখি-লতাপাতা—এমনকি নিজের নামধাম লিখে রাখতেন নরম ধুলোবালির মাটিতে। কতোক্ষণ পরে এসে দেখতেন লেখাগুলো হারিয়ে গেছে হাঁটা-চলার দরুণ, কিংবা বাতাসের কারণে। আবার মাঝে মাঝে পা দিয়ে ধুলোবালিতে পায়ের গোড়ালি চেপে রেখে বুড়ো আঙুল বৃত্তের মতো চারদিকে ঘুরিয়ে কী সুন্দর গোল রিং আঁকতেন। কতো ভালো লাগতো সে দিনগুলি!

আর একটা অভ্যাস ছিল তাঁর, বাড়ির এ ধুলো-ওঠা রাস্তার কাছে এলেই কেমন যেন উল্লাস বোধ করতেন মনে মনে। এ পথটুকু উলটো ভাবে দৌড়ে বাড়ি আসতেন। উলটো হেঁটে নয়, রীতিমতো উলটো দৌড়ে। অর্থাৎ বড় রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে না দেখে দ্রুত উলটো দিকে দৌড়ানো। দিনে দিনে এটা তাঁর একটা খেলায় পরিণত হলো। এখানে এলেই উলটো দৌড়াবেন। সেদিন সন্ধ্যাবেলা, যাকে বলা হয় কালীসন্ধ্যা। রাস্তার দু-পাশে পাতাবাহার গাছের সমারোহ। তার পেছনে বড় বড় তাল, শিমুল, বাঁশ, বেতের বহু পুরনো ঝোপ-জঙ্গল। কোনো এক হিন্দু জমিদারের বাড়ি ছিল এটা। দেশভাগের সময় নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে চলে গেছে তারা। বাড়ির সম্মুখে দুটো বড়-সর মন্দিরঘর। একপাশে মোটা মোটা লোহার রড দিয়ে ঢাকা। এক কালে মন্দিরে পাথরের মূর্তি ছিল। দেবীকে দেখার জন্যই ঐ গ্রিলের ব্যবস্থা জনসাধারণের জন্য। এখন সেই মন্দিরঘরে লজিংমাস্টার থাকেন। সেই সন্ধ্যাবেলায় কামাল স্যার এবং সাথে ছোট্ট কে যেন ছিলেন, এখন মনে নেই। সেই রাস্তায় উলটো দৌড়ে বাড়ি

ফিরছেন। দ্রুত। অন্যান্য যে কোনো দিনের চেয়ে বেশি দ্রুত। অর্ধেক পথ দৌড়ে এসে স্যার তালগোল হারিয়ে ফেলেন। নিজের শরীরের নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে তিনি ব্যর্থ হচ্ছেন। শরীর অসার হয়ে যাচ্ছে। স্যার কিছুই বুঝতে পারছেন না। উলটো পায়ে পা জড়িয়ে যাচ্ছে। উলটো দৌড় থামাতেও পারছেন না। কোনো মন্ত্র-বলে, না অন্য কেউ যেন তাঁকে হাওয়ার ওপরে ভাসিয়ে ভাসিয়ে উলটো দৌড়ে নিয়ে যাচ্ছে, যাচ্ছে—নিয়ে যাচ্ছে...। একসময় দড়াম করে উলটিয়ে ফেলে দেয় ধুলোবালির রাস্তায় তাঁকে। মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা পান। গড়াগড়ি খান রাস্তার ধুলোবালিতে। চোখমুখ উলটে গেছে। মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে জবাই করা মুরগির মতো ছটফট করছেন কামাল স্যার।

এরপর তাঁর আর কিছুই মনে নেই। আম্মা এসে তাঁকে কোলে নিয়েছিলেন। তবে কি জিন-ভূতেরা সেদিন থেকেই তাঁর ওপর 'আছর' করেছিল? কামাল স্যার আর ভাবতে পারেন না।

তাবিজটা খোঁজাখুঁজি করেন এদিক-সেদিক। জোবেদা বেগমকেও এ বিষয়ে কিছুই জিজ্ঞাসা করেন না।

দিনকাল এমনি করে কেটে যেতে থাকে তাঁর। নিত্যদিন ছাতা হাতে নিয়ে স্কুলে যান-আসেন। মৃত্যুকে নিয়ে ভাবনা ছেড়ে দিয়েছেন এখন। মরতে তো হবেই সবাইকে একদিন। তবে স্বাভাবিক মৃত্যুই কামনা করে সবাই। কামাল স্যারও তার ব্যতিক্রম নন। তিনি কখনো কারো ক্ষতি করেন নি। কারো সাথে অন্যায় আচরণও করেন নি। স্কুলের পথে যেতে-আসতে বহুবার এক সাধুকে দেখেছেন বসে বসে রোদ পোহাচ্ছেন কিংবা অযথাই বসে আছেন। সাধুর পূর্ণ নাম কী ছিল, এখন হয়তো কেউ তা জানে না। এখন সাধু বললেই সবাই চেনে। হলুদ গেরুয়া রংয়ের পরিধেয় পরে থাকেন সারাক্ষণ। পেছনে দু-তিন বাড়ি পরেই কালীমন্দির। কালীমন্দিরের ঘণ্টা শুনতেই হাত কপালে ঠেকিয়ে 'জয় মা কালী' বলে জয়ধ্বনি দেন। এটাই এখন নিত্যদিনের দৃশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ক'দিনে যেন সাধু বড় বেশি দুর্বল হয়ে গেছেন বলে মনে হচ্ছে কামাল স্যারের কাছে। যাবার পথে স্যার নমস্কার দেন সাধুকে। প্রত্যুত্তরে সাধুও দু-হাত তুলে জবাব দেন 'নমস্কার।'

সপ্তাহ খানেক পরের কথা।

সকাল থেকেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। প্রতিদিনের মতো কামাল স্যার ছাতাটা মাথায় দিয়ে স্কুলের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। গোবেচারা টাইপের মানুষ তিনি। কারো সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। এমন মানুষ আজকাল দেখা যায় না। নিচের দিকে তাকিয়ে পথ চলেন। কালভার্ট পেরিয়ে গেলেই কালীবাড়ির মোড়, মোড় পেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠতেই দু-চার জনের ভিড় দেখে কামাল স্যার দাঁড়ান। কী হয়েছে বুঝতে চেষ্টা করেন। সাধু মারা গেছেন। তাঁর মরদেহ আনা হয়েছে। গজারিয়া না কোথায় যেন কীর্তন শুনতে গিয়েছিলেন, সেখানেই মারা গেছেন। মরার আগে নাকি বলে গিয়েছিলেন তাঁর বাড়ি চরফ্যাশন কালীবাড়ির পেছনে। সেখান থেকেই আজ সকালে মরদেহ আনা হয়েছে। কামাল স্যার দু-পা আগান। একনজর শেষ দেখা দেখে যাই। পরক্ষণেই মত

ঘোরান—না থাক। এমনিতে আজ বড্ড দেরি হয়ে গেছে। তিনি স্কুলের দিকে পা বাড়ান। যেতে যেতে কতো কথা তাঁর মনে পড়ে। আশি-পঁচাশি বৎসর বয়স হবে সাধুর। এতোটা বয়সেও তিনি টকটকে সুন্দর ছিলেন। শুধু বয়সের ভারে চামড়ায় ভাঁজ পড়ে গিয়েছিল। চিরকুমার ছিলেন তিনি। বিয়ে করেন নি, তাই সন্তানাদি না থাকায় নিজের সম্পদটুকু দু ভাইপোকে দান করে দিয়েছেন। সেখানেই থাকতেন সাধু। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁকে দেখলেই 'পানসুপারি' বলে ক্ষেপাতো। আর সাধুও মুখে 'যা ইচ্ছে তাই' বলে গালাগাল করতেন। আজ সেই সাধু নেই। মরার দু-তিন মাস আগে থেকেই যাঁকে সামনে পেতেন তাকেই বলতেন—'বাবু, আশীর্বাদ করবেন, এ-ই আমার শেষ সময়।' হিন্দু-মুসলমান দেখতেন না, সবাইকে 'বাবু' বলে সম্বোধন করতেন।

কামাল স্যার ভাবেন—ক'জনে এভাবে মৃত্যুর ডাক শুনতে পায়? তাঁর নিজের বয়সও পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই করছে। আমি কি কখনো মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত? আমি কি মৃত্যুর ডাক শুনতে পেয়েছি? ঐ সব স্বপ্ন, ঐ তাবিজ হারানো কিসের লক্ষণ?

বৃষ্টির জন্য একটা ক্লাস হয় নি। তাই তিনটার দিকে স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। বিষণ্ন মনে বাড়ি ফিরছেন কামাল স্যার। স্কুলে উপস্থিত হবার পর থেকে তাঁর মনটা অনুশোচনায় ভুগছে। হায়! কেন যে শেষ দেখাটা দেখে এলাম না। এ অস্বস্তির জন্য তিনি ঠিকমতো ক্লাসও নিতে পারেন নি। ঘুরে ঘুরে মন কেবল একটি কথাই বলছে, 'কেন যে শেষ দেখাটা দেখে এলাম না।' এ জীবনে আর তো ফিরে আসবেন না সাধু। মৃত্যুর পর তাঁর ফরসা মুখটা কেমন হয়ে গিয়েছিল? আগের মতো সুন্দর, নাকি কালো হয়ে গিয়েছিল? নানান প্রশ্ন এসে ভিড় করে মনে। তিনি দ্রুত হাঁটেন, যেন বাড়ি এসে সাধুর মুখটা দেখতে পাবেন। ভাবেন—সাধুর মরদেহ এখনো উঠানেই আছে। এখনো সৎকার করা হয় নি।

যখনি তাঁর মনে হয়—হায়! সাধুর মরদেহ তো মাটি দেয়া হবে না, পুড়িয়ে ফেলবে, কামাল স্যারের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা এক্কেবারে ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়—হায়, কী হলো, কী করলাম, কেন শেষ দেখা দেখলাম না? আফসোস, আনুশোচনা, অস্বস্তি, আকাঙ্ক্ষা একত্রে মিলে কামাল স্যারকে ঘিরে ধরলো—কী করলাম, কী হলো, কেন এমন হলো?

এতোক্ষণে মরদেহ নিশ্চয়ই শ্মশানে নিয়ে গেছে। সৎকারও হয়ে গেছে। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সাধুর মরদেহ। হায় কী হলো? কামাল স্যার কেমন যেন অসুস্থবোধ করছেন। হাঁটতে পারছেন না। তাঁর মাথার মধ্যে কেমন যেন গোলমাল হচ্ছে। সাধুকে শেষ দেখা দেখতে পেলাম না! সাধুকে শেষ দেখা দেখতে পেলাম না!! কামাল স্যার সবে ভূমিষ্ঠ হওয়া গরুর বাছুর যেমন বারবার উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে যায়, সেভাবে পা ভেঙে পথিমধ্যে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারান। ছাতা গিয়ে পড়ে দু-তিন হাত দূরে। বৃষ্টি ঝরছে তুমুলভাবে। বৃষ্টিতে ভিজতে থাকে কামাল স্যারের অচেতন দেহ।

সন্ধ্যার দিকে স্যারের জ্ঞান ফিরে আসে। গায়ে জ্বর। ডাক্তার এসে দেখে গেছে। অতিরিক্ত টেনশন ও শরীর দুর্বল থেকে এমন হয়েছে। ওষুধপত্র এনেছে ছেলেরা। হাতমুখ ধুয়ে এসে মৌল ক্লান্ত বদনে ভাতের থালার সামনে বসেন। পাশে স্ত্রী জোবেদা

বেগম বাটিতে তরকারি পরিবেশন করছে। কামাল স্যার থালায় ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। মুখে এখনো ভাত দেন নি, চিন্তাক্লিষ্ট মুখ। তা দেখে জোবেদা বেগম প্রশ্ন করে, 'কী হইলো, ভাত খান না কেন?'

এ প্রশ্নে যেন সম্বিৎ ফিরে পান। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুখে ভাত দেন, মুখ বিকৃত হয় তাঁর। বিস্বাদ লাগে। আরেক মুঠো ভাত মুখে দিয়ে ভাতের থালা ঠেলে, হাত ধুয়ে উঠে পড়েন।

জোবেদা বেগম তারস্বরে আর্তনাদ করে ওঠেন, 'ভাত না খাইয়া উইঠ্যা গেলেন যে? সেই সকালে কয়ডা পান্তা ভাত খাইয়া ইশকুলে গেছেন, সারাদিন উপাস, না খাইয়াই তো শইলের এমুন দশা হইছে। আপনের আল্লার দোহাই লাগে, ভাত কয়ডা খাইয়া লন।'

'নাগো, খাইতে ইচ্ছা করে না, তিতা লাগে।'

'তিতা তো লাগবোই, গায়ে জ্বর যে। ভাত থাউক তাইলে, দুধ-রুটি দেই?'

'না, তাও খাইতে ইচ্ছা করতাছে না। খালি মরণের চিন্তা মাথায় ঘোরে।'

'তওবা, তওবা, কী অলক্ষুণে কথা শুরু করছেন, কন দেহি?'

'অলক্ষুণে নাগো, এইডাই সত্যি কথা। মনে হয় আর বেশিদিন বাঁচুম না। দেখলা না, সকালবেলা সাধু কেমুন কইরা মইরা গেলো?'

'এইডা কী কইলেন, বয়স হইলে মানুষ মরবো না? সাধুর বয়স হইছে মইরা গেছে। আপনের বয়স সাধুর মতো হইছে?'

কামাল স্যার এ কথায় মাথা নিচু করে দোলান আর মৃদু হাসেন—সবাই যে সমান বয়স পায় না এ কথা স্ত্রীকে বোঝাতে চান না বা বোঝাতে পারেন না বলে। দু পিস রুটি খেয়ে ওষুধ খেয়ে অবসন্ন দেহটা এলিয়ে দেন বিছানায়। সাধুকে একনজর না দেখার আকাঙ্ক্ষাটা আবার মনের মধ্যে চাড়া দিয়ে ওঠে। শেষ দেখাটা—একনজর দেখতে পারলাম না। বাবা মারা গেলেন আসামে থাকতে, পনর দিন পরে খবর পেলাম বাবা অসুস্থ, একমাস পর বাড়িতে এসে শুধু বাবার কবর দেখতে পেলাম। বাবাকেও শেষ দেখা দেখতে পেলাম না। বাবার মুখটা কেমন ছিল ভাবতেই যেন চোখের সামনে স্পষ্ট ফুটে উঠলো, প্রায় চল্লিশ বছর আগে মারা যাওয়া তাঁর বাবার মুখখানি। কেমন মলিন সে মুখ। বাবা মারা যাবার আগে ঠিক কবে বাবাকে শেষ দেখা দেখেছিলেন তা স্পষ্ট মনে নেই, অথচ সেই বাবার মুখখানি আজ স্পষ্ট হয়ে উঠছে চোখে, স্মৃতিতে।

অথচ আজ সকালে সাধু মারা গেলেন, কিন্তু শত চেষ্টা করেও তিনি সাধুর মুখখানি মনে আনতে পারছেন না। সাধুর মুখখানি কেমন ছিল? মুখাবয়ব একটু চিলতে মনে করতে পারলেন না। কেন এমন হচ্ছে, শেষ দেখা হয় নি বলে?

তাঁকে এতোদিন আসতে-যেতে দেখেছি, তাঁর ছবি এখন আর মনে রাখতে পারছি না। তবে কি স্মৃতিশক্তি এতোই দুর্বল হয়ে পড়েছে? এসব কিসের লক্ষণ? মৃত্যুর লক্ষণ? নিজের মনে নিজেকে প্রশ্ন করেন। সারারাত দু চোখের পাতা এক করতে পারেন না। জ্বরের প্রকোপ বাড়তে থাকে। জ্বরের ঘোরে ভুল বকতে থাকেন। বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছেন। জোবেদা বেগম মাথায় জলপট্টি দিয়ে দিয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা রাখতে ব্যস্ত

সারারাত। ভোরের দিকে একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল, তাতে কী এক দুঃস্বপ্ন দেখে ধড়মড়িয়ে জেগে ওঠেন। লাফিয়ে বিছানায় উঠে বসে পড়েন। সাথে সাথে জ্বর ছুটে পালায়। দরদর করে ঘামতে থাকে শরীর।

রাস্তার পাশে পারিবারিক শ্মশানে সমাধিস্থ করা হয়েছে সাধুকে। যেতে-আসতে সবার চোখে পড়ে, নতুন উঁচু করা মাটি দিয়ে ভরা শ্মশানখানি। হিন্দুদের জাত ভেদে সৎকার করার নিয়ম। কাউকে পোড়ানো হয়। কাউকে বা মাটি দিতে হয়। সাধু ব্রাহ্মণ হলেও মরার আগে বলে গিয়েছিলেন তাঁকে যেন অগ্নিদাহ করা না হয়। তাঁকে যেন মাটি দেয়া হয়। সেই অনুযায়ী সাধুকে সমাধিস্থ করা হয়, দাহ করা হয় নি।

সকালেই কামাল স্যার পরিপূর্ণ সুস্থ। খেয়ে-দেয়ে যথারীতি ছাতাটা হাতে নিয়ে স্কুলের পথে রওনা দিলেন। জোবেদা বেগম অনেক আকুতি-মিনতি করলেন, এই শরীর নিয়ে স্কুলে না যাবার জন্য। কিন্তু কে শোনে কার কথা? ছাতা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

নতুন কবর। দু প্রান্তে তুলসী গাছ লাগানো। ওপরে মাটির ছোট ঘর চোখে পড়তেই কামাল স্যার থমকে দাঁড়ান। কী দেখছেন তা মেলানোর চেষ্টা করছেন। হ্যাঁ, কাল রাতে তিনি ঠিক এই সমাধিটিই স্বপ্নে দেখেছেন। আর কী দেখেছেন ভাবতেই তাঁর শরীর গুলিয়ে আসছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। শরীরটা দুর্বল লাগছে। না, আজ আর স্কুলে যাওয়া হচ্ছে না।

এমনিতেই তাঁর মনে কবর-ভীতি সব সময়। তার ওপরে আবার চিতা খোলা। রাস্তার পাশে এভাবে কেন যে এখনো এ দেশে মরদেহ দাহ করতে দেয় পৌরসভা, ভেবে পান না। মানুষ ভয় পায় না বুঝি!

আবার মনে মনে ভাবেন—আসলে এটা তো হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। কালীবাড়ি দেবোত্তর সম্পত্তি এদিকের প্রায় সবটাই। হিন্দুরা বাৎসরিক মূল্যে টাকা দিয়ে এখানে বাড়িঘর করে থাকছে। কামাল স্যার ভাবেন, রাত-বিরাতে বুঝি আর এ পথে বাড়ি ফিরতে পারবেন না ভয়ে। ঘুর পথে অনেক হেঁটে তবেই আসতে হবে, কারণ, চিতাখোলা বা শ্মশনে ভূত-প্রেত বেশি থাকে। এসব ভাবতে ভাবতেই বাড়ি ফিরে আসেন স্যার। জোবেদা বেগম বিস্মিত। এই বুঝি প্রথম স্কুলে রওনা দিয়ে তার স্বামী ফিরে এলেন। ছাতাটা একপাশে সরিয়ে রেখে হাতপাখায় বাতাস দিতে দিতে প্রশ্ন করে, 'শরীলডা বেশি খারাপ লাগছে, তাই না? আমার কথা হুনলেন না তো।'

শুতে শুতে বিরস গলায় কামাল স্যার বলেন, 'এই বাড়িডা বেঁইচ্যা ফালামু গো। এই পাড়ায় আর থাকুম না।'

'ক্যান, কী হইছে এমুন যে এই পাড়ায় থাকন যাইবো না?'

'দেহ অগো আক্কলডা কেমুন, সাধুরে পুড়াইছে রাস্তার লগে। মানুষ যাইতে-আইতে ভয় পাইবো না? আমার তো কবর দেখলেই ভয় করে, আর সেইখানে চিতার ছাইভস্ম।'

'ও—এই কথা? সাধুরে তো পুড়ায় নাই, তারে চাপামাটি দিছে। মরার আগে সে নাকি কইয়া গেছে তারে যেন না পুড়ানো হয়।'

এ কথা শুনে কামাল স্যার পাংশু মুখে ভয়ার্ত চোখে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকান। এমন ভাবে তাকিয়ে আছেন যেন তাঁর মুখখানি ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরি, যে চোখে কখনো পলক পড়ে না, যে মুখ কোনোদিনও কথা বলে নি।

জোবেদা বেগম তার স্বামীর এমন তাকানো দেখে ভয় পেয়ে যায়। ভীত গলায় বলে, 'কী হইলো, এমুন কইরা তাকাই রইছেন ক্যা?'

কামাল স্যার নিরুত্তর।

বিকেল হতেই তিনি যেন নিজের মাঝে কেমন একটা পরিবর্তন লক্ষ করলেন। ভয় নামক বস্তুটা তাঁর কাছে উধাও হয়ে যেতে লাগলো। মনটা যেন এক সাহসী বীরের মতো উঁচু লাগছে। যে কুস্তিগীর একটু আগে তাঁর প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে এইমাত্র পুরস্কার নিয়ে বাড়ি ফিরলো, এমন সাহসী এখন তাঁর মনের অবস্থা। যিনি কোনোদিন অন্ধকারে এক পা এগুতে সাহস পেতেন না, এখন যেন ঘোর অমাবস্যার রাতে একা একা শ্মশানে যেতে এতোটুকুও তাঁর বুক কাঁপবে না। বিকেল গড়িয়ে যতোই সন্ধ্যা হতে লাগলো ততোই তিনি বেপরোয়া হয়ে উঠলেন মনে মনে। মনে হতে লাগলো—কী যেন একটা তাড়া আছে তাঁর, বিশেষ একটা কাজ করতে হবে আজ রাতে।

কিন্তু কাজট কী বুঝতে পারছেন না। কিন্তু কাজটা তাঁকে যে করতে হবে, এটা তিনি বুঝতে পারছেন। কেন যে কাজটা তাঁকে করতে হবে তা বুঝতে পারছেন না। তবে কি কেউ তাঁকে দিয়ে শেষ দেখা দেখানোর ব্যবস্থা করছে? কিন্তু কে সে? কোন সে অশুভ শক্তি? ছোটবেলা থেকে যে তাঁর ওপর ভর করেছিল সেই বদ-নজরঅলা জিন? কামাল স্যার বুঝতে পারেন না। স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি কি পাবেন না? সন্ধ্যার আগেই একটা কোদাল, একটা দা চৌকির নিচে রেখে দিয়েছেন। রাত যতো বাড়তে লাগলো ততোই স্যার অসহিষ্ণু হয়ে উঠছেন। মনে মনে এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করছেন। কেমন পৈশাচিক পুলক অনুভূত হচ্ছে তাঁর মনে। সারাঘর নিঝুম হয়ে এলো একসময়। সারা পৃথিবীও চলছে অন্ধকার থেকে ঘোর অন্ধকারের পথে। তখনি কোমরে একটা টর্চলাইট গুঁজে দা-কোদাল হাতে নিয়ে বেরিয়ে যান বিশেষ এক কাজে, যেমন স্বপ্ন দেখেছিলেন গতকাল রাতে। চোখ দুটি তাঁর নিশাচরের মতো বড় বড়, লাল লাল ভাব। বুকে অসীম সাহস, মনে এক উত্তেজনা, এক রহস্য এবং এক আনন্দ, শেষ পর্যন্ত তিনি সাধুর মরা মুখখানা একনজর দেখতে পাচ্ছেন।

মনে মনে ভাবছেন—শেষ পর্যন্ত সাধুর মুখখানা দেখতে পাবো তো? নাকি স্বপ্নের মতো দেখা যাবে...

গভীর রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে থপথপ শব্দে দক্ষ মাটি-কাটা শ্রমিকের মতো কামাল স্যার সাধুর সমাধি খুড়ে চলছেন। ভয়হীন চিত্তে তাঁর বিশেষ কাজ করে চলছেন। গতকাল বৃষ্টি হওয়ায় মাটি স্যাঁতসেঁতে ভিজা। এক কোদাল মাটি যেন এক-দেড় কেজি ওজন। একদিন আগে খোড়া সমাধির মাটি হওয়ার কথা ঝুরঝুরা আগলা-আগলা, অথচ বৃষ্টির দরুণ একদিনের মাটিগুলো আপন ভাইয়ের মতো রক্তে-রক্তে যেন মিলে গেছে।

এজন্যই তাঁর মাটি খুড়তে বেশ কষ্ট হচ্ছে। তিনি ভেবেছিলেন মুসলমানদের মতো বাঁশ দিয়ে মাটি আড়াল করে কবর দেয়া হয়েছে। এখন খুড়তে গিয়ে দেখা গেলো—না, বাঁশ-বেড়া কিছুই নেই। শুধু মাদুর পেঁচিয়ে মাটি চাপা দেয়া হয়েছে। আনুমানিক এক ঘণ্টা কোদাল চালিয়ে মরদেহের সন্ধান পান কামাল স্যার। আনন্দ-উত্তেজনায় তাঁর হাত-পা কাঁপছে। সত্যি সত্যি কি তিনি সাধুর মুখটা দেখতে পাবেন? কুঁজো হয়ে বসে অন্ধকারে হাতড়াতে থাকেন। হাতে সাধুর মাথা ঠেকতেই খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠেন।

স্বপ্নে দেখাটা মিথ্যে ছিল। স্বপ্নে দেখেছিলেন ধড় থেকে মাথা নেই সাধুর। হাত দিয়ে মাথা স্পর্শ করে কোমরে হাত দেন টর্চলাইট নেয়ার জন্য। একি, কোমরে টর্চলাইট নেই। এদিক-ওদিক খুঁজে দেখেন—না, নেই, কোথাও টর্চলাইট নেই। হতাশা-ক্ষোভ সব মিলিয়ে তাঁর হু হু করে কান্না পাচ্ছে। এ কী হলো—এতো কষ্ট, এতো শ্রম, সবই বৃথা গেলো? তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে আর সাধুর মুখখানি শেষ দেখা দেখার ইচ্ছেটা পুনরায় চাড়া দিয়ে উঠলো। যে কোনোভাবেই হোক, শেষ দেখা দেখতেই হবে তাঁকে।

প্রয়োজনে আবার আগামীকাল এসে কবর খুড়বেন। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আবার মাটি চাপা দিতে লাগলেন। মাটি চাপা শেষ হয়ে এলো প্রায়, হয়তো দু-এক চাকা বাকি আছে, সেই মাটিগুলো সরাতেই হাতে টর্চলাইটটা ঠেকলো। আরেকবার সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন—কী করবেন। এখনি আবার টর্চলাইট হাতে নিয়ে আলো জ্বেলে দেখেন ঠিক আছে কিনা। মাটি কাটার সময় কখন যে কোমর থেকে পড়ে গিয়েছে খেয়াল করেন নি। আবার খুড়বেন, নাকি আগামীকাল রাতে, সে-সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। যখন আবার মাটি খুড়তে শুরু করেন, তখনি গাছ-গাছালি থেকে পাখ-পাখালিরা ডেকে ওঠে। কামাল স্যার বুঝতে পারেন রাত শেষ হয়ে আসছে, এক্ষুণি হয়তো আজান হবে। তাই কোনোরকমে মাটি চাপা দিয়ে বাড়ির পথে রওনা দেন। গোসল করে পরিপাটি হয়ে যখন বিছানায় গিয়ে শরীর এলিয়ে দেন, ঠিক তখনি মসজিদের মিনার থেকে ভেসে উঠলো মুয়াজ্জিনের সুমধুর সুর—'আল্লাহু আকবার।' মনে হলো, কে যেন তাঁর শরীর থেকে নেমে গেলো। শরীর, দেহ এখন দারুণ হালকা লাগছে। এতোক্ষণে শরীর কি ভারী না ঠেকছিল, যেন চল্লিশ মণ ওজন।

বেলা বারটার দিকে জোবেদা বেগমের ডাকাডাকিতে কামাল স্যারের ঘুম ভাঙ্গে। এগারটার দিকে এসেও একবার ডেকে গেছে। হুঁ-হ্যাঁ করে ঘুমের মধ্যেই জবাব দিয়েছেন তিনি। ঘুম ভাঙ্গে নি। নাক ডাকার শব্দ বেড়ে যায়। জোবেদা বেগম আর বেশি ডাকাডাকি করলো না। গতকাল রাতে ঘুমাতে পারেন নি। তার ওপরে দুর্বল শরীর, স্কুলেও আর যাওয়া হচ্ছে না। বড় ক্লান্ত মানুষটা আরেকটু ঘুমাক। এই ভেবে নিজের কাজে চলে গেলো। এরপর বারটার দিকে এসেও দেখে একইভাবে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন। গায়ে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে-ঠুলে ঘুম থেকে উঠিয়ে বসালো। 'কিছু খাইয়া লন, তারপর ঘুমান। এম্নিতেই শরীল দুর্বল, না খাইলে তো শরীল আরো দুর্বল হইয়া যাইবো।'

চারদিকে রোদ দেখে কামাল স্যার চোখ রগড়াতে রগড়াতে জিজ্ঞাসা করেন, 'কয়টা বাজে?'

'বারটার কম না।'

'কী কও?'

'হ, ঠিকই কইছি।'

'স্কুলে যাওন লাগবো না? আমারে আরো আগে ডাক দেও নাই ক্যান?'

'ডাক আবার না দিছি নি, খালি হুঁ-হুঁ কইয়া হুমুর দিছেন।' কামাল স্যার নিশ্চুপ হয়ে থাকেন।

হাতমুখ ধুয়ে এসে খেতে বসলে জোবেদা বেগম স্বামীর কাছে কথাটা পাড়লো, 'হুনছেন নি, অগো সাধুর কবর কাইল রাইতে কারা জানি খুদছিল।'

'কী?' কামাল স্যার চমকে ওঠেন যেন।

'হ, ঠিকই কইছি, গিয়া দেহেন, সকাল থেইক্যা মানুষজন ভিড় হইয়া গেছিল, গোর দেহনের লেইগ্যা। আপনে ঘুমায় আছিলেন, হের লেইগ্যা কইতে পারেন না। সবাই কওয়া-কওয়ি করতাছে—সুযোগ পায় নাই, পাইলে লাশ লইয়া যাইতো।'

'লাশ নিত কিয়ারে?'

'কে জানে? আজব দুইন্যাইডা। মরা লাশ এহন নাকি কতো কামে লাগে।'

কামাল স্যারের মুখে আর ভাত যায় না। তাঁর কেমন ঘৃণা লাগছে। এই হাত দিয়েই তো তিনি কাল রাতে মরা লাশ নেড়েছেন। সেই হাত দিয়েই এখন ভাত খাচ্ছেন। হাতটা সাবান দিয়ে ভালো করে ধোয়াও হয় নি। তাঁর ঘৃণা লাগছে, বমি-বমি আসছে। 'ওয়াক' করে উঠে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়ান। দু-বার 'ওয়াক' করে বমি ঠেকিয়ে হাত ধুয়ে এসে বিছানায় শুয়ে পড়েন। ভাতের প্লেটে মুরগির রান্না করা মাথা পড়ে আছে। কামাল স্যার যেন মুরগির মাথা নয়, সাধুর মাথাটাই দেখতে পাচ্ছেন সেখানে। আরেকবার মাথা গুলিয়ে বমি আসতে চাইলো তাঁর। তিনি চোখ বুজে মাথা ঘুরিয়ে বমি ঠেকান। জোবেদা বেগম থালা-বাসন গুছিয়ে আফসোস করতে করতে চলে গেলো অন্য ঘরে। কামাল স্যার হাঁপিয়ে উঠেছেন। গত রাতের কথা ভাবতেই তাঁর সর্বাঙ্গ শিউরে উঠলো ভয়ে। গা কাঁটা দিয়ে উঠছে তাঁর। কেমন করে এমন লোমহর্ষক কাণ্ডটি ঘটিয়েছেন একা একা—যে-আমি একা রাতের বেলা প্রশ্রাব করতে ঘরের বাইরে আসতে ভয় পাই, সেখানে কিভাবে গেলাম ঐ চিতাখোলায়? কোন সাহসে গোর খুদলাম? কোন সাহসে সাধুর লাশ ধরলাম? আমাকে যে কবরে চাপা দেয় নি, আমাকে যে কবর থেকে কেউ পা টান দিয়ে ধরে নি, তার জন্য লাখো শুকরিয়া। উহ্, কী ভয়ংকর! ঘামে ভিজে গেছে তাঁর শরীর, হৃৎপিণ্ডের ধুক-ধুকানি স্পষ্ট শুনতে পারছেন—ধক ধক ধক।

বিকেল হতেই শরীর আবার ভার হতে শুরু করলো। কে যেন ধীরে ধীরে তাঁর ওপর ভর করছে। নিজের শুভ চিন্তা এলোমেলো হচ্ছে। নিজের মধ্যে আর নিজে থাকতে পারছেন না। কেউ এসে তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ধীরে ধীরে তাঁর নিজের

অস্তিত্ব লোপ পাচ্ছে। আকাশের রং বদলে যেতে লাগলো। রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশটাতে কালো মেঘ জমতে লাগলো। যখন-তখন বৃষ্টি নামবে। আকাশের রংয়ের মতো কামাল স্যারের ভয়ার্ত মনটাও বদলাতে লাগলো।

গত রাতের ঘটনাটি তাঁর কাছে এখন কেমন এ্যাডভেঞ্চার মনে হতে লাগলো। কী এক ধরনের শিহরণ অনুভূত হচ্ছে। কেমন যেন নেশা ধরা কোনো কাজ ছিল সেটা। নিষিদ্ধ আনন্দ ছিল, গোপন গভীর পৈশাচিক সুখ ছড়িয়ে পড়ছে শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে।

রাত যতো বাড়ছে, ততোই মনে মনে কে যেন বলছে—যতো পাহারাই থাকুক, আজ রাতেই কাজ করতে হবে। সাধুকে আজ রাতেই শেষ দেখা দেখতে হবে। নইলে লাশ পঁচন ধরবে। যে করেই হোক, যতো রিস্কই থাক, আজ রাতেই কাজটা শেষ করতে হবে।

রাত বাড়ার সাথে সাথে তুমুল বৃষ্টিও বাড়তে লাগলো। ঝুমঝুম বৃষ্টির শব্দে কানে তালা লাগে। অন্ধকারটা যেন আজ বড় বেশি মনে হচ্ছে। এমন রাতটাই যেন কামনা করছেন কামাল স্যার।

একপাশে রাস্তা চলে গেছে। অপর পাশে খাল। আরেক পাশে বড় বড় কয়েকটি ডোবা মতো। সাধুর কবরে যাবার একটি মাত্র পথ, সেই পথে যাওয়া নিরাপদ নয়। কারণ, পাহারাদারগণ এই একটি মাত্র রাস্তাই পাহারা দিচ্ছে। তারা নিশ্চিত, সেই গোর-খুদনেঅলা এ পথ দিয়েই আসবে। এজন্যই তারা এ পথটুকু আগলে রেখেছে, সেই নরপিশাচকে ধরার জন্য।

কামাল স্যার এসব বিবেচনা করেন। নিঃশব্দে নেমে পড়েন খালে। খালে টইটুম্বুর জল। তার ওপরে তুমুল বৃষ্টি। শিকারি বাঘের মতো নিঃশব্দে এগিয়ে চলেন সাধুর সমাধির পানে।

ঐ রাস্তা দিয়ে এক পথিক তখন বাড়ি ফিরছিল। বিদুৎ চমকানির আলোকে সে দেখতে পেলো—ওপাশে জল থেকে বিশাল দৈত্যের মতো কী একটা ডাঙ্গায় উঠছে। তৎক্ষণাৎ ভয়ে সে পথিক মূর্ছা গেলো ঐখানেই।

গোর খোড়া শেষে কবরের মধ্যে নেমে কামাল স্যার হাত দিয়ে খুঁজতে থাকেন মৃত সাধুর মুখমণ্ডল। হাতড়ে হাতড়ে খোঁজেন। না, নেই, সত্যি সত্যি সাধুর মুখমণ্ডল নেই। ধড় থেকে মাথা কাটা। তিনি বিচলিত হোন। একি হলো, গতকাল তিনি হাত দিয়ে স্পর্শ করে গেছেন সাধুর মুখমণ্ডল। কিছু চুল তিনি সাথে করে নিয়ে গেছেন। অথচ আজ মাথা খুঁজে পাচ্ছেন না। এ কেমন ব্যাপার? তিনি টর্চলাইট মারেন, পানিতে ভিজে ব্যাটারি নষ্ট হয়ে গেছে, তাই মিনমিনে আলো জ্বলে, তাতে স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না। শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে টর্চলাইটের সুইচ টিপ দেন। না, তাতে ঠিকমতো দেখা যায় না। হাতড়াতে-হাতড়াতে তিনি যেন মিশে যাচ্ছেন মাটির সাথে। তবুও খুঁজে পান না সাধুর মস্তক।

এখন তাঁর স্পষ্ট মনে পড়ছে—স্বপ্নে যা দেখেছেন সেটাই সত্যি। তাহলে আমি কি সাধুকে শেষ দেখা দেখতে পাবো না? এটাই কি বিধির বিধান? বৃষ্টির পানিতে কবরটা

ভরে উঠছে। তবুও উঠবার নাম নেই তাঁর, বৃষ্টির পানি চোখের পানি একত্রে ঝরছে কবরে।

হঠাৎ যেন তাঁর খেয়াল হলো—আলো আসছে ওপর থেকে। যেন আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন। একটু আলোর দরকার ছিল। তিনি ভুলে গেছেন যে গোপন নিষিদ্ধ এক অপরাধ করছেন তিনি। এক পৈশাচিক কাজ করছেন। সেকথা ভুলে গিয়ে কবর থেকে উঠে দাঁড়ান একটু আলো চাইবার জন্য। দেখেন—একদল মানুষ টর্চলাইট, হ্যাজাক লাইট, দা, লাঠি, কুড়াল, হাতে দ্রুত ছুটে আসছে। তিনি বিস্ময়ে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকেন তাদের পানে। এতোক্ষণে তিনি বাস্তবে ফিরে আসেন। তিনি নিশ্চিত যে, তাঁকে মারবার জন্যই তারা এদিকে আসছে। ধেয়ে আসছে সবাই, লাঠি-সোঁটা, দা-কোদাল হাতে আসছে...আসছে...।

চারদিকে হৈ-হুল্লোড় ধর...ধর...ধর...

কিন্তু একি, সবাই পিছিয়ে যাচ্ছে কেন? সবাই উলটো দৌড়াচ্ছে কেন? যারা পাহারা দিচ্ছিল, ঘোর বৃষ্টির জন্য তারা কিছুই বুঝতে পারছিল না। একটা মূর্ছা গিয়েছিল, তার জ্ঞান ফিরে এলে সে সবাইকে বিষয়টা জানায়। ঠিক তখনি তারা কান্নার শব্দ পেলো। খেয়াল করলো কান্নাটা কোন দিক থেকে আসছে। টর্চলাইটের আলো ফেলতেই দেখে—সাধুর সমাধির পাশে মাটির স্তূপ এবং কান্নাটা সেখান থেকেই আসছে। তখনি সবাই রামনাম মুখে নিয়ে লাঠি-সোঁটা, দা-বল্লম, ত্রিশূল নিয়ে তেড়ে আসে। তাদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে দ্রুতই মানুষ জমা হয়ে গেলো। তারা ধেয়ে আসতে লাগলো। অমনি কবর থেকে কী যেন একটা উঠতে দেখে। মানুষের মতোই, তবে ধড়ে দুটো মাথা। একটা মাথা মুখে কাদা-পানিতে মিশে থাকায় চেনা যাচ্ছে না। আরেকটা মাথা সবাই চিনতে পারছে, সেই মৃত সাধুর মাথাটি। এ ভয়ংকর দৃশ্য দেখে কেউ কেউ ঐখানেই জ্ঞান হারালো। আর বাকি সবাই রামদা-লাঠি ফেলে রাম রাম বলে উলটো দিকে দৌড়ালো। জান বাঁচানোর দৌড়। এহেন ভয়ংকর জন্তু কেউ কোনোদিন দেখেছে কিনা, তারা শোনেও নি।

কিন্তু কী দেখলো এক পলক? গোর থেকে কি তবে সাধুর আত্মাই ধড়ে দুটো মাথা নিয়ে ভূত হয়ে উঠে এসেছে? এ প্রশ্নের উত্তর কেউ জানে না। দু মাথাঅলা ভয়ংকর প্রাণীটা সেই যে খালের পানিতে ডুব দিল, আর উঠলো না।

বেচারা কামাল স্যারকে আর খুঁজে পাওয়া গেলো না। এখনো গভীর রাতে ঐ কালভার্টের ওপরে সাধুর মতো দু মাথাঅলা কাউকে বসে বসে কাঁদতে দেখেছে দু-একজন পথিক।

• • •

এক বাঁও মেলে না

সুমন আখন্দ

উৎসর্গ :

মা
রওশন জাহান
খণ্ড খণ্ড হয়েও যিনি অখণ্ডরূপে বিরাজ করেন

লেখক-পরিচিতি

জন্ম ১৫ আগষ্ট ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ; মাদারীপুরের রমজানপুর গ্রামে। শৈশব কেটেছে মাদারীপুর ও বরিশালে।

ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করে ভর্তি হোন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। নৃবিজ্ঞান বিভাগ হতে প্রথম শ্রেণীতে স্নাতকোত্তর। বর্তমানে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত আছেন।

দৈনিক যুগান্তরের পাঠক সংগঠন 'স্বজন সমাবেশ' থেকে প্রকাশিত ছোট কাগজ 'পদচিহ্ন' সম্পাদনা করেছেন তিনি।

সুমনের ছোটগল্প গ্রন্থ 'পাপ পুণ্যের কথা' বিশটি ক্ষুদ্রাকৃতির ছোটগল্পের সংকলন, যা পড়ে আমি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। ছোটগল্পকার হিসেবে সুমনের বড় গুণ হলো তিনি খুব অল্প কথায় সুগভীর ভাব প্রকাশ করতে পারেন, উল্লেখিত গল্পগ্রন্থটিই এর প্রমাণ বহন করে।

সুমন আখন্দের কবিতায় যেমন তারুণ্যের প্রেমোন্মত্ততা ও বিরহ-কাতরতা আছে, তেমনি আছে সমকালীন সমাজ-বাস্তবতা। বিষয়বস্তুর বিচিত্রতা ও নির্মাণশৈলিতে স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রকাশিত গ্রন্থাবলি :

ছায়াতরু
কাব্যগ্রন্থ, ২০০০

পাপ পুণ্যের কথা
ছোটগল্প, ২০০৪

সমকাল
অণুকাব্যগ্রন্থ, একুশে বইমেলা ২০০৫ (সবুজ অঙ্গন সাহিত্য সংকলন ২০০৫-ভুক্ত)

এক

গৃহস্থের ভরপুর থাকলেও গরীবকে সে ততোটুকুই দেয় যাতে করে ও সারাজীবন হাত পেতেই খায়। দুধ হতে সরে, সর হতে ঘিয়ে যারা ক্রমাগত প্রমোশন পান—তাদের কথা শোনার জন্য উন্মুখ মুখের সংখ্যা অনেক; কিন্তু যারা জন্মগতভাবেই জল এবং প্রজন্ম হতে প্রজন্ম জলেই সমাধি পান—আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করলেও তাদের আর্তি শুনবার কেউ নেই। গরীবের দোষ ধরা সহজ, গরীবকে ধমকানো যায় সহজে—গরীবেরা গুলি খায়, গালি খায় এবং অপমান হজমের জন্য ব্যস্ত হয়; এভাবে গরীবেরা টিকে থাকে, ধনীদের প্রয়োজনেই এরা বারবার পৃথিবীতে পার্শ্বচরিত্র হয়ে থাকে। এদের ভালোভাবে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা সরকার করতে পারে না, বরং ভালোভাবে দমন, পেষণ ও শোষণের জন্য করতে পারে আইন, বিভিন্ন ধারার নতুন নতুন সংস্করণ। এটা ছুঁলে যাবজ্জীবন, ওটা ধরলে দড়িতে ঝুলে মরণ—কেন এমন আইন? মানুষ না খেতে পেয়ে মরে যাবে, কিন্তু গুদাম লুট করে খিদে মেটাতে গেলে যাবে জেলে। ফুটপাতে কেঁদে কেঁদে মরে গেলেও কেউ কাজ দেবে না, কিছু করার মতো অর্থসাহায্য দেবে না—এমনকি কেউ একটু মায়ার চোখে ফিরেও তাকাবে না। কিন্তু যেই-না টাকাঅলার ব্যাগ কেউ ছিনতাই করলো, অমনি জেলে ভরার জন্য এসে যাবে অন্ধ শাসকের উর্দি পরা লোকেরা। কে যেন বলেছিল—হাজারটা শকুন মরে একজন শাসক হয়। শাসকেরা বিলিতি ভাষায় কথা বলে, ফরাসি গলায় হাসে, আরবি সুরে কাশে, হিন্দি টোনে কাঁদে, কিন্তু এদেরকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে চির-অভাগা বাঙালিরা। শাসকের শরীরে দগদগে ক্ষত থাকে বলেই যখন সে অন্যকে দেখে তখন জামা-কাপড় পরা দেখতে পছন্দ করে; কাউকে খালি গায় দেখলেই এর গা গুলায়, বমি-বমি ভাব জাগে। তাই গাঁও-গেরাম বা শহুরে বসতি যেখানেই হোক, বস্ত্রহীনেরা কোথাও শান্তিতে থাকে না। শাসক সমাজে সকাল-দুপুর-রাত্র তিনবেলা পোশাক পালটানোর আচরণ আছে বলে বস্ত্রহীনেরা ঠিক বোঝে না এরা কেমন মানুষ। অন্যদিকে ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে, আর্য-অনার্য বৃটিশ-অবৃটিশ পাক-অপাক কোনো আমলে শাসকেরা কখনোই বস্ত্রহীনদেরকে মানুষ বলে গণ্য করে নি এবং এখনো করছে না।

অনেকের তুলনায় কবির যদিও লাইনে নতুন এসেছে, কিন্তু হাত পাকাতে সময় লাগে নি। ভাত-মাছ-মাংস হজম করার জন্য যেমন কাউকে শরীরতত্ত্ব, অস্থিবিদ্যা আর পরিপাকতন্ত্র শিখে খেতে হয় না, তেমনি যে কোনো নতুন বিষয় অনায়াসে আয়ত্ত করা ওর সহজাত অভ্যাস। প্রাইমারি ইশকুল পর্যন্ত লেখাপড়ায় ও বরাবরই ভালো ছিল;

কোনো কিছু একবার দেখলে হুবহু তার অনুকরণ করার অসাধারণ গুণ নিয়ে জন্মেছে ও। ছেলেবেলায় নানারকম পাখির ডাক, শেয়াল-কুকুরের চিৎকার, এমনকি যাত্রাপালায় গাজী কালু, টিপু সুলতান ও সিরাজউদ্দৌলার সংলাপ গড়গড়িয়ে বলতে পারতো কবির। এজন্য অবশ্য ওকে কেউ কোনোদিন গুণী হিসেবে দেখতো না, বরং তখন হতেই পুরো গ্রামে আট-দশটা ছেলের চেয়ে এক কাঠি বেশি বাউরা বলে পরিচিতি পেয়েছিল। অবস্থা দেখে মনে হয় সাধারণ লোকজনের ধারণা ঠিক ছিল। ভুল হয়েছে আলাউদ্দিন মাস্টারের ভবিষ্যদ্বাণী; যাঁর একটা কমন কথা ছিল—'আমাদের সবারই মাথা আছে, কিন্তু অনেকেরই মগজ নেই।' কবিরের মুখস্থ করার এবং চট করে বুঝবার অসাধারণ ক্ষমতা দেখে তিনি বলেছিলেন, 'তুই একদিন ঠিকই আমাদের গ্রামের বিদ্যাসাগর হবি।' মাস্টার মশাই মরে গেছেন বলে দেখে যেতে পারেন নি, না হলে দুঃখ পেতেন; বিদ্যাসাগর হওয়া দূরে থাক, তাঁর এক কালের প্রিয় ছাত্র বিদ্যাপুকুরও হতে পারে নি। আরেকজনের কথা কবিরের মনে দারুণভাবে দাগ কেটে বসেছে—তিনি হলেন আসাদ আংকেল। তাঁকে কখনো চাচা ডাকলে ক্ষেপে যেতেন, তিনি যুক্তি দেখাতেন—'চাচা' ডাকের মধ্যে কেমন যেন একটা চাওয়া-চাওয়ি ভাব আছে যা 'আংকেল'-এর মধ্যে নেই, বরং এক্ষেত্রে আক্কেল হবার ঠমক আছে। গোপাল ভাঁড়ের মতো যেমন তাঁর ভুঁড়ি তেমনই মজার মানুষ হিসেবে দু-চার গ্রামের মধ্যে জুড়ি ছিল না। কথায় কথায় বাজি ধরতেন এবং কথার আনন্দ দিয়ে লোক হাসাতেন বলে তাঁকে নিয়ে বেশ রসকথা প্রচলিত আছে লোকের মুখে। কবিরের মনে আছে—একবার চা-দোকানের আড্ডায় বসে শিক্ষিত-মতোন কে যেন একজন কচুশাকের পুষ্টিগুণ নিয়ে কথা তুলেছিল; সে-মুহূর্তে আসাদ আংকেল ওখানে হাজির। তিনি চুপচাপ কিছুক্ষণ শুনে দোকানের পাশেই একটা মানকচু দেখিয়ে বললেন—'চেষ্টা করলে এটির মাঝপাতার ওপর শুয়ে দেখাতে পারবো; সবার সাথে একশ টাকা করে বাজি, আর না পারলে ডাবল টাকা ফেরত।' অন্য সময়ে যারা বাজিতে হেরেছিল উপস্থিত এমন দু-তিনজন মোক্ষম সুযোগ পেয়ে সবাইকে সাক্ষী মানলো। বারবার চালাকি করে পারা যায় না। সবাই নিশ্চিত ছিল এবার আসাদ মিয়া ধরা খাবে। এদের মধ্যে একজন আবার পকেটে টাকা নেই বলে আফসোস করলো—'আহারে! বাজিটা ধরতে পারলাম না।' অবশ্য একটু পরেই লোকটি বুঝলো সে এবারের মতো বেঁচে গেছে। সবার কাছ থেকে দু মিনিট সময় নিয়ে আসাদ আংকেল বাড়ি গেলেন। একটা ছবি নিয়ে ফিরে এলেন, কচুপাতার ওপর সেটি রাখার পর সবাইকে প্রশ্ন করলেন—'ওই মিয়ারা কও, এইডা কি আমি? না অন্য কেউ?' মুখ কালো করে হারা পার্টি দেখলো—পায়ের ওপর পা তুলে শুয়ে পোজ দেয়া ছবিতে বড় পেটঅলার হাসি-হাসি মুখ।

কবিরের বাপ দ্বিতীয় বিয়ে করে নিখোঁজ হওয়ার পর ওর ছাত্রজীবনের পাঠ চুকে গেলো। এ সময়ে ওকে আপন মানুষের মতো কাছে টেনে নিলেন সদাহাস্য আসাদ আংকেল, বেশ কয়েক মাস ওকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছেন তিনি। মজমায় বসলে তাঁর গল্প বলার ফাঁকে ফাঁকে পশুপাখির ডাক দিয়ে অথবা যাত্রার সংলাপ বলে আসর জমিয়ে রাখতো কবির। কিন্তু জীবন তো আর এভাবে চলে না! কথায়

আছে—গ্রামের ঘোলা জল শহরের প্যাকেট-দুধের চেয়ে ভালো—এটা অবশ্য শহুরেদের মধ্যে যারা গ্রামের নস্টালজিয়ায় ভোগে তাদের কথা; কিন্তু নিত্যদরিদ্র গ্রামের মানুষেরা ভাবে—'ঢাকা শহরে টাকা ওড়ে, শুধু ধরতে জানলেই হয়।' টিকে থাকার খাতিরেই এক্ষেত্রে কবির ভেবেছে দ্বিতীয় কথাটি। শেষে আসাদ আংকেলের কাছ থেকে পরামর্শ এবং লঞ্চভাড়া নিয়েই কবির এসেছে ঢাকার সদরঘাটে। কিন্তু এক অন্ধ যদি আরেক অন্ধকে পথ দেখায় তাহলে দুজনেই গর্তে পড়ে—এক্ষেত্রেও এমনটি হয়েছে। প্রতিষ্ঠা বলতে যা বোঝায়, আসাদ আংকেল তা সারাজীবনেও পান নি, আর কবিরের অবস্থাও —জাস্ট কোনোরকম বেঁচে থাকা। নতুন চর জাগার পর নদীর বাঁক যেমন বদলে যায়, তেমনই এরপর ধীরে ধীরে ওর কিশোরসুলভ চিন্তাধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে থাকে। প্রথম প্রথম কিছুদিন চা পৌঁছে দিত লঞ্চের যাত্রীদের; আর ঘাটে লঞ্চ লাগলে কুলির কাজ করতো ফাঁকে ফাঁকে। এভাবে ভালোই কেটে যেতো ওর সময়; একদিন কয়েক টাকার হিসেব গরমিল হওয়ায় চুরির অপবাদে চা-দোকানের চাকরিটা নট হয়ে যায়। পেটের জ্বালা তবু এক মুহূর্ত বসে থাকতে দেয় নি ওকে। বিরামহীন তাড়নায় হন্যে হয়ে উচ্ছিষ্টের খোঁজ করেছে বুড়িগঙ্গার জলে-ডাঙায়; ভাগ্যে কখনো খাবার মিলেছে, কখনো মেলে নি। এমনি করে একদিন পরিচয় হয়ে যায় ঘাটের সর্দার কালু ভাইর সাথে। খারাপ লোক কাকে বলে! ধান্ধাবাজ? জোচ্চোর? বদমেজাজী? টাউটার? বাটপার? এ সবগুলো দোষ কালু সর্দারের চরিত্রে আছে। তারপরও কবিরের চোখে সে অনেকের চেয়ে ভালো। লম্বা নাক, লম্বা গলা, লম্বা মুখ, লম্বা চুল, লম্বা শরীরের কালু ভাইর চরিত্রে আর দশটা মানুষের মতো ভালো ও মন্দ দুটো ব্যবহারই আছে—তবে মন্দটির ঝাঁজ দেশী পেঁয়াজের মতো বেশি, আর ভালোটির গন্ধ গোলাপের মতো মৃদু। এই প্রায়-ভালো কিন্তু মেজাজী মানুষটির নজরে না এলে এতোদিনে হয়তো ইঁদুর-চিকার মতো ওকে পাবলিকের পায়ের তলায় পিষে মরতে হতো। হাতে-পায়ে এমন তাগড়া জোয়ান হতে পারতো না। ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে যায় কবির, বাংলা-ফাইভে শেষ সুখটান দিয়ে ছুঁড়ে দেয় জলে, চেয়ে থাকে বুড়িগঙ্গার খোলা বুকে। ফেলে দেয়া সিগারেটের সাথে নিজেকে মিলিয়ে ভাবে—জ্বলে-পুড়ে ছাই হওয়া, তারপর চিরতরে হারিয়ে যাওয়া—এই তো গরীবের জীবন! কতো ভাবে-অভাবে মানুষ বেঁচে থাকে, তবু কারো বেঁচে থাকার সাধ মেটে না। বেঁচে থাকা, কোনোরকমে টিকে থাকাতেই জীবনের সব আনন্দ, সব সার্থকতা। এর কতো যে রং, কতো ধরন; কূল-কিনারা না পেয়ে সবাই মৃত্যু পর্যন্ত হাতড়াতে থাকে। ধর্মঅলারা বলেন—'গরীবের সুবিধা আছে অনেক, টাকা-পয়সা জায়গা-জমি কম, তাই হিসেবও কম—বলতে গেলে মৃত্যুর পরপরই বেহেশত।' এখানে একটু খটকা লাগে, বেহেশতে যাবার প্রধান শর্তই হলো মরে যাওয়া—কেন, বেঁচে থেকে ওখানে যাওয়া যাবে না কেন? বোঝে না কবির। গরীবানার কথা বলেন ঠিকই, কিন্তু এঁরা ইহজীবনেই বেহেশতের সুখ পান, চরম অক্ষম হলেও আর দশ জনের দয়ায় তাঁদের কখনো অভাবে পড়তে হয় না। এঁদের চরিত্রই বুঝি এই—ফুলের গুণগান করতে করতে বাগানে ঘুরে বেড়ান, কিন্তু মাংস রাঁধার ঘ্রাণ নাকে এলে ঠিকই ঘরের দিকে হেঁটে যান। এঁরা নিজের জানালার দিকে যখন-তখন

ধর্মের বাতাস ঘুরিয়ে নেন। মনে আছে, একবার তাবলিগের পাল্লায় পড়ে নুসরাতে (তিনদিনের দাওয়াতী সফর) যেতে বাধ্য হয়েছিল কবির। গাস্ত সেদিন একটু আগে ভাঙ্গে, যেদিন ভালো রান্নাবান্নার আয়োজন থাকে; সাথী ভাইয়েরা চেটেপুটে, এমনকি ডিশ ধুয়েও খায় এবং হেসে হেসে বলে—'এটা সুন্নাতী কোক।' কিন্তু যেদিন শুধু সবজি আর ডাল, সেদিন খাবার চলে না; অন্ন নষ্টকারীরা ভাত ফেলে দেবার সময় বলে—'এটা মাখলুকাতের জন্য...ফিসাবিলিল্লাহ্।'

দুই

পণ্ডিত-মহলে ঢাকা নামের উৎপত্তি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ধারণা প্রচলিত আছে। প্রচলিত একটি কিংবদন্তি হলো—হিন্দুস্থান থেকে এখানে পৌঁছে দেবী দূর্গা ঢেকে (গোপন হয়ে) যান, তাই এ স্থানের নাম হয়েছে 'ঢাকা'। অন্য একটি সূত্রমতে পূর্বে এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ঢাকগাছ (বৈজ্ঞানিক নাম 'বুটকা ফ্রন্ডোসা') ছিল বলেই এমন নামকরণ। আরেকটি ধারণা হচ্ছে—সুবাদার ইসলাম খান যখন এখানে রাজধানী স্থাপন করেন, তখন একটা উঁচুস্থানে দাঁড়িয়ে ঢাক বাজানো হয়েছিল; ঢাকের আওয়াজ যতোদূর পর্যন্ত শোনা গেলো ততোদূর পর্যন্ত রাজধানীর সীমানা নির্ধারিত হলো। আর এ ঢাকের ব্যবহার হতেই হয়তো 'ঢাকা' নামের উদ্ভব। এ বিষয়ে সর্বজনস্বীকৃত কোনো তথ্য নেই। মোঘল আমলে ঢাকার নাম পরিবর্তন করে 'জাহাঙ্গীরনগর' নামকরণের পরেও 'ঢাকা' নামটি লোকমুখে জনপ্রিয় থেকে যায়, কাগজপত্রে জাহাঙ্গীরনগর থাকলেও একসময় তা সাধারণ মানুষের জন্যই অগ্রাহ্য হয়।

ঢাকা বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। প্রায় বিয়াল্লিশ কিলোমিটার দীর্ঘ এ নদীটি সাভারের নিকটে ধলেশ্বরী নদী হতে নির্গত হয়ে নারায়ণ গঞ্জের কিছু উত্তর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে। বুড়িগঙ্গা ও এর জন্মস্থল ধলেশ্বরী নদীর মাধ্যমে ঢাকা জলপথে অন্যান্য বৃহৎ নদীসমূহের সাথে সংযুক্ত। ঢাকায় ঢোকার জলপথের তোরণ হলো সদরঘাট। সব সময় সরগরম সদরঘাট। গ্রাম থেকে নতুন আসা অনেকেই প্রথমে ভুল করে ভাবে আজ হাটবার, কিন্তু এখানে সারা বছরই যে হাটের দিন তা অন্য কারো মুখে শুনে পরে বুঝতে পারে। প্রতি সকালে শোরগোল-চেঁচামেচির এ তীর্থস্থান থেকেই ঢাকার ব্যস্ততা ছড়িয়ে পড়ে; জেগে জেগে ঘুমিয়ে থাকা নগরকে জাগিয়ে তুলতে ছুটে যায় বাস, টেম্পু, সিএনজি, রিকশা আর পায়ে হাঁটা হাজার হাজার মানুষ। মানুষে মানুষে সয়লাব হয় চারদিক; বাসা-বাড়ি, অফিস-কাচারি সবখানে পিলপিল পায়ে পৌঁছে যায় বার রকমের ব্যস্ততা।

ঘাটের সব শোরগোল ছাপিয়ে তীক্ষ্ণ সাইরেন শোনা গেলো। বরিশাল থেকে আসা নতুন একটা লঞ্চ এসে লাগছে। কবির সাঙ্গপাঙ্গদের ইশারা দেয় উঠে পড়ার জন্য। কালু সর্দার পুলিশের হাতে ধরা খাওয়ার পর হতে সাত সদস্যের দলটির নেতৃত্ব এখন

ওর হাতে। এই কাজে ঝুঁকি আছে ঠিকই, আবার কামাই ভালো হলে একটা ভাবসাবও আছে। একটা জিনিস লক্ষ করেছে কবির; টাকা হাতে থাকলে মনে ভাবও থাকে, আর পকেট খালি থাকলে নিজেকে খুব ফালতু মনে হয়—সবার সামনে নিজেকে খুব দুর্বল লাগে। মনা, সেলিম, দুদু, ফকরা, মনির, বুলু ধীরে ধীরে মিশে যায় যাত্রীদের মধ্যে। কেরানিকে সালাম দিয়ে হ্যান্ডশেক করার ভঙ্গিতে পঞ্চাশ টাকা এবং সাথে একটা বাংলা ফাইভ গুঁজে দেয় কবির। কানার হাতে সোনা দিলেও যা লোহা দিলেও তা—এমন একটা ভাব করে টাকাটা পকেটে ভরে কেরানি। ওর কাছে বেহুদা সময় নষ্ট না করে কাজে নেমে পড়ে কবির। সার্চলাইটের দৃষ্টি ফেলে তাকালো চারদিকে, দেখে নিল নিচতলার হান্ডি-পান্ডি, বোচকার ফাঁক-ফোকর, খুঁটিনাটি সব; শুধু কয়েক জোড়া প্লাস্টিকের মাল চোখে পড়ে। হঠাৎ করে দেশের লোকজন কি সব গরীব হয়ে গেছে, নাকি আজকে সব ফকিন্নীরা উঠছে এই লঞ্চে? ফকরার শিস শুনে বুঝলো দোতলায় পাওয়া গেছে। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে স্পটে চলে আসে। 'দারুণ মাল'—আনমনে বলে ফেলে কবির। লুঙ্গির খুঁট ধরে সামনে এগিয়ে যায়। মনা-দুদু ওদের কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে (কাজ বলতে পায়ে পাড়া দিয়ে গণ্ডগোল তৈরি করা। এমনিতেই লঞ্চ-ঘাটে ভিড়লে সাধারণ যাত্রীরা ডেকে জায়গা দখলের প্রতিযোগিতায় নামে। সবাই চাদর বিছিয়ে খুঁটগুলোতে দড়ি দিয়ে বেঁধে টানটান করে রাখে, যেন কুঁচকে না যায়। ডেকের পছন্দসই জায়গার দখল নিয়ে প্রায়ই হুড়োহুড়ি-ঠেলাঠেলি লাগে এবং ইচ্ছে করলে ঝগড়াও বাঁধানো যায় অনায়াসে)। ঝগড়া যখন চরমে ওঠে, সুযোগ বুঝে টার্গেট করা জুতাজোড়া কবির আলগোছে তুলে নেয় লুঙ্গির যথাস্থানে, ফেরার পথে দু বার শিস দিয়ে কেটে পড়ে। এরপর সব আগের মতো ঠিকঠাক, যেমনি হঠাৎ করে হৈচৈ শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ করেই সব থেমে যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যার জুতা খোয়া যায় সে টের পায় অনেক পরে। এভাবে কবিরের দলটি ডেইলি দু-তিন জোড়া জুতা চুরি করতে পারে। জুতাগুলো সাপ্লাই দেয়া হয় গুলিস্তানের চোরাই মার্কেটে। মাঝে মাঝে সেলিম, দুদু ওরা নিজেরাই জুতায় ভালোভাবে রং করে টুকরিতে সাজিয়ে বসে পড়ে ফুটপাতে, আর না হলে পাইকারি রেটে বিক্রি করে আসে। বাটা, এ্যাপেক্স, পেগাসাস হলে ভালো দাম পাওয়া যায়, অন্যগুলোর রেট কম। যে দাম পাওয়া যায় তা সবাই ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়, লিডার হিসেবে কবির সব দিক ম্যানেজ করার জন্য প্রতি খেপে একশ টাকা বেশি পায়।

তিন

যে চুরি করলো আর যার চুরি হলো—দুজনেই সমান অপরাধী; এমনও তো হতে পারে দ্বিতীয় জনের খুব বেশি খোলামেলা হবার কারণেই প্রথম জন চুরিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। না, এ ভাবনা কোনো বিদগ্ধ দার্শনিকের নয়, লালু মিয়া, ধলু মিয়ার মতোই

সাধারণ মানুষ কালু সর্দারের। জামিনে ছাড়া পেয়ে সে প্রতিবার লম্বা একটা শ্বাস নেয়, দীর্ঘশ্বাসটা অবশ্যই সুখের নয়, দুঃখের। এবার নিয়ে মোট এগার বার সে জেলে ঢুকলো আর বেরুলো, সাজাও পেয়েছে বিভিন্ন মেয়াদের। জেলে থাকার সাধ তবু তার মেটে না। ওর কাছে কেবলই মনে হয় দুনিয়ার সবচেয়ে শান্তিময় স্থান বুঝি এটাই, খোদার তৈরি এক নম্বর বেহেশত। সত্তরটা হুর-পরী না থাকলেও ক্ষুধার সময় দু বেলা খাবার এখানে নিশ্চিন্তে জোটে! শোনা গেছে, খুব শীঘ্রই মানবাধিকার কর্মীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার নাকি আরো কিছু সুযোগ-সুবিধা বাড়াবে কয়েদীদের জন্য। অবশ্য বুটঅলা ওস্তাদদের ডাণ্ডা আর অনুগত মশকবাহিনী যা একটু পীড়া দেয়, ব্যাঘাত ঘটায় স্বর্গসুখে। আর চাঁদেরও তো কলংক আছে, তাই বলে কি চাঁদ সুন্দর নয়! ওর যদি কখনো ইচ্ছে পূরণের সুযোগ আসে, জগৎ-সংসার ছেড়ে সে সারা বছর এখানেই থাকতে চাইবে। আর এ কারণেই ছোট-খাটো নানারকম অপরাধ করতে ভালো লাগে; জুতা চুরি, পকেট মারা, ডাইল (ফেন্সিডিল) সাপ্লাই, গাঞ্জার সিলিম ও হেরোইনের পুরিয়া বিক্রি, ইত্যাদি কাজে ওর অনেক মুরিদ রয়েছে। এক সময় নিজেই এসব করতো, এখন শিষ্যদের দিয়ে করায়, আর নিজের ভাগ হিসেবে মাসোহারা আদায় করে। সমস্যা হয় ছমিরনকে নিয়ে, ও পুরান ঢাকাইয়া। এক সময় ওদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল, কিন্তু বাবার বৃদ্ধ হওয়া এবং একমাত্র ভাইটি অসময়ে মারা যাবার পর রাতারাতি জৌলুস হারায় পরিবারটি। প্রতিবার স্বামীর গ্রেফতার হবার খবর শুনলেই ও কেঁদেকুটে বুড়িগঙ্গার জল বাড়ায়, কথায় মন না গললে কর্তব্যরত পুলিশ-কনস্টেবলের পা ধরে লুটিয়ে পড়ে। প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগলেও এখন এ দৃশ্য কালুর গা-সওয়া হয়ে গেছে। সে জানে, সংবাদ শোনামাত্র ছমিরন সুর করে মরণকান্না শুরু করবে, তারপর আলুথালু অবস্থায় পড়িমরি করে ছুটবে থানায়। কাকতি-মিনতির পর প্রথম দফা কান্নাকাটিতে কাজ না হলে, হেঁচকি দিয়ে মূর্ছা যাওয়ার ঘটনা ঘটবে দ্বিতীয় ধাপে। এরপরও কাজ না হলে পরিচিত ঢাকাইয়া ভাইদের কারো তদবিরের মাধ্যমে জামিনের ব্যবস্থা করাবে। কালু আর ছমিরনের সংসারে কোনো সন্তান আসে নি। এজন্য অবশ্য কালু খুশি। প্রথমত, কোনো পিছুটান নেই। দ্বিতীয়ত, এ কষ্টকর জীবন চালানোর জন্য কোনো উত্তরসূরি রেখে যেতে হচ্ছে না।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যাত্রীদের কেউ ঝামেলায় যেতে চায় না। তারপরও কেউ সাধারণত অভিযোগ করলে পুলিশ চোখ বুজে কালুকে ধরে নিয়ে আসে; যেন সদরঘাটে আর কোনো চোর-ফাদার নেই, আর কেউ চুরি করে না। এ নিয়ে অবশ্য কোনো খেদ নেই ওর, বন্দিত্ব নিয়েও খুব একটা ভাবে না। কারণ, ওর চোখে পৃথিবীটাই একটা বাজে জেলখানা; এখানে বাইরে থাকা ভিতরে থাকা একই কথা। সপ্তাহ-মাসের সাজায় সাধ মেটে না, মন বসতে বসতেই ফুরিয়ে যায়। আবার বড় ধরনের কিছু করতেও ভয়—যাবজ্জীবন হলে ক্ষতি নেই, কিন্তু যদি ফাঁসি হয়ে যায়! অকালে মরতে চায় না ও, বেঁচে থাকার মজাই আলাদা। চৌদ্দ শিকের ঘর হতে বের হবার সময় লুৎফর ওস্তাদকে আর্মি কায়দায় পা ঠুকে একটা সেলুট দেয়, মুখে ফুটে ওঠে একটা মোলায়েম হাসি; গাঢ় দৃষ্টি না হলে হঠাৎ ধরা যায় না—এ হাসির ভাঁজে লুকিয়ে আছে অতৃপ্ততা। ডাণ্ডা

দেখিয়ে সেলুটের জবাব দেয় পুলিশ কনস্টেবল লুৎফর খান; যেন স্মরণ করিয়ে দিতে চায় ওয়াটার পলিশ, ইলেকট্রিক শক, রোলার এ্যাকশন প্রভৃতির কথা। শাস্তিগুলো যদিও এ মুহূর্তে কালুর কাছে অতীত, কিন্তু স্মরণাতীত নয়।

ঘিঞ্জি গলিটার মোড়ে এসে একটা ডাবল পান মুখে দেয় কালু। বোটায় চুন নিয়ে হাঁটতে থাকে আয়েশি ঢঙ্গে। চলতে চলতে একটা সিগারেট ধরিয়ে নেয়। চিন্তা করে কোথায় উঠবে—কবিরের কাছে, না রাজার কাছে। জেলে যাওয়ার আগেও রাজার সাথে অনেকদিন দেখা হয় নি। আছে না মরছে কে জানে? পকেটে তেমন মালপানি নেই, অবশ্য অনেক জায়গায় চান্দা জমছে—ঘাটে কয়েকটা চক্কর মারলেই হয়; কিন্তু এখন আর ইচ্ছে করলো না। উস্কো খুস্কো চুলগুলো হাতের আঁচড়ে ঠিক করে নেয়, মনস্থির করে রাজার কাছেই উঠবে সে। রাস্তার পাশে একটা সেলুনে বসে শেভ হবার জন্য, নিজের মুখখানি খুঁটিয়ে দেখতে থাকে আয়নায়। শিশুর মতো ফিক করে হেসে ওঠে কালু, ছোটবেলায় ও স্বপ্ন দেখতো—বড় হয়ে নায়করাজ রাজ্জাক হবে, অথবা এন্ড্রু কিশোরের মতো গায়ক হবে। বড় হতে হতে কবে যেন আলগোছে অনেক কিছুর মতো সেই স্বপ্নগুলোও হারিয়ে গেছে। ময়লা জামা, রং-চটা জিন্‌স প্যান্ট ও সোলফাটা কেড্‌সে বেশ মানিয়েছে ওকে। নিজের পিঠ চাপড়ে নিজেকে বাহবা দিয়ে, গুনগুনিয়ে দু কলি গেয়ে ওঠে কালু :

‘আঁৎকা মইরা যাইবা মানুষ
মইরা যাইবা আঁৎকা,
যমে আইসা কইবো যখন
বিষ মিশাইয়া ভাত খা!
তখন ঠিকই শুনবা গো কথা
সলিড মানুষ হইয়া,
অনেক পয়সা খরচা করবা
ভাইবা জানের সাদকা।’

জেলখানায় বসে এই গানটা সে নিজে বানিয়েছে, যদিও শেষের অন্তরা ঠিকমতো হয় নি। তবুও মনে বড় আশা—একদিন ঠিকই কোন ফাংশনে গানটি গেয়ে হিট করবে। সেইদিন এন্ড্রু কিশোরের মতো তারও নামডাক হবে, লোকজনে ফটো তোলার জন্য আর অটোগ্রাফ নিতে লাইন ধরবে।

চার

অল্পের জন্য রক্ষা পায় রাজা মিয়ার নাওখান। লঞ্চটি না ঘুরালে হয়তো এই পাঁচজন যাত্রীসহ ওর সলিল-সমাধি হতো। ভয় কাটাবার জন্য মনে মনে যপে নেয়—'লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা ছুবহানাকা ইন্নি কুন্ত মিনাজ যোয়ালেমিন।' আঠার-উনিশ বছর বয়সী ছোকরাটি খারাপ ভাষায় খিস্তি দিয়ে ওঠে। জবাব দিতে গিয়েও মুখে পিন এঁটে যায় রাজার। ভাবে, 'কী লাভ ফ্যাসাদ বাড়াইয়া, যা কিছু হয় ভালোর জন্য হয়। যাত্রীরা নৌকার লক্ষ্মী, এগো লগে খারাপ ব্যবহার করা ঠিক না; আয়-রোজগারে অমঙ্গল হয়।' মাঝিকে চুপ থাকতে দেখে বোরখায় ঢাকা বুড়িটিও কী যেন বললো, লঞ্চের হুইসেলে শোনা গেলো না। মনে মনে ও ভেবে নেয়—'ভালোই হলো, শোনাশুনি নাই উত্তরও নাই, বোবা ও বধিরের শত্রু নাই।' পারাপারের কাজে সারাদিন বৈঠা চালাতে চালাতে রাজার হাত দুটি অবশ হয়ে আসে যেন, তবু যন্ত্রের মতো চলে বৈঠার থপথপ নৃত্য; এ নৃত্যে কোনো ইনাম-বখশিস নেই, বাহবা-হাততালি নেই। বরং পান হতে চুন খসলে আছে চোখরাঙানি, ধমক অথবা কিল-থাপ্পড়।

লঞ্চের গায়ে ভেড়ার পরে নৌকার পাটাতনে পাঁচ টাকার একটা কয়েন ছুঁড়ে দিয়ে ছোকরাটি হনহন করে উঠে যায় দোতলায়, পেছন পেছন বোরখা পরা বুড়ি। চেঁচিয়েও ওদের পাত্তা পায় না রাজা। পাঁচজন পার হওয়ার ভাড়া হয়েছে পাঁচ-পাঁচা পঁচিশ টাকা, পেয়েছে মাত্র পাঁচ—তাও অবজ্ঞার ভঙ্গিতে। আশপাশের লোকজনের কাছে ব্যাপারটি বোঝাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে ও। হট্টগোল শুনে একজন অল্পবয়সী আনসার ধমক দেয় রাজাকে—'যে গেলো সে লঞ্চ-মালিকের ছোট পোলা, ভাড়া পাঁচ টাকাই বেশি দিছে, এগো ঘাটে আওন-যাওন ফিরি।' এই নিয়মটা জানা ছিল না রাজার; তিন বছর ধরে বুড়িগঙ্গায় নাও বাইছে, অনেক বিষয় ওর চেনাশোনা, দিনে দিনে আরো কতো কিছু শিখবে। অবশ্য আজ পর্যন্ত এতোটুকু ভালোভাবে শিখতে পেরেছে—গরীবকে ন্যায্য পাওনা দেয়ার সময় টাকাঅলার আত্মা শুকিয়ে যায়; কিন্তু দামি দোকানে বা হোটেলে গেলে পাঁচ টাকার মালে পাঁচশ খরচ করতেও এদের দিল দরাজ। যদি সামনে কোনো গরীব পিপাসার্ত থাকে, আঙুলের ফাঁকা দিয়ে এক ফোঁটা পানিও গলবে না, আর ধনী কেউ এলে পানি তো সামান্য, সফ্‌ট ড্রিংক্‌সের ব্যবস্থাও হয়ে যায়। আর কথা না বাড়িয়ে বিষণ্ন মনে নাও ঘোরায় রাজা, ঘাটে আজ ১০০ টাকা জমা দেয়া লাগবে, রোজগার হয়েছে মাত্র পঁয়ষট্টি। ভাবতে ভাবতে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে ঘাটে লাগে ওর নৌকা। রাজা আবার ডাকতে শুরু করে—'আহেন টরকি-ভোলা-হুলারহাট-পয়সারহাট—কোন লঞ্চে যাইবেন? আইয়েন সাব, সবার আগে পৌঁছাইয়া দিমু।'

পাঁচ

জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে কবিরের শীর্ণ শরীর। সারা গায়ে নীল-কালো দাগ, মাথা ভারী হয়ে আছে—প্রচণ্ড ব্যথা, পাপবোধে ছেয়ে আছে মন। 'কেন জন্মালাম এমন হয়ে?'—প্রশ্ন করে বোবা-বধির বিধাতারে। উহ্, কী মারটাই না দিল বেটারা, মনে একটু যদি মায়াদয়া থাকে! পাগলের মতো চিৎকার করে নিজেকে শোনায়—'চুরি কি আর সাধে করি? কাম পাই না দেইহা করি, বাঁচনের লাইগা করি।' এরপর একটানা প্রলাপের মতো বিড়বিড় করে যায় কবিরের ফোলা ঠোঁট, যার মানে নিজেই হয়তো বোঝে না। এরপর আবার চিৎকার—'ফকরা-মনা-দুদু হুমন্দির পুতেরা কেউ খাড়াইলো না, যেই ধরা পড়ছি অমনি সব দৌড়। জুতা বেইচ্চা কি আমি একলা খাই, দেই না তোগোরে?...উহ্...উহ্‌হু...মাগো!'

বকতে বকতে মাত্র কিছুটা ঝিমুনি লেগেছিল, হঠাৎ ঠাণ্ডা তুলতুলে নরম ছোঁয়ায় চোখ খোলে কবির। মাথার কাছে বসে আছে সেলিনা। ওর মুখে একটা স্নিগ্ধ হাসি ঝুলে আছে, আকস্মিক একশ গোলাপ ফোটার মতো অবর্ণনীয় সুন্দর সেই হাসি। এইমাত্র কবিরের জ্বর অর্ধেক ভালো হয়ে গেলো, ঝপ করে শরীরের ব্যথা কমে গেলো।

'খালি ঘরে কী এতো কতা কও কবির ভাই, খাইবা না? ওডো, হাতমুখ ধোয়াইয়া দেই। খাইয়া ওষুধ খাও, সব ঠিক অইয়া যাইবো, তুমি আবার আগের মতো কামে যাইবার পারবা।'

'নারে সেলি, ওই কাম আমি আর করুম না, দরকার হইলে না খাইয়া মরুম, উপাস করুম, তাও চুরি করুম না। তুই কি চাইবি একটা চোররে লইয়া সংসার করতে? ঘর বান্ধার স্বপ্ন দেখতে? ক, জব দে, চাইবি না...চাইবি না!'

সেলিনা কবিরের হাত ধরে বসায়। ওর চোখে তখন চিকচিক করছে দু ফোঁটা আনন্দাশ্রু। পলক ফেলতে গেলেই বুঝি বাঁধ উপচে গড়াবে, ভেজাবে আশপাশের নাবাল জমিন।

'কবির ভাই, তোমার মনডা এতো নরম, জানতাম না তো!' জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়বোধক দৃষ্টি নিয়ে কবিরের দিকে চেয়ে থাকে সেলিনা, কিন্তু কোনো প্রত্যুত্তরের আশা করে না। জবাবটা ওর জানা হয়ে যায় না-বলা চোখের ভাষায়।

ছয়

সবগুলো মসজিদ দোকানঘর। এখানে মুসল্লিরা ছোয়াব কিনতে আসে আর সময়ের সুবিধা নিয়ে দাম দিয়ে যায় হুজুরের পকেটে বা দানবাক্সে। ডাক্তারের মতো নাড়ির টিনটিন ভালোই বোঝেন ইমামেরা, তাই অনায়াসে এরা ফুটপাতেও বসে যান 'লা-ইলাহার' দোকান নিয়ে। রাস্তার দু পাশে দুটো টেবিল-চেয়ার, দুজন মানুষ, দুটো

চোঙা মাইক; একটায় শোনা যাচ্ছে 'এক পয়সা দান করিলে সত্তুর পয়সা মেলে', অন্যটিতে—'দানকরনীর মাতাপিতা সুখে থাকবে কবরে...।' এ দৃশ্য নিত্যদিনের। রোযার মাস, শুক্রবার বা অন্য বিশেষ কোনো দিন এলে আকুতির টোন ও ধরন পালটে যায়। প্রথম প্রথম মসজিদ নির্মাণের কথা বলা হলেও এখন বলা হচ্ছে উন্নয়নের কথা। ঝিনুক দিয়ে দিঘির জল সেঁচার মতো উন্নয়নের কাজও আর শেষ হয় না।

মসজিদের সামনেই একটি চায়ের দোকানে বসেছিল রাজা। কেটলিতে বলকানো জলের মতো মেজাজ গরম, মুখে রাজ্যের বিরক্তি। ঝামেলা বেঁধেছে দোকানদারের সাথে, মাস-ঠিকা বিলের সাথে নয় টাকার বেমিল। ডেইলি বাকিতে চা খেয়ে মাস শেষে যা বিল আসতো, মিটিয়ে দিত। অন্যান্য মাসে দু-এক টাকার বেমিল হয়েছে এবং তখন কখনো নিজের ভুল বা দোকানদারের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হিসেবে মেনে নিত। এই মাসে তা বেড়েছে, সে কারণেই বেঁকে বসেছে রাজা। ওর দাবি, বাড়িয়ে লিখেছে বেটা! যেদিন খায় নি সেদিনের টাকাও খাতায় তুলে রেখেছে। দোকানদারও নাছোড়বান্দা, হিসেবে কোনো ভুল নেই। কাগজ-কলম খরচা করে পাই টু পাই লিখে রেখেছে, সুতরাং কোনো ছাড় দেবে না। কেওয়াস বাড়ার আগেই একজন মুরব্বির মধ্যস্থতায় বিরোধের মিটমাট হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক নয় টাকার জায়গায় পাঁচ টাকা দেবে রাজা এবং শাস্তিবাবদ আর কখনোই বাকিতে চা খেতে পারবে না। মীমাংসা হবার পর সবকিছু ভুলে দোকানদারের সাথে খোশগল্পে মজেছে রাজা, ঠিক তখনই ছোট ছেলেমেয়েদের মতো ওকে পেছন থেকে চোখ ধরে ফেলে কালু—'বল্ কেডা আমি?' গলার স্বরেই বোঝে রাজা, তাই পালটা দুষ্টুমি—'আমার হউরের পুত, এহন ছাড়ু দেহি, তর সুরতখানি দেইহা ধন্য হই।' চোখ ছেড়ে সামনে আসে কালু।

'কেমন আছস দুলাভাই? আমি তো মনে করছি ভোলাভালা ছমিরন বুইনডারে সাদা কাপড় পরাইয়া তুই দোজখে জ্বলতাছস, আর পূজা ভাটের লগে টাংকি মারতাছস।'

'হা-হা-হা! দুনিয়াডা কি কম দোজখ রে! এইডাই তো সইতে পারি না।'

'একটা নগদ টাকার চা খা, হেরপর ঘরে যাইয়া কথা কমু নে।'

নরম খোঁচা গায়ে না মেখে দোকানদার হো হো করে হেসে ওঠে। কথাটার মানে বুঝতে না পেরে ভিন্ন প্রসঙ্গ তোলে কালু।

'কামে যাবি না আইজ?'

'উহু, যামু না। সারা বছরই তো করি, আইজ না করলাম। আমার বড় কুটুম বহুত দিন পর বাইত বেড়াইতে আইছে, আর আমি হেরে থুইয়া কামে যামু! এইডা তো খারাপ দেহা যায়। গরীব বইলা কি সমাজ-নমাজ বেবাক বিকাইয়া দিছি!'

দুজনেই শব্দ করে হাসে। বাইরে থেকে হঠাৎ দেখে কে বলবে এদের জীবন দুঃখ-দৈন্য আর না-পাওয়ার যন্ত্রণায় ঠাসা?

সাত

পুকুরচুরির মতো নদীও চুরি হয়; অন্ধের ভান করে মানুষেরা দেখে, কালার ভান করে মানুষেরা শোনে, কিন্তু কেউ কিছু বলে না। কারণ এরা বোবার অভিনয়েও বেশ পটু হয়ে উঠেছে। বুড়িগঙ্গার পাড় ভরাট করে গড়ে ওঠে নতুন সভ্যতা। সভ্যতার মতো নদীর তীর ঘেঁষে গড়ে উঠেছে ঘন বসতি। এটাকে অবশ্য সভ্যতা বললে দালানের মানুষেরা গোসসা করতে পারেন, বরং অসভ্যতা বললে ওনারা খুশি হবেন। যারা এখানে থাকে, কমবেশি সকলের বেসাতি বুড়িগঙ্গার বুকে; কেউ ফেরিঅলা কেউ মাঝি, কেউ খালাসি কেউ বা ঘাটের কুলি। নদীর ঘাটে এরা যখন বয়স ভুলে, নারী-পুরুষের ভেদ ভুলে গোসলে নামে, তখন দেখা যায়—এরা শুধু মাথাতেই যত্ন করে সাবান মাখে, ঘষে-ঘষে ফেনা তোলে; গায়ে-গতরের আর কোনো খবর থাকে না। মনে হয় মাথাতেই দুনিয়ার সব জঞ্জাল, আর সব জায়গা ছতর-ঢাকা, তাই পাক-সাফ। চোখ বুলালে দেখা যায় এখানে কুচার বেড়া, মেঝে কাঁচা আর টিন দিয়ে তৈরি খুপরির আধিক্য বেশি। দু-একটা ইটের বাড়ি মাথা তুলে উঠছে বটে, বোঝা যায় এদের ঘরটির মতো রোজগারের স্বাস্থ্যও অন্যদের চেয়ে বেশ ভালো। মোট ঘর চল্লিশটির মতো, রাজা মিয়ার খুপরিটা বসতির প্রায় মাঝামাঝি, আগে-পিছে সমান পথ। রোদ-বৃষ্টি আর রোদের অবাধ যাতায়াত এই ঘরে, জং ধরা পুরনো টিনের ফুটো দিয়ে শুয়ে শুয়ে চাঁদ-তারা দেখা যায়; আধখোলা দরজা দিয়ে ঢুকছে বিকেলের রোদ। একটি অপরিসর চকিতে পাশাপাশি শুয়ে দুজন। দুজনেই সজাগ, কালু সর্দার প্রশ্ন করে—

'এদিককার খবরাবর কী, কবিইর‍্যার ইনকাম কেমুন?'

'হালায় বাঁশ-ডলন খাইছে...'

এতোটুকু বলে মাথা চুলকায় রাজা, যেন কী বলবে ভেবে শুরু করেছিল, কিন্তু হঠাৎ ভুলে গেছে। ওর অবস্থা দেখে ধমকে ওঠে কালু—'আধাবিদি কথা ভাল্লাগে না, যা কইবার পুরাপুরি ক।'

মাথা থেকে এবার রাজার হাত নামলো পিঠে, টানটান হয়ে পেছনের অসম্ভব জায়গাগুলোতে হাত চালাতে চেষ্টা করলো। এ অবস্থায়ও ও বলতে শুরু করলো—'গেলো পরশু পাবলিকের হাতে ধরা পড়ছিল। মনা-ফকরারা পলাইছে, আর অরে সাইজ কইরা দিছে; পরে কেরানি-আনসাররা ছাড়াইয়া আমার কাছে দিছে, আমি অরে আধমরা অবস্থায় বাইত পৌঁছাইয়া দিলাম। পরে হুনছি মাইরের ঠেলায় রাইতে খুব জ্বর আনছিল। তোর ভাবীরে সেলিনা কাইল কইছে, কবির বোলে এই কাম আর করবো না। কসম কাটছে—না খাইয়া মরবো তবু চুরি করবো না।'

'আইচ্ছা, তাই কইছে নাকি? হালারে পথের থন তুইলা বাঁচাইলাম আমি। সব কাজ-কাম শিখাইয়া দিলাম, আর অয় এই লাইন ছাইড়া দিব! ঠিক আছে দেখা যাইবো, মাছ খেলাইয়া খেলাইয়া কিভাবে ডাঙায় তুলন লাগে সেই বিদ্যা আমার জানা আছে।

পিঁপড়ার পাখনা জালাইছে, নাকি সাপের পাঁচ পাও দেখছে...দেওয়ামু নে ছাড়াইয়া, এক্কেরে জনমের লাইগা ছাড়াইয়া দেওয়ামু।'

কিছু কিছু মানুষ সব সময় মনের মধ্যে অ-বদলানোর অসুখ পুষে রাখে, অন্যের বদলে যাবার একটু সুখ দেখলেই এরা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। রাজা খেয়াল করে—কালুর চোয়াল শক্ত হয়। হাত নিশপিশ করে, কাপড় ধোয়ার মতো মুষ্টিবদ্ধ হাত কচলাতে থাকে ও—শক্ত এবং অমসৃণতার কারণে খসখস শব্দ শোনা যায়। রাজা বোঝে, কাছাকাছি কোথায় যেন নিম্নচাপ, শীঘ্রই ঝড় উঠবে। নৌকা দুলবে, পানি ফুঁসবে, সাপের মতো ফোঁসফোঁসানি শোনা যাবে। কোন দিকে যাবে রাজা—এ কূলে, না ও কূলে? নাকি নাও ছেড়ে দেবে অস্থির পানিতে? যা হবার হবে। সবকিছু ভেবে অস্থির হয় রাজা, ঘেমে ওঠে পঞ্চাশ বছরের বহু সংগ্রামে ভাঁজপড়া কপাল।

আট

মাধ্যমিক ইশকুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ফেল করার পর সেলিনার পড়াশুনা আর এগোয় নি। অসচ্ছলতার কারণে দ্বিতীয় বার পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ জোটে নি বলে ঘরের কাজকর্মেই মনোনিবেশ করে। নিজেকে গৃহপটু হিসেবে গড়ে তুলতে ও ধীরে ধীরে সাজসজ্জা, রান্নাবান্না এবং সেলাইয়ের কাজ শিখেছে। এ ব্যাপারে প্রতিবেশী কল্যাণীর মায়ের সাহায্য পেয়েছে। হিন্দু হলেও এদের সংসারটা বেশ গোছানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এ বস্তির একমাত্র ডিগ্রি পাশ কল্যাণীদির বিয়ে হয়েছিল কাউকে না জানিয়ে চুপিচুপি, বনিবনা না হওয়ায় এবং শ্বশুর বাড়ির লোকেরা বিয়ে বাবদ হাতি-ঘোড়া দাবি করায় দুই মাসের মাথায় ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে একই রকম নিশ্চুপে; এখন সে গার্মেন্টসে কাজ করে। ঘটনার পর হতে ওর মা একেবারে চুপ। কেউ কথা তুললে আর কিছু না বলে সবাইকে সরস্বতী না হয়ে লক্ষ্মী হবার উপদেশ দেয়; অনেকেই হুঁ-হাঁ করলেও সেলিনা এই তরীকার প্রথম শিষ্য। লক্ষ্মী মেয়ের মতো ও ঘর দেখাশুনা করার যাবতীয় কাজ শিখে নেয় তার কাছ থেকে। মেয়ের এ পরিবর্তনে বাবাও অবশ্য খুশি—আর কিছু না হোক, অন্তত ঘর সামলানো নিয়ে তাকে ভাবতে হয় না।

ঘর সামলানো নিয়ে একটা আশ্চর্য স্মৃতি আছে সেলিনাদের। মা তখন জীবিত। হঠাৎ দেশের বাড়ি থেকে মামা খবর নিয়ে এলো—নানু খুব অসুস্থ —বাঁচেন কিনা সন্দেহ। বাবা অফিসে ছিলেন, তাড়াহুড়ো করে একটা চিরকুট লিখে ওরা মামার সাথে রওনা দিল। কষ্ট বিফলে যায় নি—গিয়ে নানুর জীবিত মুখ শেষ দেখা হয়েছিল, একদিন পরেই তিনি মারা গেলেন। বাবা এসে জানাজা পেয়েছিলেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আনুষ্ঠানিকতা সারতে এবং সবাইকে বিদায় দিতে পাঁচদিন লেগেছিল; এ ক'দিন ওরা সবাই শোক ও স্মরণের ঘোরে ছিল। চার দিনের মাথায় দুপুরে খাবার টেবিলে বাবার মনে পড়লো—অফিস পার্টিদের খাওয়াবেন বলে যে একটা বড় রুই কিনেছিলেন, ভুলে

সেটা পাকঘরের মেঝেতেই ফেলে এসেছেন। এতোদিনে সেটা নিশ্চয়ই পোকা হয়ে গেছে, আর মানুষ নেই বলে সারা ঘরে হয়তো পোকার রাজত্ব কায়েম হয়েছে। ঢাকায় ফেরার পর অনেকটা আতংকের সাথেই গেট খোলা হলো, কিন্তু পোকা তো দূরের কথা, একটু পঁচা গন্ধও পাওয়া গেলো না। রান্নাঘরে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ, মাছ যেমন ছিল তেমনই আছে, শুধু ওপরটা একটু শুকিয়ে গেছে। বাবা নিজের শরীরে চিমটি কাটলেন এবং বিস্ময় প্রকাশ করলেন—'আমারও শবেমেরাজ হয়ে গেলো নাকি!' ঘটনা বুঝে নিয়ে মা 'ভূতমাছ! ভূতমাছ!' বলে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন। তাঁদের দুজনার কাণ্ড দেখে সেলিনাও আশেপাশের সবাইকে ডাকলো। অল্প সময়ের মধ্যে ঘর লোকারণ্য হয়ে উঠলো। একনজর দেখে কারো সাধ মিটছে না, নানারকম মুখরোচক গল্প জ্যামিতিক হারে তৈরি হতে থাকলো। কেউ বললো—কোনো গাউছ-কুতুব মাছের সুরতে এসেছে, অন্যরা বললো—এর আঁশ বা কাঁটা দিয়ে তাবিজ বানালে মরণ ছাড়া সব রোগের ওষুধ হিসেবে কাজ করবে। মসজিদের হুজুরকে ডাকা হলো, তিনি বললেন—'এটা আল্লাহ্‌র লীলাখেলা, মানুষের জ্ঞান সসীম, এসব বোঝার ক্ষমতা নেই।' জাতীয় পত্রিকার সাংবাদিকেরা কেউ রসিয়ে, কেউ কষিয়ে নিউজ করলেন। এর ফলে পরদিন ভিড় আরো বেড়ে গেলো। দূর-দূরান্ত হতে লোকজন শুধু মাছটাকে একবার দেখার জন্য আসতে লাগলো। সেলিনাদের ঘর আর নিজস্ব থাকলো না, পরিণত হলো জাতীয় জাদুঘরে। এ বিরক্তিকর পরিস্থিতিতে ঘর সামলানো মুশকিল ছিল—এ অবস্থা থেকে ওরা রেহাই পেয়েছিল যখন পুলিশ হেফাজতে মাছটিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরে অবশ্য ময়নাতদন্তের মাধ্যমে জানা যায়—বিক্রির আগে মাছটিকে ফরমালিনে চুবিয়ে রাখা হয়েছিল এবং একই ধরনের আরো কয়েকটি বিষাক্ত মাছ দেশের অন্যান্য জায়গা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

সেলিনার শুশ্রূষায় দ্রুত সেরে উঠেছে কবির। ওর চোখে নতুন জীবনের রঙিন স্বপ্ন। অনেক চিন্তা করে ঠিক করেছে—সেলিনাকে বিয়ে করে কমলাপুর বস্তিতে উঠবে। ওখানে মুটে-কুলির কাজ করবে অথবা রিকশা চালাবে; আয়-রোজগার করে দুটি প্রাণ বাঁচাতে সে পারবেই। আবার সাথে সাথে এটাও ভাবে—কালু ভাইর কাজ না করলে এবং মাসোহারা দিতে অস্বীকার করলে সে খুব সহজে ছেড়ে দেবে না। সুখস্বপ্ন ও দুশ্চিন্তা একত্রে জট পাকাতে থাকে কবিরের মাথায়, সেলিনার রিনিঝিনি পায়ের শব্দ ওকে সব চিন্তা হতে রেহাই দেয়। খুব তড়িঘড়ি ওর অপ্রাপ্তির অসীম আকাশে যেন পূর্ণাঙ্গ পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে।

'কী ঠিক করলা, কবির ভাই? বাইত তো আর থাকবার পারি না। তোমার কাছে আসি দেইখা মহল্লার লোকে নানান কথা কানাঘুষা করে। এদিকে মহাজনের ঋণ শোধ করতে না পাইরা বাবায় হের লগে আমার বিয়া ঠিক করতাছে। আমারে কইছে যেন তোমার লগে বেশি না মিশি, ঘরে আর না আসি। সবাই জানে তোমার চাল-চুলোর ঠিক নাই, কোনো ভবিষ্যৎ নাই।'

সেলিনার কথাগুলোতে আশার আলো বিন্দুমাত্র নেই, কেবল আঁধার দেখলো কবির। ওর পোড়া চোখ বরাবরই এমন; জন্ম হতে আশার আলো দেখার অক্ষমতায় হয়তো। এ মুহূর্তে কবিরের মনে পড়ে গেলো আসাদ আংকেলের কথা। তাঁর বয়স যখন উনত্রিশ তখন নৈশ প্রহরী হিসেবে একটা চাকরি জুটিয়েছিলেন। চাকরিটা পাওয়ার পরই পাশের গ্রামে পছন্দসই এক পাত্রীর সাথে বিয়ের কথা চলছিল, নিজেই নিজের ঘটকালিতে নেমে পড়েছিলেন তিনি। ঘর-দোরের প্রসঙ্গ উঠলে বেশ রসিয়ে বললেন—গ্রামে একটাই দোতলা দালান আছে এবং তিনি দোতলায় বসবাস করেন। সব কথাবার্তা শুনে পাত্রীপক্ষ এলো খবরাখবর যাচাই করতে। পরে তারা জেনেছিল—সরকারি প্রাইমারি ইশকুলের নৈশ প্রহরী হিসেবে কাজ করাতে দোতলার একটি কক্ষে তাঁকে থাকতে দেয়া হয়েছে। যা হোক, শেষ পর্যন্ত আসাদ আংকেল বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে পাত্রীপক্ষের মন জয় করতে পেরেছিলেন এবং পছন্দের পাত্রীকেই বিয়ে করেছিলেন। কবিরের নিজেকে খুব অপদার্থ মনে হলো, কোনো যোগ্যতা অর্জন করতে পারে নি বলে খুব খারাপ লাগলো, নিজেকে খুব গরীব-গরীব মনে হতে লাগলো। একটু আগের সুখস্বপ্নের সুদৃশ্য ফ্রেমটি বাস্তব পৃথিবীতে পড়ে ভেঙে তছনছ হয়ে গেলো শত-সহস্র খণ্ডে; দুটো হাতে তা জড়ো করতে করতে সে শুধু বলতে পারলো—'তুমি তারে কী বল্‌লা সেলি?'

'আমি তো আগের থনই না কইরা আইতাছি। কিন্তু কে হোনে আমার কথা? বাবায় কইছে তোমারে ভুইলা যাইতে। আর শিগগিরই ভালা দিন-তারিখ দেইখা বিয়ার দিন ঠিক করবো। আমারে কইয়া দেও, কেমনে তোমারে ভুলুম? কও কেমনে?'

লতাগাছ যেমন ঝড়ে বা দুর্যোগে টিকে থাকার আকাঙ্ক্ষায় বৃক্ষকে আঁকড়ে ধরে, তেমনি করে কবিরের কাঁধে পরম নির্ভরতায় নেতিয়ে পড়ে সেলিনা। ওর চোখে ঝিলিক মেরে ওঠে ঘর বাঁধবার রঙিন নেশা। সে স্বপ্নটা অবশ্যই মনের মানুষকে ঘিরে—

'চলো, আমরা পলাইয়া যাই। দূরে—বহুত দূরে বুড়িগঙ্গার জলে ভাইসা যাই।'

'কই যামু সেলি, খামু কী? তোরে রাহুমই বা কোনহানে? পারবি তুই আমার লগে কষ্ট করতে, না খাইয়া উপাস থাকতে?'

এ সময়ে ওর মনে হয় চারপাশের সবকিছুই জ্যান্ত, বাতাসেরা কানাঘুষা করছে, কুচার বেড়া সব শুনতে পাচ্ছে। বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে সেলিনা, নিবিড় দৃষ্টিতে তাকায় কবিরের গাঢ় কালো চোখে। এটা এমন চাহনি যে এ চোখের সামনে রাগ তো দূরের কথা, কোনো প্রকারের অভিমান নিয়ে দাঁড়ালেও পাপ হবে। মনের চূড়ায় যে বরফ জমাট বেঁধেছিল তা নিমেষেই গলে যায়; আশ্বাস আর আবেগে আলিঙ্গনের বৃত্ত আঁটসাট হয়।

'তুমি আমারে এহনো চিনো নাই! মরণ পর্যন্ত তোমার লগে আমি আছি। তোমারে ছাড়া কোনো জীবন চাই না। লও, তাড়াতাড়ি লও। কেউ জাইন্যা গেলে সর্বনাশ হইবো।'

কবির বিছানা ছেড়ে উঠে পরন-সই জামা-কাপড়গুলো ভাঁজ করে পলিথিনের ব্যাগে ঢোকাতে থাকে, ওকে সাহায্য করে সেলিনা। স্বপ্নের পিছন পিছন বুঝি আজীবন দুঃস্বপ্ন

তাড়া করে ফেরে; এখানেও তার অন্যথা হলো না। দোযখের শাহী দরবারে একজন সুযোগ্য সম্রাটের মতো ঝাঁপ ঠেলে ঘরে ঢোকে কালু—

'সর্বনাশ যা হওনের হইয়া গেছে, তোগো দুইজনের যম কইরা আল্লায় আমারে পাডাইছে।'

এতোটুকু বলেই কবিরের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিশালদেহী কালু। এলোপাথাড়ি কিল-ঘুষি আর মুখের অশ্রাব্য গালাগালিতে বেসামাল হয়ে পড়ে কবির। কালু সাঁড়াশি হাত দিয়ে ওর টুঁটি চেপে ধরে। হাঁস-ফাঁস করে কবির, মুখ দিয়ে ফেনা বেরোয়, কালঘাম ছাড়ে শরীরে, গোঙাতে থাকে ও। যেমনি আকস্মিকভাবে কালুর আক্রমণ হয়েছিল, ঠিক তেমনি ভাবে শক্ত হাত দুটি ঢিলে হয়ে যায় হঠাৎ। কবির দেখে ঘরময় রক্ত, রক্তে সব সয়লাব। কালুর ক্ষত-বিক্ষত দেহ কোরবানি পশুর মতো তড়পাচ্ছে। ওর ওপর মা কালীর মূর্তিতে বটি হাতে দাঁড়িয়ে আছে সেলিনা। সাংঘাতিক সংঘাতের পরে যদি সুন্দর নিস্পত্তি আসতো, তাহলে জীবন অন্যরকম হতো। এখানেও নিস্পত্তি আসে নি, বরং জমে ওঠে কাহিনী। শাসকেরা এখন ফুঁসে উঠবে, বিচার করে অপরাধীদের দড়িতে ঝোলানোর ব্যাবস্থা করবে। বাঁচতে চাইলে পালাও কবির! পালাও সেলিনা! অনেক দূরে, যেখানে তোমাদের কেউ চিনবে না। তোমরা ঠিকানা না বলে গেলেও ভালোবাসার ওম ঠিক চলে যাবে সেখানে স্বাধীন রোদের মতো, প্রেমের শুভেচ্ছা বাণী ঠিক পৌঁছে যাবে মুক্ত বাতাসের মতো।

নয়

অখণ্ড আকাশের সাথে অনেক খণ্ড মাটির মেলে না বলেই দুয়ের মাঝে এতো ফারাক; ফারাক এতোই যে এদের মিলন কল্পনাও করা যায় না! মিলন না হোক, মানুষেরা মাঝে মাঝে দ্বিধায় পড়ে যায়—কাকে আপন ভাববে—পায়ের কাছের মাটিকে, না স্বপ্নভরা আকাশকে? মাটি অনেক নিকটীয় হলেও আঁধার যেখানে বেশি সেখানে ভুলবশত তারাভরা আকাশকে আপন মনে হতে পারে। জীবন-নদীর এতো বাঁক! দেখে আর অবাক হয় কবির, এই খটখটে রোদ, এই জবর বর্ষা। বিস্ময়ের বিষয় হলো, মানুষের কল্পনার সীমা যেখানে শেষ, জীবন সেখান থেকেও শুরু হতে পারে।

তারপর অনেক খবর...। হুলিয়ার ভয়ে কোথাও স্থিরভাবে থাকে নি ওরা, আবার শহরও ছাড়ে নি। দুজনেই বুঝেছিল দূরের পাহাড়-জঙ্গলে না গিয়ে মানুষের মাঝেই পালিয়ে থাকা বেশি সহজ, কারণ দৃষ্টিসীমায় একই ধরনের অনেক কিছু থাকলে চোখ আসলে কোনো কিছুই নির্দিষ্ট করে দেখে না। বারবার বাসা বদলানোর মতো কাজও বদলাতে হয়েছে; রিকশা চালানো, বাসের হেলপারি, রাজমিস্ত্রীর যোগালি এবং ক্যানভাসার হিসেবে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় অন্ন-সংস্থান করতে হয়েছে কবিরকে।

বাসাবাড়িতে ঠিকা-বুয়ার কাজ করে, সাহেবদের অফিসে টিফিন কেরিয়ার পৌঁছে দিয়ে, অন্যের বাচ্চা দেখাশুনা করে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে সেলিনাও। ক্যানভাসের মজমা মিলিয়ে খুব কম টাকা রোজগার হতো; গরীব পাবলিকের হাত হতে পয়সা বের করা যে কতো কঠিন কাজ তা কেউ না করলে বুঝবে না। কেবল কথার রসে মানুষের মন ভেজে না, তাই মমতাজের গান আর হিন্দি নায়িকাদের দু-একটা 'খুললাম-খুললাম' ছবি দিয়ে পথের আসর সাজাতে হতো। আগডুম-বাগডুম-ঘোড়াডুমের শেষে কবির মহৌষধের কৌটা খুলে বসতো। সেলিনা তখন নানান অঙ্গভঙ্গিতে রঙ্গরসের বয়ান করতো। ওর ভাষায়—চুলকানি, হাঁপানি, চাবানি, গিরায়-গিরায় ব্যথা, শিরায়-শিরায় শিরশিরানি, এ্যাজমা, শ্বাসকষ্ট, মিকরি বাই, জন্ডিস, অর্শ, গেজ, আমাশয়, ডায়বেটিস সহ সব রোগের নিরাময় সম্ভব এই ওষুধে। দূর্বাঘাস পাটায় পিষে পিপারমেন্ট ও আটার সাথে মিলিয়ে বড়ি বানাতো ওরা। পথের লোকজনকে ধোঁকা দিলেও নিজেদের জীবন-যন্ত্রণাকে ধোঁকা দেয়া যেতো না; প্রায়ই দারিদ্রের কারণে উপোস বা আধপেটা হয়ে দিন কাটাতে হতো। দুজনের উষ্ণ আন্তরিকতা শুঁষে নেয় অভাবের বিন্দু শিশির। অর্থকড়ির অনেক অভাব ছিল সত্যি, তবু ওদের সুখের অভাব ছিল না। পান্তা-পেঁয়াজের নাশতায় ওরা খুঁজে পেতো গরম ভাতের ওম। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই, এতো স্বল্প চাহিদায়ও মানুষের জীবন চলে। ওদের দাম্পত্য জীবনে দীপ্তি আছে দাহ নেই, মোহ আছে মাদকতা নেই।

দশ

কালবোশেখি আসার কথা ছিল। ঝড় এলো না, এলো শান্ত সমীরণ। কবির আর সেলিনার সংসারে এসেছে নতুন মুখ, নাম রাখা হয়েছে মধু। অবশ্য এমন নাম রাখার পেছনে একটা কারণ আছে। যেদিন ওর জন্ম হলো, মিষ্টিমুখ করানোর জন্য কারো কাছে এক ফোঁটা মধু পাওয়া গেলো না, দোকান হতে কেনার মতো টাকাও ছিল না হাতে। শেষে নদীর পানিতে চিনি গুলে নবজাতককে খাওয়ান হলো, আর নাম রাখা হলো মধু। বাবা হওয়ার এই সময়টুকু ছিল কবিরের জন্য আলীবাবার মন্ত্রে গুহার কপাট খোলার মতো মণিমুক্তাময়। এ যে কী আনন্দ, যে না হয়েছে তাকে ঠিক বোঝানো যাবে না। আবারো মনে পড়লো আসাদ আংকেলের কথা। একবার গ্রামে এক মধু বিক্রেতা এসেছে, তাঁর ইচ্ছে হলো চেখে দেখার। চেখে দেখার পর খুব ভাব নিয়ে দরদাম জিজ্ঞাসা করলেন। বিক্রেতা আসাদ আংকেলের আলীশান সাইজ দেখে ভাবলো, নিশ্চয়ই বড় গাহেক, দাম চাইলো কেজি প্রতি সাড়ে তিনশ টাকা। ভ্রু কুঁচকে তিনি বললেন—'এই মধুই সাড়ে তিনশ! এর চেয়ে ভালো ও খাঁটি মধু আমার কাছে আছে। তুমি নেবে? বেশি করে নিলে কেজি প্রতি দেড়শ দিলেই চলবে।'

এ তো লোভনীয় অফার! খুশিতে মধুঅলার চোখ চকচক করে ওঠে। গতকালও সে যখন মধু কিনেছে—দাম পড়েছে কেজিপ্রতি দু-শ। মনে মনে সে ভাবলো—ব্যাটা নিশ্চয়ই বাজারের খবর রাখে না। আনন্দটা চেপে গিয়ে সে অন্য ভান ধরলো—'নিজের ঘরের মধু বুঝি!'

'ঠিক ধরেছো, তা না হলে আর কিভাবে পারতাম! আমার তো কোনো লস নেই, আল্লার মাল বেচে যা পাই তা-ই লাভ।'

'কতো কেজি হবে?'

'তা, মণ দুই তো হবেই...'

'কিন্তু আমার কাছে যে অতো টাকা নেই।'

'বেচে বেচে দিও, অতো তাড়াহুড়ো কিসের? আপাতত পাঁচ কেজির দাম অগ্রিম দাও, কিছু কেনাকাটা করতে হবে—ভুলে ঘর থেকে টাকা ছাড়াই বেরিয়েছি।'

দেরি করে না মধুঅলা, গাঁট থেকে সাড়ে সাতশ টাকা বের করে দেয়। টাকা নিয়ে আসাদ আংকেল বাজার করে বাড়িতে ফিরে আসে, পেছন পেছন মধুঅলা। ভেতরে ঢুকেই 'মধু-মধু' বলে উচ্চস্বরে হাঁক-ডাক শুরু করেন। কিছুক্ষণ পরে যে দশাসই লোক নিয়ে বের হলেন, তাকে দেখেই মধুঅলার অবস্থা খারাপ, এ নিশ্চয়ই ফেরারি ডাকাত কিলার-মধু। পড়ি-মরি করে কোনোমতে পালিয়ে বাঁচে মধুঅলা। পরে মনে হয় জানের সদকা হিসেবে সে টাকার শোক ভুলতে পেরেছিল।

ভবিষ্যৎ এমন এক নদীর নাম যাতে অতীত ও বর্তমানের ঝরনা জল ঢালে অবিরত। কয়েক বছর পার হয়ে গেছে; এরই মধ্যে উড়েছে প্রচুর ধুলো, বয়ে গেছে অনেক হাওয়া, বদলেছে রোদের তাপ, জোছনার স্নিগ্ধতা, মাটির ঘ্রাণ, ঘাসের গন্ধ। নদীর জলে ঢেউ থাকবেই, কখন সে পুরোপুরি শান্ত হবে তার জন্য অপেক্ষা করা বৃথা। আর মানুষের মনও যে কোন অবস্থায় কী আচরণ করবে তা মানুষের অগোচর। জল হয়ে যদি কেউ নদীতে পড়ে তাহলে সাগরের দেখা পাবেই, তার নিশ্চয়তা কই! আবার কেউ কুয়োয় পড়লে যে সাগরে পৌঁছতে পারবে না, হলফ করে কি তা বলা যায়! বার ঘাটের জল খেয়ে সেলিনা ও কবির আবার আশ্রয় নিয়েছে বুড়িগঙ্গার জলেই, যদিও এ সময়ের মধ্যে আরো অনেক কিছুর মতো নদীটির রং ও অবয়ব পালটেছে। এ পর্যায়ে আর জুতাচোর হিসেবে নয়, এবার ঠাঁই মিলেছে লাউয়াদের বেদে-বহরে। অভিজ্ঞতা হতে ওদের উপলব্ধি হয়েছে—এখানে-সেখানে নিরুদ্দেশ ভ্রমণ একেবারে নিরানন্দের নয়। মাঝারি সাইজের একটি নৌকায় ওদের বাসস্থান। এরই মধ্যখানে খাওয়া-ঘুম-প্রেম-অভিমান এবং জীবনের আর সব অনুষঙ্গ জলের মতো তরল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, গড়িয়ে যায়, উথলে ওঠে, উপচে পড়ে। কবির আর সেলিনা মধুকে নিয়ে প্রতিদিন লাল-নীল স্বপ্ন বোনে আগামীর জীবন-নৌকায়। ওরা শিখেছে সবার মনের মধ্যে এক টুকরো বরফ আর এক টুকরো অঙ্গার রাখা ভালো—এবং এগুলোর পরিমিত ব্যবহারেই জীবন পার করা সহজ।

• • •

চাঁদের শরীরে নীল কামিজ

বিশ্বাস হাফিজ

উৎসর্গ :

সন্তানের মঙ্গল কামনায় যাঁদের হৃদয় অবারিত, উন্মুক্ত
এবং
সকল শিক্ষা-বঞ্চিতদের

লেখক-পরিচিতি

গোপালগঞ্জ জেলার সদর থানার করপাড়া ইউনিয়নের বনগ্রামে ১৩৮২ সালের ১০ পৌষ জন্ম। পিতা মোঃ সিরাজুল হক বিশ্বাস একজন কৃষিজীবী, মাতা ফুলজান বেগম সুগৃহিণী। স্কুল জীবন থেকে লেখালেখি শুরু। শুরু কবিতা দিয়ে। ২০০৩ সালে তাঁর প্রথম বই 'এক ফোঁটা নীলের ছোঁয়া' (কবিতা) বের হয়। সেই থেকে তাঁর দু চোখে সৃষ্টির সুগভীর স্বপ্ন খেলা করে। কিন্তু কঠিন বাস্তবতার কষাঘাতে সেই স্বপ্ন বারবার ভেঙে যায়। তখন সুকান্তকে খুব বেশি মনে পড়ে—'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়।' তবু ফিরে ফিরে চান। বেঁচে ওঠেন। বীজতলা থেকে শস্য পর্যন্ত চেয়ে থাকেন।

বর্তমানে ঢাকা শহরের বড় বড় দালানের আড়ালে ইট-বালি-সিমেন্টের দেয়ালে ঘেরা, মাথার ওপরে টিনের চালা ছোট মেস-রুমে বাস করছেন। পেশায় মটর-শ্রমিক। সারাদিন কর্ম সম্পন্ন করে সৃষ্টিচর্চায় বেশ জ্বালাতন করেন রুমমেটগণকে। লেখক তাঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ।

স্বপ্ন-ধাপ ১

বেশ কয়েকদিনের ছুটিতে নয়ন বাড়িতে এসেছে। অসচ্ছল পরিবারের নিত্য যন্ত্রণার ফ্যাঁত-ফ্যাঁতানিতে তার ছুটির সময়টা ভালো কাটছে না। সারাদিন সংসারের কাজ-কর্ম করার পর তাই প্রতিদিন বের হয় বাড়ির পাশের রাস্তায়। ভালোই লাগে। পিচঢালা রাস্তা, দু পাশে গাছের সারিগুলো বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে। মনে পড়ে আজ থেকে বিশ বছর আগের সেই কাদাগলা পথ, যা সাপের মতো এঁকেবেঁকে ছিল। আজ তার গায়ে আধুনিকতার পোশাক। নিজেদের বাড়ি থেকে একটু দূরে রাস্তার গা ঘেঁষে একতলা দালানঅলা বাড়িটা কল্লোলীদের। হাঁটতে হাঁটতে সে বাড়িটা অতিক্রম করতেই পেছন থেকে একটা চেনা শব্দ ভেসে এলো।

'নয়ন ভাই।' আবছা আঁধারে নয়ন পেছনে ফিরে চেহারাটা চিনতে পারলো না, তবু জিজ্ঞাসা করলো, 'কে?'

'নয়ন ভাই, আমি কল্লোলী।' নয়ন অবাক হলো। বার বছর আগে যে কল্লোলী তার কপালে প্রথম প্রেমের তিলক সেঁটে ছিল, তারপর টানা তিন বছর ভেতর-বাহিরের দৃষ্টিতে দৃশ্যমান ছিল। হঠাৎ এক সময় প্রেমের গাড়ি উলটে গেলো। নয়ন তখন সবে এসএসসি পাস করেছে। তার আর্থিক সচ্ছলতা আসতে তখনো দূরপথ অতিক্রম করতে হবে। তাই নগদ এবং নিশ্চিত অর্থ-যোগানদাতা পাশের বাড়ির সরকারি চাকরিজীবী চাচাতো ভাইয়ের সাথে প্রেম-প্রেম খেলায় মেতে উঠলো কল্লোলী। তার পর থেকেই নয়ন ভালোবাসার যন্ত্রণাকে পাষাণে ঘষতে থাকলো। বাড়ি থেকে বের হলো চাকরির সন্ধানে, যেখানে নিশ্চিত অর্থ-যোগান সম্ভব। ভুলে যেতে চেয়েছে সেই প্রেম যে প্রেম অর্থের কাছে দুর্বল। কিন্তু প্রথম প্রেম—সে তো যন্ত্রণার অক্ষয় পাথর বা সুখের; তার স্মৃতি ভোলা যায় না। তাই সে-ডাকে পেছনে ফিরতেই হলো।

কল্লোলী নয়নের কাছে এসে হাত ধরলো। মিষ্টি হেসে বললো, 'চলো, আমরা দুজন সারারাত এমনি করে হাঁটি।' নয়ন চারপাশে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকালো, কেউ কোথাও আছে কিনা।

'তুমি কী দেখছো?'

'কিছু না।'

'তাহলে ঘুরে ঘুরে তাকালে ক্যান?'

'বলো, কী বলবে? কেন ডাকলে?'

'বলেছি তো।'

'শেষ হয় নি।'

'দেখো নয়ন ভাই, তুমি এখনো বিয়ে করো নি। আমিও না। তুমি কেন করো নি তা জানি না। তবে আমি কেন করি নি তা বলতে পারি।'

'বলো।'

'প্রথমত ভুল স্বীকার করছি এবং তা ভালোভাবে বুঝতে পেরেই। ভালোবাসা আসলে ভালোবাসা, হোক তা দুমড়ে পড়ে থাকা কুঁড়েঘরে, তবু তা শ্রেষ্ঠ সুখ। তুমিও হয়তো আমাকে...'

'তুমি আবার ভুল করলে।'

'যেমন?'

'না থাক। তারচে আজ রাতের আকাশ, চাঁদতারা, গাছপালা, বাতাস এসব দেখি। চলো, স্কুল ঘরটার সামনে গিয়ে বসি।'

'নয়ন ভাই, মনে আছে, আমরা কতো সন্ধ্যায় চুরি করে এইখানে দেখা করেছি?'

'হ্যাঁ।'

'আজ রাতটা মনে হয় সেসব রাতের চেয়ে বেশি সুন্দর। চারপাশ জনমুক্ত। চাঁদের বৃষ্টি ঝরছে গাছের পাতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে, আলো হয়ে নামছে, আমরা ভিজছি। বাতাস এসে তোমাকে-আমাকে এক করে দিচ্ছে। নিস্তব্ধতায় ঝিঁঝিঁদের আনন্দরোল পতনহীন। দু একটা জোনাক পোকা গাছের অন্ধকার আড়ালে বারবার জ্বলছে। নয়ন ভাই!'

'বলো।'

'রাত শেষ হয়ে এলো। সুখতারা চলে গেছে?'

নয়ন উঠে বসলো। বললো, 'আমরা কোথায়? আমরা তো স্কুলমাঠে বসেছিলাম, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এখন কোথায়?'

ঘন অরণ্য। নিঝুম দ্বীপ। দৃষ্টির সীমানা পর্যন্ত শুধুই অরণ্য। কল্লোলী ভয়ে ভয়ে বললো, 'নয়ন ভাই, চলো পথ খুঁজি।'

'হ্যাঁ চলো।'

যেতে যেতে দুজনেই ক্লান্ত। একটু সামনে ছোট খালের মতো দেখা যাচ্ছে। 'ও দিকেই চলো।' বললো নয়ন। মৃদু স্রোত বইছে। স্বচ্ছ পানি। 'একটু বিশ্রাম নিই এখানে?' বললো কল্লোলী।

নয়ন পানির কাছাকাছি গিয়ে পানি ছুঁতেই পড়ে গেলো পা পিছলে। পানিতে পড়লে কি আর ভিজতে বাকি থাকে? তাই হাতমুখ, সাথে সব ধুয়ে উঠে এলো।

'নয়ন ভাই, ওই দিকে কেমন একটা শব্দ হলো না?'

'হ্যাঁ।'

হাঁটতে হাঁটতে কল্লোলী বলে উঠলো, 'মনে আছে সেই রাতের কথা?'

'কী কথা?'

'ওহ্‌হো, বলতে গিয়ে ঘুরিয়ে ফেললে। আমি নতুন করে ভুল করছি!'

'হ্যাঁ।'

'সেটা কী রকম?'

'যেমন, কোনো ক্ষতস্থান শুকোতে শুরু করেছে। কিন্তু সেখানে বুঝে-শুনে কেউ গুঁতো মারলো। তাতে যন্ত্রণা নতুন করে জন্ম নেয়। তা করাটা কি উচিত?'

ঘন বন। সূর্যের আলো স্পষ্ট নয়। তবু দিনের আভা বোঝা যায়। সাড়াহীন অরণ্য। ভয় হয় মাঝে মাঝে।

নয়নের কথা শেষ। কল্লোলী বললো, 'একটু দাঁড়াও, একটা ফুল ছিঁড়ে আনি।' বলেই দু-চার কদম দূরে ফুটে থাকা অতি সুন্দর নীলরঙা ফুলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ফুল আর কল্লোলী। কল্লোলী আর ফুল। নয়নের দৃষ্টি গুলিয়ে এক নীলাভ নরম কুয়াশার আবরণ তৈরি হলো। এক অপূর্ব গুঞ্জরণ ভাসতে লাগলো বাতাসে। কিছুক্ষণ মোহান্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো সে। একটা শুকনো পাতা ঝরে পড়লো তার মাথায়। খেই ফিরে পেলো। ডাকলো, 'কল্লোলী, এই কল্লোলী। জলদি করো, বাড়ি ফিরতে হবে।'

'নাও।' ফুলটা বাড়িয়ে ধরলো নয়নের দিকে।

'না।'

'কেন নেবে না? এতো সুন্দর ফুল তোমাকে দেবো বলেই তো...! ফুল ভালো লাগে না তোমার?'

'লাগে।'

'তাহলে ধরো।'

'তোমার হাতেই থাক।'

'তুমি নিলে ক্ষতি কী?'

'আমি ভালোবাসি নীল ফুল, নীল আকাশ, নীল সাগর, নীল কাপড়ে মোড়া শরীর, নীল নিয়ন। তাইতো ফুলটা নিতে পারবো না। যে যার স্থানে সুন্দর হয়ে থাক। আমি সেভাবেই ভালোবাসতে চাই। নিঃশেষ করতে চাই না।' কথা বলতে বলতে ছোট খালটা পার হলো।

পাহাড়ের সবুজ আঁচল বেয়ে হাঁটছে। খিদেয় পেট জ্বলছে। নয়ন বুঝতে পারছে কল্লোলীর হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। নিজেরও হচ্ছে। কিন্তু প্রকাশ করলে চলা থেমে যাবে, তাই শক্তি ধরে রাখতে ছয়শ ফুট উঁচু থেকে ঝরঝর করে পাহাড়ের শরীর বেয়ে ঝরে পড়া ঝরনার দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলো, 'দেখো কল্লোলী, ওই যে ঝরনা। কতো ঝরঝরে সাদা আর সুশীতলও নিশ্চয়।'

'আমার ভালো লাগছে না।'

'লবণ কম?'

'ধ্যাত, ফাজলামো রাখো। আমি আর হাঁটতে পারছি না।'

নয়ন দপ করে বসে পড়লো। 'আমার কাঁধে ঝুলে পড়ো। আর মাত্র কয়েক মিনিট। আমার বিশ্বাস, ওই ঝরনাটা পার হলেই খাবারের সন্ধান পেয়ে যাবো।' ঝরনার কাছে এসে কল্লোলীকে ঘাড় থেকে নামালো। 'উহ্, দম বন্ধ হয়ে আসছে, চলো, হাতমুখ ধুয়ে বিশ্রাম নেই।'

একটা বড় পাথরে উঠে বসলো। ঝরনার জল ছুঁয়ে যেন ক্ষুধা ভুলে গেছে। নয়ন শরীর বিছিয়ে দিল পাথরের গায়ে। কল্লোলী ঝরনার সাথে কথা বলছে। নিশ্চুপ পৃথিবী, শুধু ঝরনার টুপটাপ, কুলকুল আর ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ। ধীরে ধীরে চারপাশে আঁধারি আভাস ফুটলো। ঝরনার রং বদলে গেলো। অন্ধকার গাঢ় হতেই অরণ্যের ছাদ ফুটো করে আকাশের গায়ে দৃশ্যত হলো একগুচ্ছ তারা। চাঁদ ছিল কিছুটা দূরে, তবু আলো ছিল স্পষ্ট। গাছের পাতার ফাঁকে যেটুকু আলো ঝরে পড়ছিল তার সাথে মিশে গেলো কল্লোলী। সে নয়নের কাঁধে হাত রেখে বললো, 'সত্যিই অপূর্ব! যেন বসে আছি অভিজাত বনঘরে। পিটপিটে সাদা আলোর ঝাঁড়বাতি।' নয়ন বললো, 'মাঝখানে তুমি আমি চাইনিজ খাওয়ায় রত আর রসাত্মক শব্দ উচ্চারণে থমকে থমকে হাসিতে মগ্ন।'

হঠাৎ নয়নের চোখে পড়লো দল বেঁধে কী যেন আসছে। মানুষের মতো মনে হলো। কাছাকাছি আসতেই বুঝতে পারলো—না, মানুষ নয়। বিরাট একপাল মোটা-তাজা বুনো শুঁয়োর। ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে ঝরনার দিকে এগিয়ে আসছে। কল্লোলী বললো, 'আমার ভয় হচ্ছে।'

'ভয় নেই। ওরা নিরীহ প্রাণী। মানুষকে আক্রমণ করে না। একটা মজার ব্যাপার জানো? ওরা হাঁটতে হাঁটতে বাচ্চা প্রসব করে। আর সদ্য-প্রসবিত বাচ্চা মাটিতে পড়েই গড়াগড়ি দিয়ে উঠে পড়ে। উঠেই মায়ের সাথে দৌড়াতে শুরু করে। এক সাথে একাধিক বাচ্চা দেয়। ওদের বিবেক বা বুদ্ধি নেই। আর তা থাকার দরকারও নেই। মানুষই একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন প্রাণী।'

'দেখো নয়ন, ওরা কী করছে।'

'ওরা বোধ হয় গোসল করছে। সারাদিন চষে বেড়িয়েছে মাঠঘাট।'

কয়েক ঘণ্টা ধরে জলজ খেলা শেষে আবার হারালো বনছায়ার আড়ালে। নয়ন বলে উঠলো, 'চলো, আমরাও জ্যোৎস্না-গোলা কালো-সাদা ঝরনার জলে উল্লাস করি।'

'কেন, আমরা কি জঙ্গলে মাঠ চষেছি নাকি?'

'না, তবে...'

'দুষ্টু কোথাকার!'

'চলো।'

'কাপড়গুলো ভিজলে পরবে কী?'

'এমন রাত আর পাবো কখন ঠিক নেই। গোসল সেরে না হয় কাপড়গুলো খুলেই রাখবো। ভোর হতে-হতে শুকিয়ে যাবে।'

'লাজ-লজ্জা বলতে কিছু কি আছে?'

'বনের গাছপালা নির্বাক, পাহাড়ের পাথর নির্জীব। চাঁদতারার আলো আর ঝরনার জল শুধু হৃদয়ের কানে কথা বলে। অতএব, নেই কোনো শব্দ করে লজ্জা দেয়ার কেউ।'

'তুমি আছো না!'

'আমি! আমি আর তুমি তো...'

কল্লোলী কিছুটা আপত্তি সত্ত্বেও রাজি হলো। ক্রমশ রাতের তারাগুলো লুকাতে লাগলো আকাশের আড়ালে। চাঁদও চোখ বন্ধ করে ঘুমে জড়সড় হতে থাকলো, একটু পরেই সূর্য চোখ খুলবে বলে।

স্বপ্ন-ধাপ ২

দিনের মধ্য প্রহর। চারপাশ ছায়ামাখা নরম আলোয় ঘিরে আছে। শুকনো পাতা বাতাসে ডিগবাজি খেয়ে নয়নের কানের সাথে ঘষা খেলো। সে চোখ খুললো। পাথরের বিছানায় শুয়ে আছে উলঙ্গ দুটি দেহ, তাও বিপরীত লিঙ্গের। লজ্জার ঝাঁপি চেপে ধরলো নয়নকে। ব্যস্ত হয়ে কাপড় পরলো সে। কল্লোলীর শরীর তার কাপড়ে আব্রু করে দিল। কল্লোলী চোখ খুলে তড়িঘড়ি কাপড় পরে নিল।

'নয়ন, আমার খুব খিদে পেয়েছে।'

'ওই দিকটায় চলো।'

'দেখো, ওটা মনে হয় পেয়ারা গাছ।'

'তাই তো! দাঁড়াও, আমি দেখছি।'

নয়ন অনেকগুলো পেয়ারা নিয়ে নেমে এলো। বললো, 'নাও, খেতে খেতে হাঁটি।'

হাঁটতে হাঁটতে বিচিত্র এক ঝোপের কাছে থমকে দাঁড়ালো। লতা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঝোপের জন্ম। লতার বাঁকে বাঁকে আশ্চর্য ধরনের ফুল ফুটে আছে। প্রত্যেকটা ফুলের মাঝখানে একটা বেশ লম্বা কাঁটা মাথা বের করে আছে। পাশেই ঘাস আর ঘাসফুলে ছাওয়া ছোট ঢিবি। লাল, নীল, হলুদ, বেগুনি হরেক রঙের ফুল ফুটে আছে। নয়ন বসে আছে ঢিবির ছোট খাদে। কল্লোলী ফুল তুলছে, নীলরঙা ছাড়া সব। ওটা ছুঁতে গেলেই মায়া হয়। ছেঁড়া ফুল নিয়ে নয়নের পাশে বসলো।

'ফুলগুলো দেখো!'

'দেখেছি।'

'ছুঁয়ে দেখো।'

নয়ন তার পুষ্পিত চেহারার দিকে চেয়ে বললো, 'এই তো ছুঁয়ে দেখলাম।'

'কী ছুঁয়ে দেখলে?'

'ফুল।'

'কোথায় ছুঁলে?'

'তোমার মুখে।'

'কিভাবে?'

'দৃষ্টি দিয়ে।'

'তোমাকে তোলা ফুলগুলো দেখতে বলেছি।'

'তোমার মতো অতো সুন্দর না।'

'যেমন?'

'তুমি নীল রঙের ফুল। তাই ছুঁয়ে দেখা যায়, ছেঁড়া যায় না। ফুল ছেঁড়া পাপ, তা সে যে রঙেরই হোক। নীল রং হলে তো কথাই নেই, মহাপাপ।'

'তুমি বোকা।'

'হ্যাঁ।'

'কারণ?'

'আমি ওয়েল্ডিং প্রেমে পড়েছি। হাইড্রোক্সাইডের জ্বলন্ত শিখার প্রচণ্ড উত্তপ্ত নীলাবরণে ঢাকা। যেমন—ভালোলাগা+ভালোবাসা=গাঢ় নীল উত্তাপ।'

'তার মানে?'

'মানে, যে প্রেম আমাকে বহুদিন আগে ছেড়ে গিয়েছিল আমার বেকারত্বের কথা ভেবে, সেই প্রেম আবার আমাকে কাছে ডাকছে। আর আমি কতো প্রেম-ভুখা, অমনি জুড়ে গেলাম তার সাথে। হাইড্রোক্সইড গ্যাসের নীল আগুনের প্রচণ্ড তাপে যেমন ঝালাই করা হয় ভেঙ্গে যাওয়া লোহা বা অন্যান্য ধাতু, ঠিক তেমনি। বুঝেছো?'

'হ্যাঁ।'

'কী?'

'তুমি আমাকে কষ্ট দিতে চাও।'

'ফুলগুলো তোমার দু হাতে তোলো।'

কল্লোলী ফুলগুলো তুলে ধরলো অতি আবেগে। নয়ন চুমো খেলো তার ফুলসমেত হাতে। তারপর বললো, 'এবার খুশি তো?' কল্লোলীর ঠোঁট দুটো মৃদু কেঁপে উঠলো। ফুটলো সুবাসিত হাসি।

হঠাৎ যেন চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। শোঁ-শোঁ শব্দে বাতাস ছুটছে। পাতার ছাদ ভেঙ্গে বিজলি রং আঁকছে। বেজাত বাতাস, সাথে দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি। সূর্য ঘুমোতে তখনো অনেক বাকি। হঠাৎ বাজ পড়ার বিকট শব্দ। দুজনেই চোখ বন্ধ করে জড়োয়ার মতো বসে রইলো।

'প্রকৃতির এই এক নিষ্ঠুর খেয়ালিপনা। বিজ্ঞাপন নেই। নেই পূর্ব সংকেত। এই শান্ত, সুশীল, অপূর্ব রূপসী। এই আবার হৃদয়হীন ঠুঁটো বউ। কখনো প্রাণখেকো রাক্ষসী।' নয়ন কথাগুলো কল্লোলীর কানে কানে বলছে। এভাবে কাটলো খানিক সময়। তারপর নয়ন বললো, 'বাতাস থেমে গেছে, মেঘের ফোঁটাও পড়ছে না। এবার এক সাথে চোখ খুলি। ওয়ান, টু...।'

'না।'

'কেন?'

'তুমি নীল শরীরের ফুল ভালোবাসো?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আরো কিছুক্ষণ তোমাকে ধরে থাকি?'

নয়ন উত্তর দিল না। ভাবলো, যাক না সময়। থাক না পিছুটান পিছে পড়ে। জীবনের রঙিন পাখি থাক না এখানে কিছুটা সময়।

মৃত্যুর ডাক শোনা যায় না, এটা ততোটা দূরের সময়। হঠাৎ মানুষের কথা শোনা গেলো। চোখ খুললো দুজন। আলাদা হয়ে গেলো। একি আশ্চর্য! তারা অস্ফুট এক আলোক নগরীর ছোট দালানে বন্দি। জানালার বাইরে, ঘরের ভেতর সবখানে কেমন সাড়াহীন, ভূতুড়ে আলো-আঁধারির খেলা—এক চামচ আলো, এক চামচ অন্ধকার এক পাত্রে গোলালে যেমন হতে পারে। নয়ন জানালায় মুখ খুলে ডাকলো, 'কেউ আছেন?' কিছুক্ষণ শব্দহীন, তারপর শোনা গেলো—'আসছি।' দরজা খোলার শব্দ হলো। নয়ন এবং কল্লোলী ধীরে ধীরে দরজায় পা রাখলো। বাইরে যেদিকে চোখ যায় শুধুই ভাঙ্গাচোরা ঘর এলোমেলো পড়ে আছে। কোনো মানুষ নেই। হাঁটতে হাঁটতে কল্লোলী উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো, 'পেয়েছি, ওই যে নদী।'

'নদী?'

'হ্যাঁ।'

'আনন্দিত হবার কী হলো?'

'তুমি আসলে...'

'কী?'

'না থাক।'

'বাঁচলাম।'

'মানে?'

'নীল শরীরে অন্য রং দেখতে হলো না।'

'চলো, ওদিকে যাই।'

'হ্যাঁ চলো।'

নদীর কাছে গিয়ে তো অবাক। পানির রং লাল। 'একি! এমন পানি তো আর দেখি নি!' বলতে বলতে পানিতে আঙ্গুল ভিজালো কল্লোলী। আঙ্গুল তুললো। কিন্তু তখনো লাল পানি লেগে আছে। ঠিক যেন রক্ত।

'কল্লোলী, এটা পানি, না অন্য কিছু?'

'কী জানি! আমার ভয় হচ্ছে।'

'তোমার ভয় করছে!' বলেই নয়ন ঝাঁপিয়ে পড়লো নদীতে। পানির নিচে কী যেন পায়ে ঠেকলো। ডুব দিয়ে ধরে আনলো। একি! মানুষের কঙ্কাল! মুখের মধ্যে খানিকটা লাল পানি ঢুকে পড়লো। ভীষণ নোনতা। বমি আসতে চাইছে। নয়ন খকখক করছে। কঙ্কালটা উঁচু করে ধরে রাখছে।

'নয়ন, প্লিজ উঠে এসো। ওটা ফেলে দাও, নয়তো ভয়ে মরে যাবো।' বলতে বলতে কল্লোলী অজ্ঞান হয়ে পড়লো। ডাকছে নয়ন, 'কল্লোলী, এই কল্লোলী। একি, দাঁত লেগে গেছে!' শেষমেষ এক মুঠো লাল পানি চোখে-মুখে ছিটালো। সে চোখ খুললো। বললো, 'চলো, এখান থেকে চলে যাই।'

'হ্যাঁ চলো।'

সদ্য-উদিত সবুজ ঘাসের শরীর মাড়িয়ে হাঁটছে। সুন্দর বাতাস। ছায়ামাখা নরম অস্ফুট আলো। কল্লোলীর হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছে, এটা নগরী, না দেশ? নদীর পানি লাল, রক্ত-গুণে ভরা। হঠাৎ চোখে পড়লো সুন্দর একটা বাড়ি। নয়ন বললো, 'দেখো, ওই বাড়িটা।'

'ওখানে নিশ্চয়ই মানুষ আছে।'

'হয়তো।'

আরো একটু কাছে যেতে একজন মানুষ দেখা গেলো। সে হাসতে হাসতে তাদের দিকে আসছে। কাছে এসে বিরাট লম্বা চকচকে সাদা দা উঁচিয়ে বলতে লাগলো, 'আবার এসেছো? নিজেদের অজ্ঞতা তাড়াতে পেরেছো? নাকি আবার দারিদ্র্য ডেকে আনবে? তা হবে না। তা হতে দেবো না।'

'ভাই, আমরা ও রকম কেউ না। আমরা আপনাকে সম্মান জানাতে চাই।' বললো নয়ন। লোকটি তার ক্রোধের দা নত করলো। বললো, 'এসো, তোমরা বুদ্ধিমান।'

একতলা দালান, বাইরে শ্যাওলা পড়া। আগাছা জন্মেছে দেয়ালে দেয়ালে। ভেতরে চমৎকার সাজ-সজ্জা। ঠিক যেন স্বর্গ-লোকের টুকরো। ভেতরে তার স্ত্রীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিল, 'ওর নাম কলমি। আমার স্ত্রী। ছয় মাস হলো বিয়ে করেছি।'

'এই ফলগুলো খেয়ে নিন।' বললো কলমি। খেতে খেতে নয়ন জিজ্ঞাসা করলো, 'এ কেমন রাজ্য আপনাদের? লোকজন নেই। ভূতুড়ে আলো-আঁধারি। আর প্রথমে ওভাবে কথা বলছিলেন কেন?' লোকটি বললো, 'শুনুন তাহলে, এই অল্প আয়তনের রাজ্যের একজন রাজা ছিলেন, কিন্তু জ্ঞানান্ধ। অগুনতি স্ত্রী ছিল তাঁর। সন্তানের হিসেব তিনি নিজেই জানতেন না। এখানে প্রতিটি ঘর ছিল ম্যান-ফ্যাক্টরি। শরীরের আনন্দ উত্তেজনার হিসেব মিলাতে জানতো না কেউ। রাজা ছিলেন সবচে উন্নত, মানব জন্মানোর ডাইস। যার যতো মানুষ তার ততো ক্ষমা। তাই মানুষগুলো চিরদিন থেকে যেতো মূর্খতার সীমানায়। এক সময় রাজ্যময় শুধু মানুষ, খাবার নেই সবার জন্য। মৃত্যুদূত ভাবলো, এভাবে বাঁচার চেয়ে মৃত্যু ভালো। প্রতি মাসের কোনো এক রাতে একটি ঘরে তাই সে দেখা দিত। তারপর সেই ঘরের বংশধর কাউকে খুঁজে পাওয়া যেতো না।'

'তারপর!' জিজ্ঞাসা করলো কল্লোলী।

'এভাবে চলতে থাকলো। সে সময় বাবা আমাকে নিয়ে ঘোর অন্ধকারে হাঁটতে শুরু করেন। তিনি আমাকে খুব ভালোবাসতেন। আমাকে রেখে এলেন এক অচেনা শিক্ষিত শহরে। সেখানে জীবনের মানে বোঝা যায়। বুঝতে হয়। মাথায় হাত রেখে বাবা বললেন, মানুষ হয়ে ফিরে এসো। আমি তোমার মায়ের কাছে যাচ্ছি। মৃত্যুদূত আমাদের মারবেন না। তাই হলো। এই রাজ্যে দুটি কবরের হিসেব আছে। তা আমার বাবা-মায়ের। এই রাজ্যের অগুনতি মানুষের কোনো সমাধি নেই। বাবার কাছে শুনেছি, ওই লাল নদীটার যেখানে জন্ম, সে এক দুর্গম পাহাড়ের ঘেরাটোপ। ওখানেই নাকি মৃত্যুদূত মানুষ জবাই করে ফেলে দিত।'

গা শিউরে উঠছে। তবু নয়ন জিজ্ঞাসা করলো, 'তারপর?'

'আমার বাবা-মার সাথে মৃত্যুদূত আড়াল থেকে কথা বলছিল—জ্ঞানহীন অসাম্য সময়ের শিকড় আর নেই। তোমরা জ্ঞানের চাষ করো, স্বর্গ গড়ো।'

'সন্ধ্যা হয়ে এলো। এখন কথা রাখো।' বললো কলমি।

'হ্যাঁ তাই তো! তোমরা বুদ্ধিমান, এখানে থেকে যাও।'

'আমার খিদে পেয়েছে।' বললো কল্লোলী।

'আমারও।' বললো নয়ন।

'ঠিক আছে, তোমরা খাও। সকালে দেখা হবে।' বলেই কলমিকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলো।

স্বপ্ন-ধাপ ৩

পাতার ফাঁক গলে সূর্য থেকে এক টুকরো আলো টুপ করে খসে পড়লো নয়ন এবং কল্লোলীর চোখ ছুঁয়ে। অমনি চেতনা ফিরে পেলো। সেই ঝোপের পাশে ঢিবির ওপর দুজনে এলোমেলো জড়াজড়ি করে পড়ে আছে। তার পাশে ছোট একটি ছেলে বসে আছে। আনমনে আঙ্গুল দিয়ে ঢিবির মাটি আঁচড়াচ্ছে। নয়ন জিজ্ঞাসা করলো, 'তুমি কে?' সে কয়েকবার তাদের দিকে বিরক্তির চোখে তাকালো। হঠাৎ উঠে দৌড়াতে লাগলো, বৃষ্টির ফোঁটা শরীরে লাগার ভয়ে যেভাবে গোছড় ছিঁড়ে পালায় ছাগল।

'নয়ন, এটা কী হলো?'

'কী জানি।'

'ছেলেটা কতো সুন্দর!'

'হ্যাঁ।'

'কতো নিষ্পাপ তুলতুলে চেহারা। কেমন আত্মভোলা হয়ে মাটি নিয়ে খেলছিল। আহ্! আমরা তো ওকে ভয় দেখাই নি...। ওর বাবা-মা আছে নিশ্চয়ই!'

'কেন? মা-বাবা ছাড়া মানুষ পৃথিবীতে আসে নাকি!'

'আমি তা বলি নি।'

'কী বলেছো?'

'এই গভীর জঙ্গলে এলো কী করে? এখানে আর কেউ আছে বলে তো মনে হয় না।'

'হয়তো আমাদের মতো...'

'সেটা কী রকম! তাছাড়া অতোটুকু বাচ্চা...!'

'আমার কী মনে হয় জানো?'

'কী?'

'ওর চোখের বিরক্তির ভাষা আমি পড়ে ফেলেছি। ওর চোখে লেখা ছিল, যেখানে সময় মূর্খতার চাষ করে। সেই জনাকীর্ণ বাগানে দরিদ্রতার ফুল হয়ে দীর্ঘ জীবন না

নিয়ে অতি অল্প সময় প্রকৃতির অরণ্যে কষ্টের মাঝে বুনো ফুল হওয়া আর ঝরে যাওয়া ভালো।'

'বুঝলাম না।'

'দরকার নেই।'

'আমি কি নির্বুদ্ধি?'

'ঠিক তা বলি নি।'

'তাহলে সহজ করে বলো।'

'বলবো, সময় হলে।'

'কবে আসবে সময়?'

'আসবে, এখন এতোটুক জানো, আমি নীল রঙে ঢাকা শরীরকে ভালোবাসি। কারণ সেখানে নীল ফুলের মোহনীয় সৌন্দর্য দেখতে পাই।'

নয়ন এভাবে কথার প্রসঙ্গ পালটালো এবং হাঁটতে থাকলো যে পথে ছেলেটি দৌড়ে পালিয়েছে। কিছুটা স্পষ্ট হলো, বনহীন ফাঁকা প্রান্তর। উজ্জ্বল রোদের খুনসুটি সারা মাঠময়।

'নয়ন, ওই রোদেলা মাঠ পাড়ি দিতে ভালো লাগবে। বহুদিন পর, তাই না?'

নয়ন চুপ করে শুধু হাঁটছে, কোনো উত্তর দিচ্ছে না।

'কী হলো, কথা বলছো না কেন?'

'উম্।' অন্যমনস্ক শব্দ করলো, ততোক্ষণে মাঠের মাঝখানে এসে পড়েছে।

'নয়ন, এখন কোন দিকে যাবো? চারদিক অস্পষ্ট, শুধুই ফাঁকা প্রান্তর।'

'দুপুরের অবস্থান কিছুটা পেছনে পড়েছে। এখন বিশ্রামের সময়।'

'হ্যাঁ। কিন্তু বিশ্রামের জায়গা কোথায়?'

হাঁটা থেমে নেই। আরো কিছুটা নিচে নেমে এসেছে সূর্যটা। হঠাৎ একটা জলা দৃশ্যত হলো।

'নয়ন, আমি তৃষ্ণার্ত।'

'এই জলার পানি খাবে?'

'হ্যাঁ।'

'আরো কিছুটা সামনে যদি ভালো পানি পেয়ে যাই?'

'না, আমি খুবই তৃষ্ণার্ত।'

'ঠিক আছে, আমি এখানে অপেক্ষা করছি।'

জলার পানি খানিকটা দূরে। তার আগে স্যাঁতসেঁতে কাদা, পা গেড়ে যাওয়ার মতো। কল্লোলী কাদা চিরে পানি পর্যন্ত পৌঁছালো। একি! পানির রং নীল এবং ময়লাযুক্ত, দু হাতে পানি ছুঁতেই বুদবুদ উঠতে লাগলো এবং তা ভীষণ রকম, যেন পানিতে কেউ জ্বাল দিচ্ছে। পানি না খেয়ে ফিরে এলো এবং নয়নকে খুলে বললো। দুজনেই জলার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জলা থেকে ধুঁয়া উড়ছে। কুয়াশার মতো চারপাশে ছড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ পর পরিষ্কার হয়ে গেলো। 'চলো না, আর একবার চেষ্টা করে দেখি।' বললো কল্লোলী।

'ঠিক আছে।'

'নয়ন, এই সেই নীল পানি। এতো সুন্দর হলো কী করে!' দু হাত ভরে পানি খেলো সে।

'দেখো, ওই যে জলার মাঝখানে ওটা তালের ডোঙ্গা না?'

'তাই তো মনে হয়।'

'আমাদের গ্রামে বর্ষায় যখন খালে-বিলে পানি থৈ-থৈ তখন তালগাছ দিয়ে লোকে ডোঙ্গা বানায়। তাতে ভেসে ভেসে মানুষ এ বাড়ি ও বাড়ি যাওয়া আসা করে।'

'হ্যাঁ, ওটা তো এদিকেই আসছে।'

কিছুটা কাছে আসতে ডোঙ্গা থেকে একটা হাসির শব্দ ভেসে এলো। দেখা গেলো সেই ছেলেটি। কিছুক্ষণ আগে যে ভয়ার্ত হরিণের মতো দৌড়ে পালালো, হঠাৎ আবার কাঁদতে শুরু করলো। কান্নার সুরে দুটি হৃদয় দুলে উঠলো। মায়াভরা কণ্ঠে কল্লোলী ডাকলো, 'তুমি নেমে এসো।'

'না, আমি আমু না।'

'কেন আসবে না?'

'তোমরা ভালো।'

'ভালো বলেই তো তোমাকে আসতে বলছি। আমাদের সাথে চলো, আমাদের সাথে থাকবে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, না যেতে চাইলে থাকো, কিন্তু তুমি এখানে কেন?' বললো নয়ন।

'আমার বড় অনেকটি ভাই আছিল। তারা মা-আব্বারে কষ্ট দেতো। তারাও খুব কষ্টে আছিল। তাই মা আর আব্বা এই পানিতে ইচ্ছা করি ডুইব্বা মরছে। আমি ছোট, তাই উনাগের কাছে কাছে থাহি।' বলেই সে উধাও। খালি ডোঙ্গাটি ভাসছে জলার জলে।

বেলার আগুন নিভে এসেছে। লাল আকাশ। ফ্রিজখোলা ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। খোলা মাঠ পেরোনোর ইচ্ছেয় হাঁটতে হাঁটতে কল্লোলী বললো, 'এই তো সময় শূন্যতাকে পাড়ি দেয়ার।'

'ভুল বললে।'

'হ্যাঁ, আমি পুরোটাই ভুল।'

'রাগ করছো কেন? শোনো, সময়ের মধ্যেই ক্ষুধার যন্ত্রণা নিহিত। তাই শূন্যতার ক্ষুধা মেটাতে সক্ষম না হলে তাকে পাড়ি দেয়ার চেষ্টা নিরর্থক এবং নির্বোধের। তারচে ভালো নীল রঙের কাপড়ে মোড়া উজ্জ্বল শরীর ভালোবাসা, ভালোবাসা নীলরং সব কিছু। যেমন তুমি। তোমাকে এতো সুন্দর লাগতো না, যদি না থাকতো ওই নীল কামিজের আবরণ।' বলতে বলতে নয়ন তার হাতের পাতায় একটা চুমো খেলো। কল্লোলীর মনটা মুহূর্তে ফুরফুরে হয়ে উঠলো এবং বললো, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'জানি না, তবে যাচ্ছি।'

'আমার সব ভয় মুছে গেছে।'

'হ্যাঁ, তবে অভয়ের কারণ কী?'

'কারণ, আমরা দুজন তো দুজনার জন্য। গ্রামে ফিরে বিয়ে করবো। সংসার, সন্তান হবে আমাদের। কী বলো?'

'হ্যাঁ, না।'

'তার মানে?'

'তুমি ওই ছেলেটির কান্না শোনো নি?'

'হ্যাঁ।'

'অর্থ বুঝেছো?'

'না, মানে কী?'

'ছেলেটি তার মা-বাবাকে নরক পেরুতে দিচ্ছে না। তাছাড়া তুমি আমাকে বিয়ে করবে বলছো!'

'বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'তুমি পেছনের কথা ভুলে গেছো?'

'সে কথা তো প্রথমেই বলেছি।'

'মিছে তর্ক করে সুখ হারানোর দরকার নেই। তারচে কি এটা ভালো না?'

'কোনটা?'

'এই এক সাথে চলছি। ভালোবাসছি। প্রজাপতির মতো ডালে ডালে বসছি। কী প্রয়োজন অসচ্ছলতাকে বোঝা বানাবো?' বলতে বলতে নয়ন তার ঠোঁট দুটোকে কাছে টেনে একটা ছোট চুমো খেলো। কল্লোলী নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বললো, 'তুমি খুব ভালো। নিয়ে চলো আমাকে যতো দূরে পারো!' আবেগের জড়তা ছেড়ে সামনে তাকালো। এক অচেনা সাগর-পাড়ে এসে পড়েছে। আঁধার নামছে ধীরে, পরিষ্কার নীলাকাশ। আকাশ নীল সাগরের জলে সুন্দর সুশোভিত নীলাভা ছড়ালো।

সাগরের মৃদু তরঙ্গ তটিনী-সঙ্গমে মত্ত। মিহি বাতাস আছড়ে পড়ছে তাদের শরীরে। দেখতে দেখতে আকাশের শরীরে ফুটে উঠলো অগণন তারার তিলক। চাঁদের শরীর থেকে ঝরছে যেন রুপোর গুঁড়ো। জলের বুকে চাঁদের নাচন। অপূর্ব সে আয়োজন। আজ রাতটা অতি সুন্দর।

'চলো, বালুর বিছানায় বসি।' বললো নয়ন।

'ঠিক আছে, চলো।'

'কল্লোলী।'

'হু...।'

'রাতকে এতো সুন্দর লাগে কেন বলতে পারো? আবার কখনো বিষাদের কালো নির্যাস?'

'মাইন্ড বিল্ডের ব্যাপার। মন যখন ভাবনাহীন সুন্দর কল্পনা আঁকে তখন অমাবস্যার রাত্রিও হয়ে ওঠে প্রিয় অনুভবের। আর যখন তাতে ব্যথার স্মৃতি আল্পনা আঁকে তখন পূর্ণিমার রাত্রি হয়ে ওঠে অবগুণ্ঠিত বুকের অবরুদ্ধ জমিন।'

'সুন্দর বলেছো।'

'ধন্যবাদ।'

'এত রূপসী রাতে তোমার ভয় হয় না? মানে, ভয় হচ্ছে না?'

'সে তো পেছনের কথা, এখন যা আছে তার সবটুকু নির্ভীক সত্য। তুমি আমাকে ছুঁয়ে দেখো।' বলেই নয়নের হাত টেনে নিজের বুকে চেপে ধরলো। 'কী, ভয়ের ঢাক কেউ কি পেটাচ্ছে? যেটুকু নড়ছে তা শুধু প্রেমের নির্ভীক সুখতরঙ্গ।' বলতে বলতে নয়নের ঠোঁট দুটো ছুঁয়ে দিল আপন ঠোঁটে।

পেছন থেকে কে যেন ডেকে উঠলো, 'নয়ন ভাই!' এই নির্জন উপকূলে নিস্তব্ধ রাত। কোথাও কেউ থাকার কথা না। নয়ন বুঝতে পারলো এ তার অভিশপ্ত অদৃষ্টের কণ্ঠস্বর। রক্তে বিচ্ছিন্নতার উল্লসিত ক্রন্দন বেজে উঠলো।

'চলো, সাগরের জল ছুঁয়ে তৃষ্ণা মেটাই।' বললো কল্লোলী।

'হ্যাঁ চলো।'

দুজনে পানির কাছে গিয়ে হাত ডুবালো। নয়ন এক মুঠো জল তুলে কল্লোলীর হাতের ওপর ফোঁটা ফোঁটা করে ছাড়লো। সেও নয়নের হাতের ওপর একই ভাবে জলের ফোঁটা ফেললো।

মধ্যরাত। সাগরের বুকে জল-সঙ্গম শুরু হলো। প্রকাণ্ড ঢেউ ফণা তুলে আসছে। প্রচণ্ড শক্তিতে আক্রমণ করলো। দুজনকেই ভিজিয়ে দিল উন্মত্ত ঢেউ। এক আশ্চর্য রকম অনুভূতি জাগলো। তারা যেন সুদূরের পথে 'ডানাখোলা' বিহঙ্গ।

স্বপ্ন-ধাপ ৪

অতি উচ্চ পাহাড়ের মাথায় টং পাতা। তার ওপর ছনের ছাউনিতে গাছের ডালপাতা দিয়ে বেড়া করা ছোট টংঘর। তার ভেতর নয়ন ও কল্লোলী ঘুম ছেড়েছে মাত্র।

'একি! আমরা কোথায় কল্লোলী?'

'বুঝতে পারছো না?'

'পারছি। কিন্তু...!'

'কী?'

'না, মানে তোমার শরীরে...'

'আমার...!' নিজের শরীরের দিকে চেয়ে লজ্জায় চমকে উঠলো কল্লোলী। তার শরীরে শুধু নীল রঙের ব্রা আর প্যান্টি ছাড়া কোনো কাপড় নেই।

'নয়ন, তোমারও তো...।' নয়ন নিজের শরীরে ছোট কাপড় দেখে লজ্জাবোধ করলো।

চারপাশ ধ্বনিহীন। টংঘরের বেড়ার ফাঁক বেয়ে ডগডগ করে ওঠা সূর্যের আলোরা চিকচিক করে নাচছে। শরীরে লেপ্টে থাকা নীলাবরণটুকু আরো উজ্জ্বল হয়ে দৃশ্যত হচ্ছে। তারা বাইরে বেরুতে সাহস পাচ্ছে না। লজ্জা তাড়াতে নয়ন বললো, 'এদিকে

তাকাও, আমার চোখের দিকে।' কল্লোলী তাকালো। 'এই তো হয়ে গেছে, আর বাকি নেই।' নয়ন বললো।

'কী হয়ে গেছে?' কল্লোলী লাজনত মুখে শব্দ করলো।

'হাত রাখো আমার হাতে। চলো বাইরে যাই।' মইয়ের মতো সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলো। পাহাড়ের শরীর কেটে কিছুটা জায়গা সমতল বানানো। তার এক পাশে বনসাইয়ের চেয়ে উঁচু, দেখতে বনসাইয়ের মতো। তার ছায়ায় পাশাপাশি দুটো আরামকেদারা পাতা রয়েছে।

'চলো, ওখানে বসি।' বললো নয়ন।

'হ্যাঁ।'

'দেখো ওই দূরে, যতোদূর চোখ যায়। সব যেন আবছা জমাট অন্ধকার।'

'ওগুলো কী?'

'আমরা অনেক উঁচুতে বসে আছি বলে ও রকম মনে হয়। আসলে ওগুলো গ্রাম, শহর, নদী-নালা, ঝোপ-ঝাড়, বনাঞ্চল। ছোট পোকার মতো নড়ছে ওগুলো মানুষ।'

'নয়ন, দেখো একটা ঝরনা। কেমন টলটলে উজ্জ্বল ডায়মন্ড কণার মতো লাফাতে লাফাতে গড়িয়ে পড়ছে।'

'সব এই রোদের কারসাজি। দেখো এক দলা মেঘ ছুটে আসছে।'

দেখতে দেখতে মেঘ-দলা ছুঁয়ে গেলো পাহাড়ের শির। ভিজিয়ে গেলো দুটি উজ্জ্বল শরীরের নীল কামনা।

ভরদুপুর। পাহাড়ের শরীর তেতে উঠেছে। মৃদু বাতাসে কল্লোলীর চুল উড়ে উড়ে নয়নের গা ছুঁয়ে যাচ্ছে বারবার।

'নয়ন।'

'হুঁ।'

'ওই ঝরনার কাছে যাবে?'

'কিভাবে?'

'হেঁটে হেঁটে।'

'বৃথা হবে চেষ্টা।'

'তবু...।'

পাহাড়ের গা-জড়ানো আঁকা-বাঁকা লতানো পথ। হেঁটে অনেকগুলো বাঁক পার হলো। তবু মনে হয় এই তো এসে পড়েছি। হঠাৎ পাশেই ঝোপের আড়াল থেকে টুপটাপ পানি পতনের শব্দ শোনা গেলো। কাছে যেতেই দেখা গেলো মূল ঝরনার একটা উপধারা বয়ে চলেছে। একটা বড় পাথরে বাধা পেয়ে উপচে খানিকটা দূরে গিয়ে পড়ছে।

'কল্লোলী, এখানেই ভিজি?'

'তাই ভালো।'

'তুমি যাও, আমি অপেক্ষা করি। তুমি এলে আমি।'

'নো।'

'তাহলে এক সাথে?'

'হ্যাঁ।'

'ওই জলপতনে জীবন পতনের শব্দ।'

'তুমি আমার চোখে চেয়ে দেখো, সেখানেও তাই। জল আর জীবন একই পাত্রে খেলা করছে।'

'ঠিক আছে, চলো।'

পাহাড়ি পথ মনে রাখা বেশ মুশকিল। তাই যে পথে যাওয়া, ফেরা হলো অন্য পথে। অনেক ঘুরে-ফিরে অবশেষে যথাস্থানে। সূর্যটা বিকেলের পিঁড়িতে বসেছে। এখানে বিকেলের আবহটা নয়নাভিরাম। সদ্য প্রস্ফুটিত যৌবনভারে দোলা কোনো উর্বশীর তুলতুলে উজ্জ্বল গালের মতো নরম নীলাভ আলো। আকাশের শরীর থেকে খুলে পড়ছে নীল ঝালর। হৃদয়ছোঁয়া বাতাস। কোনো দস্যি যুবতীর দুরন্তপনার ফাঁক গলে বাতাসে উড়ে যাওয়া সাদা ওড়নার মতো ভেসে যায় থেকে থেকে রেশমি ধবল মেঘ। এমন মোহময় আবহে বসে থাকা ভালো লাগছে না। নয়ন বললো, 'চলো, হাঁটি।'

'কোথায় ?'

'পাহাড়ের প্রশস্ত কাঁধ, শেষ প্রান্ত ছুঁয়ে আসি।'

'চলো। নয়ন, আমরা কি বীজকে বীজতলাতেই ধ্বংস করছি?'

'হ্যাঁ।'

'কেন? একটা বৃক্ষের পূর্ণতা কি তুমি বোঝো না?

'বুঝি। কিন্তু এমন বৃক্ষও আছে যার ওসব হয় না। পাতা, ডালপালা, মূল, কাণ্ডই তার সীমানা।'

'আমরা তো তা নই। আমরা তো ইচ্ছে করেই অঙ্কুর-মুখে বিষ চাষ করছি।'

'সেই ভালো, তা না হলে পুরো দেশ নয় শুধু, পুরো পৃথিবী ঠাসা বনাঞ্চল হয়ে যাবে, যেখানে স্যাঁতসেঁতে ভয়াল অন্ধকার ছাড়া আলোর ছিটেফোঁটা কম দেখা যায়। আর সেটা যদি হয় অসাম্যের দেশ।'

'নয়ন, ওটা কী?'

'ওটা মানুষের মাথার খুলি।' খুঁটে খুঁটে দেখলো।

'এখানেও মানুষের কঙ্কাল?'

'এখন বুঝলে তো?'

'কী?'

'আমরাই অজাত-মৃত্যুর দৃষ্টিতে ভাসছি। আমাদের অধিকার নেই সে পাপ কাজটি করার, যাতে কোনো নতুন প্রাণ বিপদে পড়ে। ফুর্তি করো, নীল রঙের চশমা পরো। জীবনের ঝরনা বইতে থাক না উচ্ছল উত্তাল ছন্দে।'

কথা বলতে বলতে অনেকটা পথ ছেড়ে গেছে পেছনে। সন্ধ্যা নেমেছে। টংঘরের উদ্দেশে ফিরছে। চোখে পড়লো আকাশছোঁয়া ধুঁয়ার কুণ্ডলি, যেখানে মানুষের মাথার খুলিটা পড়েছিল তার পাশে। কিছুক্ষণের মধ্যে ধুঁয়া মিলিয়ে গেলো বাতাসে। স্পষ্ট হয়ে

উঠলো একটা বিরাট দেহ। শরীর এবং চেহারা দেখতে মানুষের মতো, তবে বিকৃত। বিরাট দেহে কোনো হাত নেই। দেহের ওপরিভাগে বড় বড় দুটি মাথা। কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত লতা-পাতা জড়ানো। বিশ্রী শব্দে হাসছে। ভয়ে দুজনের দম বন্ধ হয়ে আসছে। প্রায় ঘণ্টা খানেক পর সে-হাসি থামলো। এবার বিকট কণ্ঠে বললো, 'চলো বন্ধুরা, ঘুরে আসি, এখান থেকে দশটা পাহাড় পার হয়ে এক নীল শহরে, যেখানে উৎসব চলে বার মাস, জীবনের উৎসব।'

'না, আমরা যাবো না।' বললো কল্লোলী।

'কেন যাবে না, ওখানে না গেলে যে তোমাদের দেখা অপূর্ণ রয়ে যাবে। আমার দায়িত্ব পূর্ণ হবে না।'

'কিন্তু তুমি কে? কেনই বা আমাদের এসব কথা বলছো?' জিজ্ঞাসা করলো নয়ন।

'আমি? আমার কথা জানতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'আমি জন্ম নিয়েছিলাম মানবসন্তান রূপে এক অভিশপ্ত পরিবারে, অসাম্যের দেশে। অশিক্ষার অন্ধ অভিশাপ সেখানে। আমার বাবা-মার এগারটি সন্তান। আমি ছিলাম সবার ছোট। বড় ভাইবোনেরা বেড়ে উঠলো শিক্ষাহীনতায়। তারা যে যার মতো সংসার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। বাবা-মা দারুণ অভাব-অনটনে পড়লেন। কেউ তাঁদের সাহায্য করতে এলো না। ঠিক সে সময়ে আমার জন্ম। অনাহার, অর্ধাহারে মায়ের দিনরাত কাটে। বাবা অসুস্থতায় পড়েন। দুদিন মায়ের না-খাওয়া পেট। বুকে দুধ নেই। আমারও চেঁচাতে চেঁচাতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। মা আর সহ্য করতে পারলেন না। চুপি চুপি আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন বাড়ির পাশের ছোট খালপাড়ে। তখন গভীর রাত। আমাকে এক পাশে মাটিতে শুইয়ে রেখে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন। তারপর কোমর থেকে একটা শিশি বের করলেন। আমার দিকে তাকালেন কয়েকবার। মায়ের চোখ থেকে বৃষ্টির মতো এক ঝাঁক পানি পড়লো আমার শরীরে। তারপর চোখ মুছলেন আর শিশিটা উপুড় করে নিজের মুখে কী যেন ঢাললেন এবং সাথে সাথে আমাকে তুলে একবার বুকে চেপে ধরলেন। তারপর দ্রুত আমাকে খালের পানিতে ছেড়ে দিলেন।' বলতে বলতে দৈত্যের চোখে ঝরনা নামলো।

'কিন্তু তুমি তো দৈত্য।' বললো নয়ন।

'হ্যাঁ। আমার মৃত্যুর পর এই পাহাড়ের এক দৈত্য আমার আত্মাকে ধরে এনে তার মৃত সন্তানের দেহে ভরে দেয়। আমার আচরণ কিছুটা ভিন্ন বলে আমাকে এখানে ফেলে সবাই চলে গেছে। এখন আমার কাজ শুধু এখানে কোনো মানুষ এলে তাকে নীল শহর দেখাতে নিয়ে যাওয়া। তোমরা ভয় পেও না আমাকে।'

কথা শুনতে শুনতে রাত বেড়ে চললো। কী আশ্চর্য! এখানকার রাতের আকাশে চাঁদ যেন ফুটেই থাকে বার মাস।

দৈত্য আবার বলে উঠলো, 'দেখো দেখো, ওই যে চাঁদ। বিশাল আকাশটা যেন নীল কামিজ আর তা জড়িয়ে আছে চাঁদের শরীরে। তার বুকে কলঙ্ক ফুটে আছে। তবু তার হাসি ফুরায় না।'

দৈত্যের কথা শুনে নয়ন প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, আনন্দে মুখ থেকে উচ্চস্বরে বের হলো, 'দারুণ! দারুণ! বন্ধু আমাদের নিয়ে চলো নীল শহরে।'

দৈত্য বললো, 'বন্ধুরা পেছনে তাকাও।' পেছনে তাকাতেই নিজেদেরকে আবিষ্কার করলো সুন্দর এক ফুলের বাগানে। বাগানের পাশে ছোট একটা একতলা দালান। আকাশের মতো নীল রঙে সেজে আছে। সূর্যের আলোও এখানে নীল নিয়ন্ত্রিত কোমল স্বভাবের।

'এটাই হলো নীল শহরের শুরু। তোমরা ঘুরে ঘুরে দেখো। যেখানে সমস্যা আমাকে ডেকো।' বলেই দৈত্য উধাও হলো।

দিনের মধ্য বেলা, তবু সূর্যের রশ্মিগুলোয় আরামিত শীতল অনুভব। রাস্তার পিচে কালো উজ্জ্বল দ্যুতি। দু ধারে খানিকটা প্রশস্ত জায়গা জুড়ে রংচঙা ফুলেরা ধীর বাতাসে মাথা দোলায়, সংবর্ধনা দেয় অবিরত। বনজ বৃক্ষেরা সারি করে দাঁড়িয়ে আছে সংবর্ধিত অতিথিদের সম্মানে। মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে সুদৃশ্য স্বর্গ-প্রাসাদ। মাঝে মাঝে দু একটা গাড়ি শোঁ করে চলে যাচ্ছে। কেউ কেউ এ প্রাসাদ থেকে ও প্রাসাদে যাওয়া-আসা করছে হেঁটেই। অতি সুন্দর, সুখী মানুষের মতো। কারো শরীরে ওই...ওইটুকু ছাড়া কোথাও আবরণ নেই, পুরুষ অথবা নারীর। হাঁটতে হাঁটতে একটা অনুচ্চ প্রাচীরঘেরা বেশ প্রশস্ত সুশ্রী বাগানবাড়ির কাছে এলো। প্রথমে বাগানবাড়ি মনে হচ্ছিল। কিন্তু কল্লোলী বলে উঠলো, 'এটা সুখবাগান-১। ওই দেখো সাইনবোর্ড।' নয়ন বললো, 'চলো, ভেতরে গিয়ে বসি।'

দিনের আলোটা ছাইমাখা-ঘোলাটে হয়ে গেছে তখন। সুদৃশ্য বাহারি লতায় ঘিরে আছে ছোট ছোট প্রায় অস্বচ্ছ থাই গ্লাসের বেড়াঅলা এসি ঘর। নয়ন এবং কল্লোলী একটা বেঞ্চিতে বসলো।

বুথ-১, ২, এভাবে পাঁচটি ঘর এ বাগানে। তিনটি ঘরের দরজায় লিখা রয়েছে 'এখন প্রবেশ করুন'। বাকি দুটোর দরজায় লিখা 'দয়া করে অপেক্ষা করুন'। কিছুক্ষণ পর এক জোড়া ছেলে-মেয়ে প্রবেশ করলো 'সুখবাগানে'। তারা একটা বেঞ্চে বসে একজন অন্যজনের চোখের মধ্যে এমনভাবে চেয়ে থাকলো যেন একে অন্যের ভেতরে বিচরণ করছে। ধীরে ধীরে চারটি ঠোঁট মিলে গেলো। তারপর উঠে দাঁড়ালো এবং দুজনে দুটি নীল ফুল ছিঁড়ে নিল। ফুল দুটি ছিল ভিন্ন প্রজাতির। আরেকটা দরজার লিখা পালটে গেলো। কল্লোলী উৎসুক কণ্ঠে বললো, 'নয়ন।'

'হুঁ।'

'আমরা একটা ঘরে গিয়ে বসি?'

'কিন্তু...'

'কী?'

'তারচে এখানে অপেক্ষা করি। ওই ছেলে-মেয়ে দুটো যখন আউট আমরা তখন ইন।'

'ঠিক আছে'।

'দেখো, ওই ফুলের ঝোপে দুটি প্রজাপতি। কতো সুন্দর রং ওদের, তাই না?'

'হ্যাঁ, ওরা তো মধু খুঁজছে।'

'নিশ্চয়ই ওদের খিদে পেয়েছে।'

'ওরা তো দল বেঁধে আসতে পারতো, তাহলে আরো সুন্দর হয়ে উঠতো দৃশ্যটা।'

'হ্যাঁ, তাতে সময় কমে যেতো বিশ্রামের। ভেতরে ব্যস্ততা যুক্তিহীন তাড়া করতো।'

কথা বলতে বলতে অপেক্ষা হেঁটে গেলো। ছেলে-মেয়ে দুটোর বুথ নং-৪। দরজার লিখা পালটে গেছে। তারা বের হয়ে সুখের হাসি ছড়াতে ছড়াতে মিলিয়ে গেলো দূরে। নয়ন এবং কল্লোলী বুথ-৪-এ ঢুকে পড়লো। চারপাশ ভালো করে দেখতে লাগলো। পরিপাটি করে সাজানো-গোছানো সব। কাঁচের দেয়ালে দেয়ালে ঝুলছে যৌবনফোটা দক্ষ হাতের স্কেচিং। এক পাশে ডাবল সোফা। নরম তুলতুলে বক্সখাট। খোলা শো-কেইসে থরে থরে সুগন্ধিযুক্ত নকশি করা বেডশিট।

'নয়ন, ওই আলমারিটা।'

'কোনটা?'

'যেটার গায়ে ফুটে রয়েছে বার্থ-কন্ট্রোল মেটেরিয়ালের বিজ্ঞাপনচিত্র।'

'হ্যাঁ। ওটা খুলে দেখি?'

খুলতেই নয়নের চোখের ভেতর দিয়ে মনে প্রশান্তি আর আশার তৃপ্তি প্রবেশ করলো। থরে থরে পড়ে রয়েছে বিভিন্ন কোম্পানির ভিন্ন ভিন্ন ট্রেডমার্ক সংবলিত কনডম এবং পিল।

'নয়ন, চলো ওই সোফায় বসি।'

'চলো।'

সোফার নিচে পড়ে রয়েছে ব্যবহৃত কনডম ও তার খোসা এবং পিলের প্যাকেট।

'কল্লোলী, একটু...ওরা বোধ হয় ভুলে এগুলো নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে যায় নি। কী ভুলো মন!'

'নয়ন, তুমি আমাকে...'

'চলো, বাইরে যাই।'

'প্লিজ নয়ন...তুমি আমার নাভি ছুঁয়ে দেখো তিরতির করছে। আমার যোনি-লুকানো নীলাবরণ ছুঁয়ে দেখো স্বচ্ছ জলধারায় ভিজে উঠেছে। স্তন ছুঁয়ে দেখো তোমার দৃষ্টি চাইছে।'

কী প্রশান্তি! নয়ন সাড়া দিল প্রকৃতির টানে। বের হয়ে দেখে এ যেন আরেকটা নতুন দিন।

নীল রঙের আলোয় ভরে গেছে সারা শহর। দৈত্যটা এসে দাঁড়িয়ে আছে। বললো, 'চলো বন্ধুরা জীবনের আড্ডায়।' দৈত্যের পিছে হাঁটছে তারা। কিছুটা পথ পার হলো।

'ওই যে দেখছো লম্বা ভবনটা, ওটা হলো আড্ডাখানা। ওখানে সন্ধ্যার পর জমে ওঠে নারী-পুরুষের উন্মুক্ত আড্ডা। যারা ওখানে আসে তারা সবাই শান্তিপ্রিয়, শিক্ষিত আড্ডাবাজ। অবশ্য এই শহরের সবাই শিক্ষিত, সচেতন, বিনয়ী। এটাও বলা যায় ছেলেদের চেয়ে কিছুটা হলেও মেয়েরা বেশি সচেতন এবং উন্মুক্ত ধারার। জনসংখ্যা

প্রায় সমতায় থাকে। আর তাই অর্থকষ্ট এবং শিক্ষা-বিমুখতা কারো ভেতরে গড়ে ওঠে না। এবার তোমরা ভেতরে প্রবেশ করো।' বলেই দৈত্য উধাও হলো।

ভেতরে ঢুকে নয়নের মনে প্রশ্ন এলো, 'আমরা কেন অন্যরকম?' প্রশ্নটা বারবার মাথায় খাবলি খাচ্ছে।

'কল্লোলী, চলো ফিরে যাই।'

'সুখবাগানে? একটু সবার সাথে উল্লাস করে না হয়...'

কল্লোলীকে হাত ধরে বাইরে নিয়ে এলো।

'নয়ন।' একটু বিতৃষ্ণার সুরে ডাকলো কল্লোলী।

'স্যরি, কল্লোলী। তুমি এখানেই থেকে যাও।'

'তুমি?'

'আমার অনেক কাজ। ফিরে যেতে হবে ঢাকায়। তুমি প্রতিদিন নীলছাইরঙ্গা ঘোলাটে বিকেলী আলোয় সুখবাগানে যেও। আমি ওখানেই আসবো নীলরং ভালোবাসা পেতে।' বলেই কল্লোলীকে একটা চুমো দিল। কল্লোলী ফিরে গেলো আড্ডাখানায়। নয়ন বাইরে দাঁড়িয়ে নীল অন্তর্বাস এঁটে থাকা উজ্জ্বল শরীর আর টলমলে যৌবনে ঢেউ তুলে কল্লোলীর হেঁটে যাওয়া দেখছে।

স্বপ্ন-ধাপ ৫

নয়ন ঢাকা শহরের পথে পথে হাঁটছে। ঘিঞ্জি মানুষের শরীরের উত্তাপিত অদৃশ্য ধুঁয়া আর ব্যস্ত ঘিঞ্জি যানবাহনের সদৃশ্য ধুঁয়া মিলে দম বন্ধ হয়ে আসার মতো এক ভিন্ন আবহাওয়া এখানে বয়ে চলেছে অবিরত। তার ক্লান্তি ধরে গেছে। সামনে কমলাপুর রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম। ওখানে ছাদের নিচে বসে একটু বিশ্রাম করা যাবে, ভাবলো সে।

বসে আছে একটা পিলারে হেলান দিয়ে। চোখের সামনে রেলের পাতগুলো স্থির, মাটি আঁকড়ে চিতিয়ে শুয়ে আছে; এক অচেনা যুবতীর উলঙ্গ লাশের মতো। কতো লম্বা তার শরীর; যতোদূর চোখ যায় তারচে দূরে কল্পদৃষ্টির পথ ধরে। একটা রেলের হর্ন শোনা গেলো। ও এখনই লোহার পাতগুলোর বুকের ওপর দিয়ে দ্রুত চলে যাবে গন্তব্যের শহরে-নগরে। ভাবতে ভাবতে ট্রেনের ভারী ভারী বগিগুলো কেমন নির্দয়ভাবে চাপা দিয়ে চলে গেলো পাতগুলোর বুকের ওপর দিয়ে। তবু অবিকৃত, চুপচাপ মাটির সাথেই শুয়ে থাকলো পাতগুলো, নয়নের বুকের ওপর দিয়েও যেন রেলের বগি যাওয়া-আসা করছে। পাশেই একটা ছেঁড়াখোড়া, বড় ধরনের কাপড়ের পোটলা। তার পাশে একটা যুবতী মেয়ে বসে আছে, সামনে তিনটা মানুষের বাচ্চা। একটা বেশ ছোটাছুটি করছে আর দুটো অজস্র মানুষের পায়ের ধুলো জড়ানো প্ল্যাটফর্মের ফ্লোরে মৃতের মতো ঘুমোচ্ছে। ছেঁড়া এক টুকরো কাপড়ও নেই তাদের শরীরের নিচে। শুধু মাথার নিচে দলা করা ময়লা জড়ানো কাপড়। তবু তারা ভাবনাহীন নিষ্পাপ ঘুমে বিভোর। তিনটি বাচ্চাই দুধমুখো। অনেকক্ষণ ধরে নয়ন লক্ষ করছে। কিন্তু কোনো

দুগ্ধবতী মায়ের ছায়া পর্যন্ত আশেপাশে আছে বলে মনে হলো না। যে মেয়েটি বসে বসে ওদের দেখছে তার শরীরেও মায়ের চিহ্ন ম্লান। বয়স যা মনে হলো যৌবন জৌলুসে দিক মাতানোর সময়। কিন্তু বসে আছে এমন ভাবে যেন পাথরের ভাস্কর্য। শরীর আব্রুর কাপড়ে একাধিক ছেঁড়া জানালা পাখনা মেলে হাসছে বাতাসের ছোঁয়ায়। অসংখ্য রসদ-চোখ সে জানালায় উঁকি দিয়ে যায়।

প্রায় বস্ত্রহীন, ছেঁড়া-ফাটা লুঙ্গি কোমরে জড়ানো মাঝ বয়সের এক যুবক মেয়েটির সামনে দিয়ে বারবার ঘোরা-ফিরা করছে আর উচ্চারণ করছে, 'চল্, খাবিন্যা?' মেয়েটি চোখে বিরক্তি নিয়ে তার দিকে বারবার তাকাচ্ছিল।

নয়ন ছেলেটিকে ইশারা করলো কাছে আসার জন্য। সে অতি ধীর পায়ে এগুলো।

'এখানে বসো।'

'না স্যার, বমু না। কী কইবেন কন।'

'তোমার সাথে একটু কথা বলতে চাই। আচ্ছা, তুমি খাবার খেয়েছো?'

'না, খাওয়া অয় নাইক্যা।'

'এই নাও বিশটা টাকা। কিছু খেয়ে আসো তারপর কথা বলবো।'

'না স্যার, লাগবো না।' মুখে না করলেও ওর মন আর হাত অধীর প্রস্তুত বিশ টাকার নোটটা ধরার জন্য।

'লজ্জা কিসের, যাও খেয়ে এসো।'

'ঠিক আছে।'

বিশটা টাকা পেয়ে শুকিয়ে দুর্বল হয়ে পড়া পায়ে শক্তি বেড়ে গেলো।

'এসেছো? বসো।'

'কন স্যার কী কইবেন।'

'তোমার নাম কী?'

'মিজি।'

'আচ্ছা মিজি, ওই যে মেয়েটি তিনটা বাচ্চা নিয়ে বসে আছে, ওই বাচ্চাগুলো কার, তুমি জানো?'

'হ স্যার, জানি। আমি এইহানে মেলাদিন ধইরা আছি। ওই মাইয়াডার মা মইর‍্যা গ্যাছে গা।'

'ওর বাপ নাই?'

'মনে অয় নাই। আমি কুনোদিন দেহি নাই। অয়তো মইরা-টইর‍্যা গ্যাছে গা।'

'বাচ্চাগুলা কার?'

'ওই যে যেইডা আইটা বেড়াইতাছে, হেইডা হের বোইন। আর যে দুইডা গুমাইতাছে হে দুইডা হের বাচ্চা। জোমক।'

'ওর বিয়ে হইছে?'

'না স্যার, বিয়া অয় নাইক্যা। তয় এক পোলারে অর লগে থাকতি দেখতাম। অহন মেলাদিন অইলো দেহি না। আমরা গরীব মানুষ, বিক্যা কইর‍্যা খাই। তয় অহন মাইনষে বিক্যাও দিবার চায় না। মাজে মাজে মিথ্যা কইয়া বিক্যা করি।'

'কিভাবে?'

'ওই বাচ্চাগুলানরে হের কাছেত্যা লইয়া যাই। রাস্তার দারে শুয়াইয়্যা একখান কাপুড় দিয়া ডাইক্যা দেই। তারপর মইর‍্যা গ্যাছে গা, নয় অসুক ওইছে কইয়া বিক্যা চাই, যা পাই দুই বাগ কইর‍্যা এক বাগ অরে দিতি অয়। আবার কুনোদিন বেডিরা নিয়া যায়। সারাদিন ছিগনালে ছিগনালে গুইরা গুইরা অগো নামে মিথ্যা কইয়্যা বিক্যা করে। সন্দ্যার সুম দিয়া যায়। আর...'

'আর কী?'

'না, কমু না।'

'আরে বলো, আমাকে লজ্জা পাবার কিছু নাই।'

'মানে, রাইতের আন্ধারে ও...'

'থাক, আর বলতে হবে না।'

'স্যার, তয় আমি অরে বিয়া করার কতা কইছি। ও শুনতি চায় না।'

সূর্যটা সুউচ্চ দালানগুলোর ওপর মাথা নুইয়েছে। নরম আলোয় শহরটা যেন ফিনফিনে হালকা নীলের ওড়নায় ঘোমটা টেনেছে। কিন্তু নয়ন বুকের ভেতর কুকুরের কামড় নিয়ে হাঁটছে আর অন্যমনস্ক হয়ে খুঁজছে দূষিত শিকড়ের জন্মস্থান। মনে পড়লো মহানবীর হাদিস—'যার স্ত্রী নেই, সে দরিদ্র, দরিদ্র, দরিদ্র।' লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাসুল (সঃ)! যদি সে বিরাট সম্পদশালী হয়ে থাকে?' তিনি বললেন, 'সে বিরাট সম্পদশালী হলেও দরিদ্র।' অতঃপর তিনি বললেন, 'যে নারীর স্বামী নেই, সে মিসকিন, মিসকিন, মিসকিন।' লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাসুল (সাঃ)! যদি সে সম্পদশালিনী হয়ে থাকে?' তিনি বললেন, 'সম্পদশালিনী হলেও স্বামী ছাড়া সে মিসকিন।' (গুনিয়াতুত তালিবিন)।

কী আশ্চর্য প্রতিফলন আমাদের মধ্যে এ কথার! কোনো সচেতন কি অবচেতনেও এ কথার বিশ্লেষণ ঘাসের কাছে পৌঁছেছে? অসাম্যের প্রাচীর এতোই মজবুত যে তা আর সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

নয়নের গন্তব্য মেস-রুম। এই শহরের গহ্বরে। মেসে পৌঁছতে সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। রুমে ঢুকতেই তিনজন রুমমেট সমস্বরে বললো, 'কী বাউল, ফিরা আইছস?'

'দোস্ত, তোরা কেমন আছিস?' বসতে বসতে জিজ্ঞাসা করলো নয়ন।

'ভালো, কিন্তু তুই কেমন আছিস, কোথায় ছিলি এতোদিন?'

একজন বললো, 'বিয়া-শাদি কইরা আইছস মনে অয়।' নয়ন বললো, 'আমি বিয়ে করলে তোর লাভ কী?'

'যদি তোর শালীদের পেছনে চান্স নিতে পারি।'

'আমার শালীরা তোর মতো প্যাঁদাকে খুঁজছে।'

সবাই হেসে উঠলো। যাকে কথাটা বলা সে আরো বেশি হাসলো, যেন কিছু মনেই করে নি। আরেকজন বললো, 'ওসব কথা রাখ্। দোস্, তুই কোথায় গিয়েছিলি, কেমন মজা হলো তাই বল্।'

'পাহাড়-জঙ্গল, খাল-সমুদ্র, বিল-ঝিল অনেক জায়গা ঘুরেছি। কিন্তু একটা মজার কথা, যদি কোনোদিন বিয়ে করি বাপ হতে ভয় করবে।'

'তোর বাউলা হাসির কথা রাখ্।' বললো অন্যজন। সবাই আরেকবার হাসির জোয়ারে ভাসলো। হাসি থামলে একজন বললো, 'তোর শালা বিয়ে করে মরতে হবে না।'

'ঠিক।' উত্তর দিল নয়ন।

'কিসের ঠিক?'

'যেমন ধর্, আমাদের মা-বাবা বিয়ে করেছে। তারা রিচ। আমাদের জন্মটা একটা ফর্মালিটি। তবু তারা আমাদের লালন করে বড় করে তুলেছে গায়-গতরে। কামাই করে তাদের দেখাশুনা করবো। এ এক মহৎ প্রত্যাশা। প্রত্যেক সন্তানের তাই করা উচিত। বিয়ে করলে সে কাজে শিথিলতা আসতে পারে। তারচে সুখবাগানে যাওয়াই ভালো। সব ঠিক থাকে।'

'সেটা কেমন?'

'সে এক মজার জায়গা, যেখান থেকে ফিরে এলে দুঃসহ যন্ত্রণার স্মৃতি আর কষ্টের অনেক কথা ভিড় করে মনের উঠানে। এই পৃথিবীতে এসেছি। তারপর থেকে জন্ম-ঘর মায়ের উদর, সেই ছোট নিষ্পাপ পৃথিবী থেকে পাপ-পুণ্যের বিরাট পৃথিবীতে প্রকাশিত হওয়ার সময় ভাইবোনের ভুবনচেরা কান্নার শব্দ শুনেছি উঠানে দাঁড়িয়ে। যেমন কাঁদে পথের ধুলা। সে কান্নার কারণ জানতে পারি নি প্রথমে। তবে এখন বোধ হয় বুঝতে পেরেছি বা পারি নি। আমিও হয়তো ওভাবে কেঁদেছিলাম। তবে আমার কান্নাটা বোধ হয় একটু অন্যরকম ছিল, মায়ের কষ্টকে সান্ত্বনা দিতে এবং তার আদরের গন্ধ পেতে। আমার পেছনে যারা পৃথিবীতে এসেছে তারা প্রতিবাদের কাঁদন কেঁদেছে। তাতে মিশে ছিল এক কঠিন বাস্তব সত্যের ছবি। পৃথিবী যখন সৃষ্টিতে, উন্নতিতে আকাশের তারা ছুঁই ছুঁই করছে, আমরা তখন ধুলার উঠানে জন্ম নিয়ে ধুলা খেতে খেতে পঙ্গুত্বে উন্নীত হয়েছি। কোনো শহরের ব্যস্ততম জনবহুল প্রধান সড়কের যেখানে ফুট-ওভারব্রিজ নির্মিত হয়েছে, সেই ব্রিজের দু-তিন সিঁড়ি ছুঁয়ে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে ব্যস্ত। এখানেই সকল কান্নার মূল ভিত্তি। নিজের খেয়াল-খুশিমতো আনন্দে আবেগের শরাব দিয়ে কোনো পান-পাত্র পূর্ণ করতে গিয়ে নিষ্পাপ মানবশিশুর জন্ম দিয়ে তাকে কষ্টের পৃথিবীতে সমর্পণ করার অধিকার মানুষের নেই কোনোমতে। কারো নেই নিঃস্বার্থ দায়িত্ব পালনে কারচুপি করার অধিকার। দোস্তরা, সন্ধ্যা হয়ে এলো, আমি সুখবাগানে যাবো।' বলেই নয়ন তৈরি হয়ে বের হলো।

সকাল সাতটা বাজে। ছোট খুপরি মেস-রুমের একটি মাত্র জানালার গ্রিল ধরে ঊষা-বাতাস ঠাণ্ডা আলো সাথে নিয়ে উঁকি দিচ্ছে। পাশের সিটে ঘুমানো রোকন; উঠেই ফাটা গলায় ডেকে উঠলো, 'নয়ন, এই নয়ন। শালা ডিউটিতে যাবি না?' ওঠ্ ওঠ্ বলে নয়নের শরীরে ধাক্কা মারলো।

নয়ন ঘুমো গলায় বিরক্তির সাথে বললো, 'দুত্তরি শালা, সকাল সকাল ভ্যা-ভ্যা করিস না।'

আবার ঘুমানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু ঘুম সরেই গেলো। মনে পড়লো, এই তো সেদিন এক ক্ষমাহীন অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড বাতিল হয়ে গেলো। কিন্তু একটা নির্দোষ লোককে মিথ্যা অভিযোগ সাজিয়ে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেয়া হলো। এসব ভাবনা আর কষ্ট ঘিরে ধরলো। বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। ভাবছে—এই যে আলো-বাতাস—কেন যে আবার ফিরে এলো! এই সকালটা যদি আর দেখতে না হতো, মৃত্যু যদি হতো, সেটাই তবে ভালো হতো। দাঁড়ি-পাল্লা বিচার-ব্যবস্থার সাম্যের প্রতীক। মনে হয়, দু হাতে দুটি আধুনিক পিস্তল নিয়ে সে ছুটে যায়, দাঁড়ি-পাল্লা তৈরির কর্মকারকে গিয়ে বলে, 'তুমি তোমার তৈরি দাঁড়ি-পাল্লাগুলো সব নষ্ট করে ফেলো, নতুন করে আর তৈরি করো না। তোমার সৃষ্টির অসম্মান হচ্ছে সবখানে। তোমার দাঁড়ি-পাল্লায় এখন আর সাম্যতা নেই। যদি সাম্যতা ফিরিয়ে আনতে পারো তবেই নিষ্কৃতি পাবে।'

অবশেষে সব ভুলে বিছানা ছাড়তেই হলো। ব্যস্ত হয়ে সবাই খেতে বসেছে। রোকন বলে উঠলো, 'নয়ন, জগে পানি নাই। তুই কলেত্যা এট্টু পানি নিয়ায়।' নয়ন পানি আনতে আনতে গেয়ে উঠলো, 'শোনরে মন আমার বউ নাই, যার কেউ নাই তার...' সবাই হেসে উঠলো। বললো, 'কিরে, তোর মনে দেহি রং লাগছে।'

'তোর কপালে বউ নাই।' বললো রোকন।

'ভালোই তো আছি।'

'বুড়া অইয়া গেলি, আর ভালো থাকা লাগবে না। তোরে কেউ মাইয়া দেবে না।'

'আমি চাই না কষ্টের মধ্যে আমার সন্তান জন্ম নেবে। আর আমার মৃত্যুর পর শয়তানের ভাষায় আমার নামে সদ্‌কা দেবে।'

'এসব বাউলা কথা ভুলে থাক। ভালো থাকা কতো সহজ বুঝতে পারবি।'

'আজ রাতে একটা স্বপ্ন দেখেছি। বড় স্বপ্ন, ভালো থাকার স্বপ্ন। সেখানেই রওনা হয়েছিলাম। তুই না ডাকলে ঘুম ভাঙ্গতো না।'

সকালের খাওয়া সেরে সবাই বেরিয়ে পড়লো সারাদিনের ব্যস্ততা নিয়ে। মেস-রুমের দরজায় বড় একটা লোহার তালা ঝুলে রইলো। কতোটা সময় ধরে ঝুলবে তা কারো জানা নেই।

• • •

গালে টোল পড়া মেয়ে

জালাল উদ্দিন

উৎসর্গ :

আমার আম্মা বেগম ফয়জুন্নাহার,
যাঁর ঋণ কখনোই শোধ হবার নয়

লেখক-পরিচিতি

জন্ম ২৭ জানুয়ারি ১৯৭৮, মৌলভীবাজারের কামারকাপনে (রায়শ্রী)। স্থানীয় সিংকাপন আপ্তাব উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় ও মৌলভীবাজার সরকারি কলেজে লেখাপড়া করেছেন। যায় যায় দিন পত্রিকার কোনো এক ঈদ সংখ্যায় প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়, তারপর থেকে অন্যান্য পত্রিকায়ও লেখা প্রকাশিত হয়ে আসছে।

এক

কায়েছ মোবাইলে সময় দেখলো। যতো দিন যাচ্ছে ততোই জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসের কদর বাড়ছে। পুরনো ও অপ্রয়োজনীয় জিনিস বাতিলবাক্সে জমা হচ্ছে। একসময় হাতঘড়িকে কতোই না কদর করা হতো। অথচ আজকাল হাতঘড়ির ব্যবহার প্রায় উঠে যাচ্ছে। মোবাইল ব্যবহারকারীরা হাতঘড়ি ব্যবহার করতে চায় না।

এখনো সময় হয় নি, তবুও কায়েছ জায়গামতো চলে গেলো। অস্বস্তি নিয়ে চারদিকে তাকালো। সামনে গার্ল্‌স স্কুল। একটু পর স্কুল ছুটি হবে। সদ্য-তরুণরা স্কুল-গেটে বা রাস্তায় ভিড় করবে। মেয়েদেরকে ইভ-টিজিংয়ের শিকার হতে হবে। কেউ বা চিঠিপত্র আদান-প্রদান করবে। এসব কাজ স্কুলের ছাত্ররাই বেশি করে। এটাই যৌবনের ধর্ম। তাকে এখন এ জায়গায় দেখে যে কেউ ভেবে বসতে পারে—সেও স্কুলের ছাত্রীদেরকে দেখতে এসেছে। তাই সে একটু সতর্ক হলো—এ বয়সটা ও অনেক আগেই পার হয়ে এসেছে।

সময় হয়েছে এবং একটু পরই পান্নাকে বের হয়ে আসতে দেখা গেলো, সাথে জেসমিন। ওরা ওদের টিচারের কাছে কোচিংয়ে এসেছিল। পড়া শেষ। দুটি রিকশার প্রয়োজন। স্কুল ছুটি হলে খালি রিকশা পাওয়া যাবে না। খলখল হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে, কপাল কুঁচকে স্কুলের মেয়েরা সব খালি রিকশা দখল করে নেবে।

ভাগ্য ভালো, দুটি খালি রিকশা পাওয়া গেলো। কায়েছ একটিতে উঠে অন্যটিকে তার পেছনে পেছনে যেতে বললো। পান্নাদের কাছে গিয়ে ওদেরকে পিছনের রিকশায় উঠালো, তারপর স্লুইচ গেটের পাশের বাগানের দিকে চললো। ওখানে বসে গল্প করার বেশ ভালো জায়গা আছে। শুধু সমস্যা হলো, বাজে ছেলেরা এক পাশে বসে খুব খারাপ মন্তব্য করে, যা সহ্যও করা যায় না, আবার ঝগড়ার ভয়ে কিছু বলাও যায় না।

রিকশা ছেড়ে দিয়ে ওরা বাগানে গিয়ে জায়গা বেছে বসে পড়লো। কায়েছের পাশে জেসমিন, জেসমিনের পাশে পান্না। জেসমিন গোলাপি জামা পরে এসেছে। সম্ভবত পান্না বলে দিয়েছে—কেউ গোলাপি জামা পরলে ওর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে কায়েছের ভালো লাগে।

জেসমিনের সাথে কায়েছের দেখা হয়েছিল আকবরের বিয়েতে। কায়েছ পান্নাকে সাথে নিয়ে গিয়েছিল। সে বিয়েতেই পান্না ওর বান্ধবী জেসমিনকে পেয়েছিল, তারপর জেসমিনের সাথে কায়েছের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। প্রথম দিনই জেসমিনকে কায়েছের ভালো লেগে গিয়েছিল। কায়েছ দেখেছিল, আহামরি টাইপের না হলেও জেসমিন সুন্দরী। কী জন্য ভালো লেগেছিল তা কায়েছ নিজেও বলতে পারে না। হয়তোবা, বিয়ের মতো জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানেও জেসমিন মেকআপ করে নি দেখে

ওকে ভালো লেগে গিয়েছিল। হয়তো ওর একেবারে সাধারণ চলাফেরা দেখে। এবং বিয়ের অনুষ্ঠানেই পান্নার মাধ্যমে জেসমিনকে ওর ভালোলাগার কথা জানিয়েছিল। জেসমিন পরের সপ্তাহে পান্নাকে বলেছিল কায়েছকেও ওর ভালো লাগে; তবে শর্ত হলো, কায়েছকে কথা দিতে হবে—ও তাকে বিয়ে করবে। কায়েছ একথা শুনে বলেছিল—তাহলে এখনই কোর্ট ম্যারেজ করে ফেলি, আনুষ্ঠানিকতা হবে পরে। জেসমিন আপত্তি তুলে বলেছিল—পরীক্ষার পর পারিবারিকভাবে সেটল্ড ম্যারেজ হতে হবে। এখন সে কায়েছকে তেমন একটা সময় দিতে পারবে না। কারণ, ওদের চলাফেরা জেসমিনদের পরিবারের কেউ দেখে ফেললে ওর পরীক্ষা দেয়া হয়ে উঠবে না। সুতরাং মাসে একদিন, প্রতি ইংরেজি মাসের কুড়ি তারিখ—যে বারই হোক না কেন, দেখা হতে পারে। কায়েছ সব শর্তে রাজি হয়েছিল।

আজ কুড়ি তারিখ। বরাবরের মতো পান্নাই ওদের দেখা করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

কায়েছ ওর হাতের প্যাকেটটা জেসমিনের হাতে দিল। জেসমিন জিজ্ঞাসা করলো, 'গিফ্‌ট?' কায়েছ হ্যাঁ-সূচক মাথা ঝাঁকালো। জেসমিন বললো, 'থ্যাংক্‌স। প্রতি মাসের কুড়ি তারিখে আমাদের দেখা হয়, তুমি আমার জন্য সেদিন একটি প্যাকেট নিয়ে আসো। ব্যাপার কী?' কায়েছ কোনো কথা না বলে হাসলো। জেসমিন হেসে বললো, 'তাহলে কি ধরে নেবো, বিয়ের পর তুমি প্রতিদিন আমাকে একটি করে গিফ্‌ট দিবে?' কায়েছ অবাক হয়ে বললো, 'না, তা হবে কেন?'

'বা রে, এই যে এখন দেখা হলেই একটি করে প্যাকেট দিচ্ছ। তখন তো প্রতিদিন দেখা হবে, তখন দিবে না?'

'না।'

'তাহলে যতো দেরি করে বিয়ে হয় ততোই ভালো। বেশি করে প্যাকেট পাবো। বিয়ে হয়ে গেলেই তো প্যাকেট দেয়া বন্ধ হয়ে যাবে।'

প্রতি মাসের কুড়ি তারিখে পান্না ওদের দেখা করিয়ে দেয়। ওদের জন্য পান্না কষ্ট করে, তাই ওকে প্রতি মাসের কুড়ি তারিখে খাওয়াতে হয়। সাথে অবশ্যই জেসমিন থাকে।

জেসমিন কায়েছকে জিজ্ঞাসা করলো, 'গত সোম ও বৃহস্পতিবার কোনো ছবি দেখেছো?' জেসমিন এই প্রশ্ন করতেই পারে। জেসমিনের প্রায় সব কথা যেমন কায়েছকে জানায়, কায়েছও তেমনি ওর প্রায় সব কথা জেসমিনকে জানায়। নিজের চরিত্রের ভালো-মন্দের কথা কায়েছ জানায়। জেসমিন জানায় কায়েছকে। কায়েছ জেসমিনকে বলেছে, সে প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার রাত্রে একটি করে ভালো ছবি দেখে। হতে পারে তা বাংলা, ইংরেজি বা হিন্দি। যে কোনো ধরনেরই হোক, ভালো ছবি হলে কায়েছ সংগ্রহ করে, তারপর দেখে। যদি সোমবার রাত্রে লোডশেডিং হয়, তাহলে মঙ্গলবারে দেখবে না, দেখবে বৃহস্পতিবারে। যদি বৃহস্পতিবারে লোডশেডিং হয় তবে পরের সোমবারে দেখবে।

কায়েছ বললো, 'তুমি তো জানো, পুরনো যেসব ছবি আমি দেখি নি সেগুলো থেকে দেখা শুরু করেছি। গত সোমবার দেখলাম Man On Fire ছবিটি।'

জেসমিন জিজ্ঞাসা করলো, 'কে কে ছিল ছবিতে?'

'ডেনজেল ওয়াশিংটনের ছবি।'

'কাহিনীটি বলবে?'

কায়েস ছবির কাহিনী বলতে থাকে। কাহিনী বলা শেষ হবার পর জেসমিন পার্স থেকে ছোট একটা প্যাকেট বের করে কায়েছের হাতে দেয়। কায়েছ হেসে জিজ্ঞাসা করে, 'গিফ্‌ট?' জেসমিন কথা বলে না, হাসে।

পান্না বললো, 'এ শনিবারে আমাদের এক বান্ধবীর বড় বোনের বিয়ে, সেখানে আমি ও জেসমিন যাবো। তুমি যেতে চাইলে যেতে পারো। আমাদের দাওয়াতে যাবে। তাহলে জেসমিনের সাথে দেখাও হবে, কথাও বলতে পারবে।' কায়েছ বললো, 'কমিউনিটি সেন্টারে বিয়ে?'

'হ্যাঁ।' উত্তর দিল পান্না।

'আমি গেলে তো কোনো সমস্যা নেই?'

'না, নেই।'

'তাহলে যাবো। একমাস পরপর দেখা করতে খুব খারাপ লাগে। মাঝে মাঝে এরকম সুযোগ পাওয়া গেলে মিস করা উচিত নয়, তুমি কী বলো জেসমিন?' বলে জেসমিনের দিকে তাকালো। জেসমিন হাসলো।

দুই

শান্তা ডাকলো, 'এই আপা, রেডি হয়েছো?'

রাহেনা হাতে পার্সটি নিয়ে শান্তার কাছে গিয়ে বললো, 'চল্।' দুজন একসাথে তাদের মার রুমে গেলো। শান্তা বললো, 'আম্মা যাচ্ছি।' মা বললেন, 'বেশি দেরি করো না, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।' শান্তা বললো, 'কী যে বলো না আম্মা! আমরা যতোটুকু সময় নিয়ে বের হই ততোটুকু সময়ের মধ্যেই বাসায় ফিরে আসি। কখনো উলটা-পালটা হয়েছে?' মা বললেন, 'উলটা-পালটা হয় নি। বলতে হয় তাই বলেছি। তাড়াতাড়ি আসবে।'

'ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ আম্মা।'

'আল্লাহ হাফেজ।'

ওদের মা কখনো ওদেরকে 'তুই' করে বলেন না, বলেন 'তুমি' করে। বাবাও তাই করেন। ওরা দু বোনই বাবা-মাকে 'তুই' করে বলতে বলে। 'তুমি' করে বললে পর-পর লাগে। কিন্তু বাবা-মা ওদের কথা শোনেন না।

রাহেনা ও শান্তা দুজনে শপিংয়ে বের হয়েছে, সামনে সামিউলের জন্মবার্ষিকী। আজ সামিউলের জন্য উপহার কেনা হবে। রাত্রে প্যাক করা হবে। কাল কুরিয়ার সার্ভিসে দেয়া হবে। আশা করা যায়, আগামী পরশু সামিউল ওর জন্য পাঠানো উপহার পেয়ে যাবে। জন্মবার্ষিকীর উপহার জন্মবার্ষিকীর দিনে পাবার তুলনা অন্যকিছুর সাথে হতে পারে না।

রিকশা করে দু বোন গিয়ে ম্যানসনের সামনে নামলো। ঠিক করা হলো, প্রথমে শান্তা পরে রাহেনা সামিউলের জন্য উপহার কিনবে।

শান্তা ক্রিস্টালের একটি শো-পিস কিনলো, তারপর একটি ফতুয়া। রাহেনা জেম্‌স-এর দুটি সিডি কিনলো। এরপর কার্ড কেনার পালা।

শপিং শেষ করে লাইব্রেরিতে গেলো। সেল্‌স্‌ম্যান ওদেরকে দেখে পরিচিতের হাসি হাসলো। পরিচিতই তো। এই লাইব্রেরি থেকেই প্যাড-খাম-কলম এসব কিনে। তবে রাহেনা শুধু বই কিনে। ও মাসুদ রানার ভক্ত। সাথে সমরেশ মজুমদারের বই পড়ে। শান্তার কোনো বাছবিচার নেই, যা পায় তাই পড়ে।

সেল্‌স্‌ম্যান হেসে রাহেনাকে বললো, 'এ মাসের মাসুদ রানা তো নেন নি। দেবো?'

রাহেনা বললো, 'হ্যাঁ দিন।' সেল্‌স্‌ম্যান মাসুদ রানার নতুন বইটি এনে দিল।

বই কেনার পর দু বোন চটপটি খেলো। তারপর বাসায় ফিরলো।

রাত্রে দুজনে মিলে সামিউলের উপহার প্যাক করলো। রাহেনা মাসুদ রানাকে নিয়ে বেড়ে গেলো। আর শান্তা? জন্মবার্ষিকীতে যদি সামিউলের বাসায় যেতে পারতো, তাহলে সামিউল শান্তাকে দেখে কী রকম চমকে উঠতো তা ভাবলো।

শান্তার লেখালেখির অভ্যাস আছে। তাদের বাসায় যে দৈনিক পত্রিকা আসে সে পত্রিকা প্রতি সপ্তাহে একটি ফান সাপ্লিমেন্ট বের করে। সেটি পড়ে পড়ে এক সময় শান্তা সে ফান সাপ্লিমেন্টের জন্য লেখা তৈরি করতে লাগলো। সাথে সাথেই সে লেখা পাঠাতে শুরু করে নি। ফান সাপ্লিমেন্ট পড়ে বুঝেছে—যদি কোনোভাবে বা বেখেয়ালে ওর লেখায় কারো লেখার মিল হয়ে যায় তাহলেই হয়েছে। নকল লেখা, নকল লেখা বলে বিভাগীয় সম্পাদকের কাছে পাঠকদের চিঠি যেতে শুরু করবে। নকল লেখা পাঠানোর পর ধরা খেয়ে ফান সাপ্লিমেন্ট থেকে কয়েকজন লেখককে বহিষ্কার করা হয়েছে। বহিষ্কার হওয়া এসব লেখকের লেখা আর কখনো এই ফান সাপ্লিমেন্টে প্রকাশ করা হবে না।

সবকিছু বুঝে শান্তা এই ফান সাপ্লিমেন্টে লেখা পাঠালো। এক মাস পর তার লেখা প্রকাশিত হলো। সেদিনের ফান সাপ্লিমেন্টে শান্তা ওর নাম দেখে এতো খুশি হয়েছিল যে, সেরকম খুশি আর কখনো হয় নি। সেই থেকে শুরু। এখন শুধু ফান সাপ্লিমেন্টে লেখা পাঠানো সীমাবদ্ধ রাখে নি, দুটি সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনেও লিখতে শুরু করেছে।

লেখা প্রকাশিত হবার পর থেকে শান্তার ঠিকানায় ওর নামে চিঠি আসতে শুরু হলো। শান্তা বুঝতে পেরেছিল, ফান সাপ্লিমেন্ট বা সাপ্তাহিকী থেকে ওর নাম-ঠিকানা পেয়ে ওরা চিঠি লিখেছে। কেউ কেউ লিখেছে—'লেখাটি খুব ভালো লেগেছে, ধন্যবাদ।' কেউ লিখেছে—তাকে যেন সে আপন ভাইয়ের মতো দেখে। কেউ লিখেছে—তারা বন্ধুত্ব করতে চায়। কেউ কেউ তো লিখেছে—তার লেখা পড়ে তাকে ভালোবেসে ফেলেছে। কেউ কেউ তাকে বিয়ে করতে চায়। এসব চিঠির মধ্য থেকে সে বেছে বেছে দু-একটি চিঠির উত্তর দেয়। ধন্যবাদ জানায়। এতোসব চিঠির ভিড়ে একজন লিখেছিল সে তার সাথে পত্রমিতালি করতে চায়। শান্তা যদি পত্রমিতালি করতে আগ্রহী হয় তাহলে সে খুব খুশি হবে। মাত্র তিন লাইনের চিঠি। কোনো ভণিতা নেই। পত্রমিতা হতে চায় তা সরাসরি লিখেছে। ওটা ছিল সামিউলের চিঠি।

শান্তা সামিউলকে উত্তর দিল—সে রাজি। তখন থেকে ওদের মধ্যে নিয়মিত চিঠি আদান-প্রদান হতে লাগলো। একজন আরেকজনের ভালোলাগা, মন্দলাগা জানালো। শান্তা জানালো, ওর প্রিয় লেখক হুমায়ূন আহমেদ ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সামিউল জানালো—ওর প্রিয় লেখক কাজী আনোয়ার হোসেন। শান্তার প্রিয় নায়ক ছিলেন সালমান শাহ্। সামিউলের প্রিয় নায়কদের তালিকা বেশ লম্বা। টম হ্যাংক্‌স, আল পাচিনো, রবার্ট ডি নিরো ও নানা পাটেকার। শান্তার মতে সুবর্ণার অভিনয়ের তুলনা হতে পারে না। সামিউল বলে, আফজাল হোসেন, হুমায়ুন ফরিদীর মতো দাপুটে অভিনেতা কতোজন আছেন? শান্তা পাকিস্তানের সাপোর্টার তো সামিউল দুর্বল দল ওয়েস্ট ইন্ডিজের। সামিউল ব্রাজিল তো শান্তা আর্জেন্টিনার সাপোর্টার। দুজনের পছন্দের মিল খুব কম। তারপরও দুজন দুজনের খুব ভালো বন্ধু হয়ে গেলো। দুজন দুজনকে খুব চিঠি লেখে। দুজন দুজনকে বাংলা নববর্ষ, ইংরেজি নববর্ষ, ভ্যালেন্টাইন্স ডে, বন্ধু-দিবস, জন্মবার্ষিকী, দুই ঈদে স্পেশাল গিফ্‌ট করে। সামিউল যখন শান্তার জন্য কিছু পাঠায়, সাথে রাহেনার জন্যও। শান্তাও কিছু পাঠালে রাহেনাও সে প্যাকেটের ভেতর সামিউলের জন্য উপহার পাঠায়।

সামিউল শান্তাকে লেখালেখি চালিয়ে যাবার জন্য খুব উৎসাহ দেয় এবং সামিউলের উৎসাহের জন্য বাংলাদেশের সেরা সাপ্তাহিকীটি যখন পাঠকদের কাছ থেকে বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা আহ্বান করে, তাতে শান্তা লেখা পাঠায়। লেখা ছাপাও হয়। সামিউল সে লেখা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা লিখে পাঠায় শান্তাকে। শান্তার খুব ভালো লাগে। সামিউলের চিঠি সপ্তাহান্তে না পেলে শান্তার খুব খারাপ লাগে। এর মধ্যে শান্তা সামিউলের ছবি পেয়েছে। শান্তাও সামিউলকে ছবি পাঠিয়েছে। শান্তা ওর প্রতি চিঠিতে ওকে ওদের বাসায় আসার আমন্ত্রণ জানায়। সামিউল লিখে পাঠায়, সময়-সুযোগ করে ও আসবে।

ভোরে রাহেনার ডাকে শান্তার ঘুম ভাঙলো। রাহেনার নামাজ পড়া শেষ। বিছানায় বসেই শান্তা রাহেনাকে সালাম দিল। শান্তা শুনতে পেলো, বাবা কোরআন শরীফ পড়ছেন। প্রতিদিন ভোরে ফজরের নামাজ পড়ে কোরআন শরীফ পড়েন বাবা। বেশ কিছুক্ষণ পড়ে বিশ্রাম নেন। শান্তা ফ্রেশ হয়ে বাবার কাছে গিয়ে বসলো। ওর বাবা কোরআন শরীফ পড়েন সুললিত কণ্ঠে। শুনতে খু-উ-ব ভালো লাগে। কোরআন শরীফ পড়া শেষ হবার পর শান্তা বাবাকে সালাম দিল। সকালে ঘুম থেকে উঠে ওদের পরিবারে এক সদস্য অন্য সদস্যকে সালাম দেয়। সালামের অর্থ হলো—'তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।' ভোরবেলা এতো ভালো একটি বাক্য দিয়ে দিন শুরু করলে দিন তো ভালো যাবার কথা।

কিছুক্ষণ পর রাহেনা ও শান্তা ওদের বাগানে হেঁটে বেড়ালো। ঘরে এসে দেখলো কাজের মেয়ে রান্নাঘরে নাস্তার আয়োজন করছে, সাথে মা। মা ওদেরকে দেখে সালাম দিলেন।

এরপর শান্তা ওর পড়ার টেবিলে গেলো। সময়মতো নাস্তা শেষ করা হলো।

শান্তার বাবার কোর্টে যাবার সময় হয়ে এলো। কোর্টে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন টের পেয়ে শান্তা বাবার রুমে এলো। বাবা কোর্টে যাবার সময় দু বোনের একজন বাবার পায়ে জুতা পরিয়ে দেয় এবং কোর্ট থেকে আসার পরও বাসায় ঢোকার পর রুমে

আসামাত্র দু বোনের একজন জুতা খুলে নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে রেখে দেয়। বাবা তাঁর দু মেয়েকে বলেছেন, এ কাজটি তিনি নিজেই করতে পারেন, তারা যেন এটি না করে। দু মেয়ে তাঁর কথা শোনে নি।

শান্তার বাবা একজন এডভোকেট। আগে ফুড ডিপার্টমেন্টে ছিলেন। সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এডভোকেট হয়েছেন।

বাবা কোর্টের উদ্দেশে বের হবার পর দু বোনে গল্প করতে বসলো। কিছুক্ষণ পর পাশের বাসার মনেটকে দিয়ে গিফ্‌ট প্যাকেটটি কুরিয়ার করতে পাঠালো।

দু বোনই তারা, কোনো ভাই নেই। একটি ভাই থাকলে অন্য বাসার কাউকে ডেকে এনে প্যাকেট কুরিয়ার করতে পাঠাতে হতো না। নিজের ভাই-ই এ কাজটা করতে পারতো। ভাই নেই বলে শান্তার নিজের মনটা মাঝেমধ্যে খারাপ হয়। কিন্তু এই ব্যাপারটা নিয়ে বাবা-মাকে একটি কথাও বলতে কখনো শোনে নি। আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তা নিয়ে খুশি আছেন বাবা-মা।

শান্তা ওর রুমে চলে এলো।

তিন

কায়েছ রিকশা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে ফেললো। গেটের ভেতর দিয়ে ঢোকার সময় হালকা অস্বস্তি বোধ করলো। এটা খুব বোকার মতো কাজ হয়ে গেছে। না জানি সালাম কী বলে! সালাম তো অবশ্যই কিছু একটা বলবে, চড়-টড় মারে কিনা কে জানে? প্রায় তিন বছর পর কায়েছ সালামদের বাড়িতে যাচ্ছে। অথচ এরকম কথা ছিল না। সালাম আর কায়েছ খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বন্ধুত্বের সম্পর্ক হবার পর থেকে কায়েছ এ বাড়িতে দশ-বার দিন পরপর আসতো। আসা-যাওয়া করতে করতে এ পরিবারের সবার সাথে ওর খুব ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল। সালামদের একান্নবর্তী পরিবার। বেশ বড় সংসার—ছয় ভাই, সালাম সবার ছোট। অন্য পাঁচ ভাই বিয়ে করেছেন অনেক আগেই। সালামের বড় ভাইয়ের দু মেয়ে তো বেশ বড়ই। কায়েছ কলেজে ওঠার পর থেকে সালামদের বাড়িতে গেলে চকোলেট, নয়তো চিপ্‌স, নয়তো চুইংগাম নিয়ে যেতো। সবকটি ভাতিজা-ভাতিজিকে এক পিস (এক প্যাকেট নয়) করে চুইংগাম দিত। চকোলেট দিত জনপ্রতি একটা। অবশ্য এসব না নিলেও চলতো। তারপরও কায়েছ এসব নিয়ে যেতো। তখন বাবা বেঁচেছিলেন। টাকা-পয়সার অভাব ছিল না। তাই সালামদের ফ্যামিলিতে ভাতিজা-ভাতিজিদের জন্য এসব নিতে পারতো। সালামের বড় ভাইয়ের বড় ও মেঝো মেয়ে দুটি চকোলেট, চিপ্‌স এসব নিতে ইতস্তত করতো। কারণ, ওরা বেশ বড় ছিল। কায়েছও এসব ওদের হাতে না দিয়ে মাছুম বা রুমেলের হাতে ওদের অংশ দিয়ে দিত। সালামের ভাবীরা কায়েছকে ভালোবাসতেন। কিন্তু এই তিন বৎসরের একদিনও কায়েছ সালামদের বাড়িতে আসে নি। সালাম অনেক বলেছে, কিন্তু তারপরও কায়েছ আসে নি। সালাম অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছে, ওর কোনো ভাই বা ভাবী কিছু বলেছে কিনা। কায়েছ হেসে জিজ্ঞাসা করেছে, ও কেন ওর ভাই বা

ভাবীদের নামে মিথ্যে বদনাম রটানোর জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। সালামও এই তিন বৎসরে মার্কেটে যেখানে বসে ওরা আড্ডা দেয় সেখানে প্রতি দুই মাসে একদিন গিয়েছে কিনা সন্দেহ আছে। অবশ্য গত দুই বৎসর ধরে সালাম ইংল্যান্ড যাবার চেষ্টায় খুব দৌড়াদৌড়ি করেছে। রেস্টুরেন্ট ভিসা, ভিজিট ভিসা নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। ভিসা পায় নি, যাওয়াও হয় নি। গত সপ্তাহে সালাম যখন ওর বিয়ের কার্ড নিয়ে কায়েছের কাছে এলো তখন ওর খুব ভালো লেগেছিল। কিন্তু সালামদের বাড়িতে যেতে হবে বলে অস্বস্তিবোধও হচ্ছিল। কারণ, সালামের বিয়ে উপলক্ষে সবাই নিশ্চয়ই বাড়িতে একত্রিত হবে। সমস্যা এখানেও হয় নি। বিয়ের কার্ড দিয়ে আসার সময় কায়েছ সালামকে বলেছিল, ওকে সঙ্গে নিয়ে যদি সালাম অন্য কোথাও দাওয়াত দিতে যেতে চায়, ও যেতে পারবে। সালাম না করে বলেছিল, কায়েছ যেন বিয়ের আগের দিন থেকে ওদের বাড়িতে থাকে। একসাথে বিয়ে-ওয়ালিমা খেয়ে তারপর আসবে। কায়েছ সালামের বিয়ের কার্ড খুলে দেখে নি। সালামের কাছ থেকে কথায় কথায় জেনেছিল ওয়ালিমা শনিবারে। কিন্তু আজ (শুক্রবার) বিয়েতে যাবে বলে তৈরি হয়ে কী মনে করে বিয়ের কার্ড খুলে দেখেই বোকা বনে গেলো। বিয়েটা গতকাল বৃহস্পতিবার হয়ে গেছে। অবশ্য ওয়ালিমা আগামীকাল। শনিবার ওয়ালিমা ভেবে ও ভেবেছিল বিয়ে শুক্রবারে হবে। যেহেতু গতকাল বিয়েতে যেতে পারে নি, তাই ঠিক করলো আজ বিকেলে সালামদের বাড়িতে যাবে। সালামকে স্যরি বলবে এবং আগামীকাল ওয়ালিমাতে সকালবেলা থেকেই থাকবে। বাড়িতে ঢোকার আগে ওর অস্বস্তিবোধ করার আরেকটি কারণ হলো, সে জানে এই তিন বৎসরের মধ্যে সালামের বড় ও মেঝো ভাতিজি রুবিনা ও শিবানার বিয়ে হয়ে গেছে। রুবিনার একটি বাচ্চা, শিবানারও একটি। এসব খবর কায়েছ সালামের কাছ থেকে পেয়েছে। সে কারো বিয়েতেই আসে নি।

কায়েছ বাড়িতে ঢুকলো। অপরিচিত-অপরিচিত বাড়ি মনে হচ্ছে। তিন বৎসর এ বাড়িতে না আসার ফল। উঠানের একদিকে ডেকোরেটার্সের চেয়ার-টেবিল স্তুপ করে রাখা হয়েছে। আগামীকাল ওয়ালিমা অনুষ্ঠান বাড়িতেই হবে। শোরগোল শুনেই বোঝা যাচ্ছে বাড়িতে প্রচুর লোকজনের সমাগম। কমিউনিটি সেন্টারে না করে বাড়িতেই বিয়ে-ওয়ালিমা-শিরনি এসবের অনুষ্ঠান করার কারণ, কমিউনিটি সেন্টারে এসব অনুষ্ঠান করলে আত্মীয়দের মধ্যে অনেকেই ভাবে—বাড়িতে গিয়ে ভিড় বাড়িয়ে লাভ নেই, অনুষ্ঠানের দিন কমিউনিটি সেন্টারে গিয়ে চারটা খেয়েই চলে আসবো। অথচ এসব অনুষ্ঠানের মানে হলো আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যাদের সাথে অনেকদিন ধরে দেখা হয় না, তাদের সাথে বসে দুঃখ-সুখের গল্প করা। তাই বাড়িতে জায়গা থাকলে কমিউনিটি সেন্টারে এসব অনুষ্ঠান করা উচিত নয়। এটা কায়েছের কথা নয়, ওর বন্ধু লিপনের কথা।

কায়েছ বাচ্চা একটি ছেলেকে ইশারায় ডেকে সালামকে আসতে খবর পাঠালো। অথচ এরকম হবার কথা নয়। এ বাড়িতে ভাবীদের সাথে কিচেনে পর্যন্ত বসে গল্প করেছে সে। বাচ্চাটি সম্ভবত ওর নিজস্ব জগতে চলে গেছে, এজন্য বোধ হয় সালামকে খবর দেয় নি। সে আরেকজনকে পাঠালো।

সালাম এলো। কায়েছকে দেখে প্রথমে বিমানবালাদের মতো হাসলো। তারপরই মুখ কালো করে বললো, 'তুই আসলে একটা মানুষ না...।' সালামকে কথা শেষ করতে না দিয়ে কায়েছ বললো, 'আহা, ফেরেশতা বলিস না। আমি মানুষ হয়ে থাকতে চাই। ফেরেশতা হতে চাই না।' কায়েছের কথা শুনে সালাম হাসলো। তারপর ওকে সাথে নিয়ে ভেতরে সালামের রুমে গিয়ে বসলো। আগে থেকেই সালাম এ রুমে থাকতো। বিয়ের পরও এই রুম। তবে বিয়ের আগে ও পরের রুমে বেশ পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। আগে এ বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে অগোছালো ছিল সালামের রুমটি। রুবিনা, শিবানা অনেকদিনই এ ব্যাপারে কায়েছের কাছে বিচার দিয়েছে।

সালাম ওর স্ত্রীর সাথে কায়েছের পরিচয় করিয়ে দিল। কায়েছ সালামকে জিজ্ঞাসা করলো, 'আমাদের বন্ধুদের মধ্যে আর কে কে এসেছে?'

সালাম বললো, 'তুই ছাড়া সবাই এসেছে।'

'এখন কে কে আছে?'

'দুই-তিনজন আছে।'

'ওরা কোথায়?'

'দক্ষিণের রুমে বসে আড্ডা মারছে।'

'ওখানে চল্।'

সে রুমে এসে দেখতে পেলো বেশ কয়েকজন বসে আছে। পরিচিতদের মধ্যে বদরুল, সহিদ ও বেলাল রয়েছে। এ পাশে সোফায় বসে আছে চারটি মেয়ে। সালাম পরিচয় করিয়ে দিল—চারজনই ওর শ্যালিকা। ওর স্ত্রীর সাথে এসেছে। কায়েছ জিজ্ঞাসা করলো, 'আপন শ্যালিকা কয়জন?'

সালাম এখানে কূটনীতিকদের মতো উত্তর দিল, 'চারজনই আপন শ্যালিকা। কেউ পর নয়।'

পরে অবশ্য কায়েছ জেনেছে একজন মাত্র কনের আপন বোন। বাকি তিনজনের মধ্যে দুইজন কনের খালতো বোন, বাকি একজন চাচাতো বোন।

বদরুল জানতে চাইলো, কায়েছ কেন গতকাল বিয়েতে আসে নি। কায়েছ জানালো, সে ভেবেছিল আজ বিয়ে। আজ তৈরি হবার পর কার্ড দেখে ভুল বুঝতে পেরেছে। এ ব্যাপারে যে সে দুঃখিত, তা-ও বললো।

কনের খালাতো বোন (এখানকার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী) নার্গিস বললো, 'এতো বড় ভুল করেছেন দেখে আমার তো মনে হচ্ছে আপনি হঠাৎ আপনার নামটাও বোধ হয় ভুলে যান।'

কায়েছ হাসলো। তারপর সবাই মিলে আড্ডা দিতে লাগলো।

একটু পর ভাতিজা-ভাতিজিদের দল এলো। সবাইকে চিনতে না পারলেও কয়েকজনকে চিনতে পারলো। তিন বৎসর কম সময় নয়! তিন বৎসর ধরে দেখা হয় নি। গত তিন বৎসরে ওরাও বড় হয়ে গেছে।

ভাতিজা-ভাতিজিদের দল নিশ্চয়ই খবর পেয়েছিল ও এসেছে। তাই ওরা দল বেঁধে এসেছে। তাহলে নিশ্চয়ই এতোক্ষণে অন্যান্যরাও জেনে গেছে। ওরা এসে ধরলো—চকোলেট-চুইংগাম কোথায়? এবার আরেকটি ভুল ধরা পড়লো। তিন বৎসরে সব ভুলে গেছে! সে এখানে আসার সময় একটি চুইংগাম বা চকোলেট বা চিপ্‌সও নিয়ে আসে

নি। কায়েছ জিহ্বায় কামড় দিয়ে স্যরি কেটে বললো, আগামীকাল ওদের জন্য এসব নিয়ে আসবে, এ ভুল আর হবে না। সে দেখলো—সুমা, মাসুম, রুমেল, রোজি বেশ বড় হয়েছে। যাদেরকে ও ন্যাংটা দেখেছিল ওরাও হাফপ্যান্ট পরা শুরু করেছে। নতুন করে সবার নাম জানলো। কে কোন ক্লাসে পড়ছে তাও জানলো। সুমা ও মাসুম অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে। রুমেল নবম শ্রেণীতে। রোজিও অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে তা জানলো। অন্যান্যরা প্রাইমারি স্কুল পার হয় নি। ওরা নিয়মিতই স্কুলে যাচ্ছে।

সুমা এতোক্ষণ কোনো কথা বলে নি। দুম্ করে জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনি এতোদিন আসেন নি কেন?'

কায়েছ জানতো প্রশ্ন উঠবে। কী উত্তর দেবে তা ভেবে রেখেছিল। সুমাকে বললো, 'বাবা, আমাকে তো টিউশনি করতে হয়। সকালে চাকরি খুঁজে বিকেলে টিউশনি করার পর বেড়াতে ইচ্ছে করে না। তাই আসা হয় নি।'

'শিবানা আপার সাথে দেখা হয়েছে?' সুমা জিজ্ঞাসা করলো। কায়েছ আন্দাজ করলো, তিন বৎসর আগে সুমা কতো বড় ছিল। ও কি কিছু টের পেয়েছে, কেন কায়েছ এতোদিন এ বাড়িতে আসে নি? না বোধ হয়। তবে কথা হলো শিবানার সাথে সব সময় সুমাই থাকতো।

এদিকে এরা আলাপ করছে, অন্যদিকে বদরুলরা নার্গিসদের সাথে জমিয়ে ফেলেছে। এ আড্ডার মধ্যমণি যে নার্গিস তা বোঝা যাচ্ছে। নার্গিস খুব সুন্দরী। ও যে সুন্দরী তা নার্গিস জানে, তাই ওর ভাবটা আলাদা ধরনের। টেনে টেনে কথা বলছে। বদরুল ও সহিদ যে নার্গিসের প্রতি মুগ্ধ তা ওদেরকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তবে নার্গিস বোধ হয় ব্যাপারটা পাত্তা দিচ্ছে না। কায়েছ তার এ জীবনে অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেছে। তাদের পাড়ায় বিখ্যাত সুন্দরী যে কজন ছিল তারা ছেলেদেরকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে, কেউ প্রেম করে শেষে প্রতিষ্ঠিত পাত্রকে বিয়ে করেছে। সুন্দরীরা বোকা হয় না। তারা তাদের ভবিষ্যৎ বোঝে। টাকা-পয়সা বোঝে। জানে, টাকা-পয়সাঅলা ছেলেদের সাথে বিয়ে হলে সে শান্তি পাক বা না পাক অন্তত সুখে থাকতে পারবে। ঠিকমতো গহনা-শাড়ি পরতে পারবে। এটাও কায়েছের কথা নয়, লিপনের কথা।

ভেতর থেকে কায়েছের জন্য ডাক এলো। সেখানে গিয়ে দেখলো ভাবীরা সহ আরো কয়েকজন মহিলা আছেন। মেঝো ভাবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী মিয়া, আমাদের বাড়ির পথ ভুলে গিয়েছিলে নাকি?'

কায়েছ হেসে বললো, 'আরে নাহ্ ভাবী।'

'তাহলে ছোট ভাইয়ের কাছে এতো খবর দিয়েছি, তুমি দেখি ছয়-সাত বছরের মধ্যে একদিনও আসো নি। ব্যাপার কী?'

'ছয়-সাত বছর নয়, মাত্র তিন বছর।'

'তিন বছর নাকি! আমার কাছে তো মনে হয় ছয়-সাত বছর।'

বড় ভাবী বললেন, 'ছোট ভাই আমাদের সাথে সে কী তর্জন-গর্জন করলো। সে বলে, আমরা নাকি তোমাকে কঠিন কিছু বলেছি, যার জন্য তুমি আসো নি।'

কায়েছ কথাগুলো আবার বললো, 'ভাবী, সালামকে আমি ব্যাপারটা বলেছি। তারপর ও হয়তো আপনাদের সাথে ফাজলামি করেছে। ভাবী, আপনারা তো জানেন,

আমি চাকরি খুঁজছি, দুই-আড়াই বৎসর ধরে খুঁজছি। পাই নি। আপাতত টিউশনি করছি। চার-পাঁচটা টিউশনি করে ঘরে এসে বাইরে বের হতে ইচ্ছে করে না। আব্বা বেঁচে থাকতে এতো কষ্ট করতে হয় নি। আব্বা মারা যাবার পর বেশ কষ্ট করতে হচ্ছে।'

এতোগুলো কথা বলে কায়েছ থামলো। এখানে সবই সত্যি। টিউশনি করে তা সত্যি, তবে খুব যে কষ্ট হয় তা নয়। সেসব টিউশনি করার পর সে অন্যান্য জায়গায় যায়। শুধু এখানেই আসা হয় না।...কায়েছের এতো কষ্ট করতে হতো না, যদি না ওর আব্বা মারা যাবার পর ওর চাচা ওদের সম্পত্তির অংশ হাতিয়ে নিতেন।

ছোট ভাবী কায়েছের পিঠে চিমটি কেটে বললো, 'কী মিয়া, তুমি রুবিনা বা শিবানা কারো বিয়েতে আসো নি, ছোট ভাই তো দাওয়াত দিয়েছিল। এছাড়া সবচেয়ে বড় কথা হলো, তুমি ছোট ভাইয়ের মেহেদি বা বিয়েতে আসো নি। কেন? সব কেন'র উত্তর চাই।'

ভাবীরা সবাই হেসে উঠলেন। বড় ভাবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'রুবিনা, শিবানাদের সাথে দেখা হয়েছে?' কায়েছ মাথা নেড়ে না করলো। বড় ভাবী বললেন, 'ওরা উত্তরের রুমে আছে। যাও কথা বলে এসো।'

কায়েছ একবার ভাবলো, উত্তরের রুমে যাবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গেলো। গিয়ে রুবিনা ও শিবানাকে পেলো। রুবিনা সালাম দিল, কায়েছ উত্তর দিল। দুজনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'কেমন আছো?'

রুবিনা উত্তর দিল, 'ভালো, আপনি?' শিবানা কথা বলে নি। শিবানার কোলে ছোট্ট বাচ্চা। কায়েছ শিবানার দিকে তাকালো, তারপর জিজ্ঞাসা করলো, 'কী ব্যাপার, কথা বলছো না কেন?'

শিবানা বললো, 'কী বলবো?'

'ভালো আছো কিনা তা জিজ্ঞাসা করছি।'

'ভালো আছি।'

কায়েছ বসে রুবিনাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'ওর শ্বশুর বাড়ি থেকে কে কে এসেছেন?' রুবিনা জানালো, 'ওর শ্বশুর-শাশুড়ি এসেছিলেন গতকাল; বিয়ের পর চলে গেছেন। আগামীকাল সকালে আবার আসবেন। বাড়ি একা, আর ওর বর বাবার সাথে বাজারে গেছেন।'

শিবানাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলো না। কারণ শিবানার অনেক কিছুই ও জানে। ওর শ্বশুর বেঁচে নেই। শাশুড়ি আছেন। ওর বর মিডল-ইস্টে থাকেন। বৎসরান্তে দু মাসের ছুটি পান। দেশে আসেন, থাকেন, তারপর চলে যান।

রুবিনা বললো, 'চাচা শোনেন, আপনার সাথে তো আমাদের অনেক ঝগড়া আছে। ছোট চাচার বিয়ে শেষ হোক, তারপর ঝগড়া করবো।' কায়েছ জিজ্ঞাসা করলো, 'কিসের ঝগড়া, মা?'

'আপনি আমাদের দুই বোনের কারো বিয়েতে আসেন নি। এটা তো ঠিক হয় নি। আপনি আমাদের কী রকম ভালোবাসেন জানি না। আমরা কিন্তু আপনাকে খুব ভালোবাসি।'

ভালোবাসা! এই ভালোবাসাই তো এতোসব কষ্টের মূল। কায়েছ জানে রুবিনার বিয়ের দু মাস পরেই শিবানার বিয়ে হয়েছে।

শিবানা এতোক্ষণ কোনো কথা বলে নি। এবার বললো, 'আমাদের বিয়েতে না আসার জন্য আপনাকে কি কেউ নিষেধ করেছিল?'

শিবানা শুধু এখন নয়, তখন থেকেই ওকে চাচা বলে সম্বোধন করে নি। 'এই যে', 'আপনি', এসব বলেছে ঠিকই, শুধু চাচা ডাকে নি। রুবিনার দিকে তাকিয়ে শিবানা বললো, 'আপা, আমার জন্য দুটো প্যারাসিটামল নিয়ে আয় তো।'

রুবিনা বললো, 'এই ভিড়ের মধ্যে প্যারাসিটামল কোথায় পাবো?'

'মেঝো চাচি-আম্মা বা সেঝো চাচি-আম্মাকে বললেই দেবে।'

'তুই অথৈর দিকে খেয়াল রাখিস।' রুবিনা ওর মেয়ের কথা বলে চলে গেলো। শিবানা কায়েছের দিকে ফিরে বললো, 'তারপর আপনার কী খবর?'

কায়েছ বললো, 'এই তো চলে যাচ্ছে।' বলে একটু থামলো। তারপর যোগ করলো, 'বাচ্চার নাম কী রেখেছো?'

'সাগর।'

কায়েছ হাসলো, তবে হাসিটা যে বোকার মতো হয়েছে তা বুঝতে পারলো। সে মন থেকে চাইছে রুবিনা যেন তাড়াতাড়ি প্যারাসিটামল নিয়ে চলে আসে। কতোক্ষণে প্যারাসিটামল পাবে কে জানে?

কায়েছ যখন সালামের সাথে এ বাড়িতে আসা-যাওয়া করতে করতে ঘনিষ্ঠ হয়েছে, তখন ও খেয়াল করে দেখলো—অন্যসব ভাতিজা-ভাতিজিদের মতো শিবানা ওর পাশে ভিড় করে থাকে না ঠিকই, তবে আড়াল থেকে দেখে, চোখে চোখ পড়লেই সরে যায়। ছোট থেকেই শিবানা কঠিন প্রকৃতির মেয়ে। রুবিনা বড় হলে কী হবে, ও শিবানার রাগকে ভয় পায়।

একদিন শিবানা সুমাকে দিয়ে কায়েছকে ঘাটপাড়ে যেতে খবর পাঠালো। খবরটা সুমা চুপিচুপিই দিয়েছিল। কায়েছ ভেবেছিল, শিবানা বোধ হয় রুবিনার বিরুদ্ধে কোনো বিচার দিবে বা সালামকে বলার জন্য কোনো কথা বলবে, যা অন্যদের সামনে বলতে পারছে না। আগেও এরকম হয়েছে, সালামের কাছে সরাসরি যা বলে নি তা কায়েছকে দিয়ে বলিয়েছে।

কায়েছ ঘাটপাড়ে যাবার পর শিবানা একটি খাম দিয়ে বলেছিল সে যেন বাসায় গিয়ে ওটি খোলে। কায়েছ জিজ্ঞাসা করেছিল, 'খামারে ভেতর কী আছে?' শিবানা বলেছিল, 'ও খাম খুললেই পেয়ে যাবেন।' ডানে বামে কোনো সন্দেহ না করে কায়েছ খামটি নিয়েছিল। বাড়ি এসে খামটি খোলার পর চিঠিটি পেয়েছিল। তখনো সেটিকে ভালোবাসার চিঠি বলে সন্দেহ করে নি। চিঠিটি পড়ার পর হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। চিঠিতে লেখা ছিল কায়েছ যেন পরদিন চিঠির উত্তর দেয়।

কায়েছ পরদিন সালামদের বাড়িতে গিয়ে সুমাকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে শিবানাকে ঘাটপাড়ে ডেকে নিয়েছিল। বলেছিল, 'আমি যে তোমার চাচা হই, তা কি তুমি জানো?' শিবানা বলেছিল, 'চাচার বন্ধু হোন। আপনি তো আমাদের রক্ত সম্পর্কের চাচা নন।' কায়েছ বলেছিল, 'তোমার সাথে আমার ভালোবাসার সম্পর্ক হতে পারে না।' শিবানা চোখ তুলে বলেছিল, 'কেন, সম্পর্কে চাচা হোন বলে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার সাথে ছোট চাচার পরিচয় না হয়ে আমার সাথে আপনার পরিচয় হলে তো আপনি আমার বন্ধু হতেন। শুধু চাচার সাথে আপনার বন্ধুত্ব হয়েছে বলে আপনাকে চাচা বলে মানতে বাধ্য নই।'

শিবানা যুক্তি দেখিয়েছিল। তখন কায়েছ বলেছিল, 'আমি তোমাকে মেয়ের মতোই দেখি। আমি যদি তোমাকে ভালোবাসি তাহলে যে-ই শুনবে সে-ই ছিঃ ছিঃ করবে। এবং লোকজন চাচা-ভাতিজির সম্পর্ককে আর বিশ্বাস করবে না।' শিবানা বলেছিল, 'আমি তত্ত্বকথা শুনতে চাই না। আমি চাই—আপনি বলুন, আমাকে বিয়ে করবেন।' কায়েছ বলেছিল, 'তা সম্ভব নয়। তুমি যদি এসব কথা বলো...।' কায়েছ কথা শেষ করে নি, শ্রাগ করেছিল। শিবানা বলেছিল, 'আপনি তো জানেন না, আপনার সাথে বিয়ের পর আমাদের ছেলে হলে নাম রাখবো সাগর। মেয়ে হলে নদী রাখবো—তাও ঠিক করে রেখেছি।' কায়েছ হতভম্ব হয়ে বলেছিল, 'এসব কী বলছো?' এবং তারপরই কায়েছ ঠিক করেছিল সালামদের বাড়িতে আর আসবে না। শেষে কোনো একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে। শিবানাদের বিয়ের পরও সে আসে নি। কারণ ওর ভয় ছিল, কায়েছ এ বাড়িতে আসার পর যদি কাকতালীয় ভাবে শিবানাও এসে পড়ে, আর পাগলামি করে! এই ভয়েই কায়েছ তিনটি বৎসর আসে নি।

শিবানা কায়েছের একেবারে কাছে এসে বসলো, তারপর বললো, 'ছেলের নাম সাগর রেখেছি। মেয়ে হলে নদী রাখবো।' কায়েছ বললো, 'তুমি আসলে একটু বোকাই রয়ে গেছো।' শিবানা বললো, 'আপনার মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে যাবেন প্লিজ।' কায়েছ বললো, 'আমার তো কোনো মোবাইল নেই।' কায়েছ মিথ্যে বললো। শিবানা বললো, 'এখন তো মোবাইল খুব সস্তা হয়ে গেছে। আমি যদি আপনাকে একটি মোবাইল গিফ্‌ট করি, তাহলে রাগ করবেন না তো?' কায়েছ কঠিন স্বরে বললো, 'আমার মোবাইলের খুব প্রয়োজন পড়ে না। প্রয়োজন পড়লে ফোন-ফ্যাক্সের দোকান থেকে ফোন করে নিই।' শিবানা নিচু কণ্ঠে বললো, 'বিয়ে হয়ে গেছে বলে ভাববেন না আপনাকে আমি ভুলে গেছি।' ফ্যাকাশে হাসি হেসে কায়েছ বললো, 'তুমি কি চাও, আমি ওয়ালিমাতেও না আসি?' একটু থেমে যোগ করলো, 'বিয়ে হয়েছে, এবার সংসারে মন দাও।'

চার

কায়েছ ওর মার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'কিছু বলবেন?'

মা হেসে ওর পাশে বসলেন। ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর মোবাইলে ক্রেডিট কি আছে?'

কায়েছ এই ভয়টাই করেছিল। তার বোন স্বামীর সাথে কাতার থাকেন। বোনজামাই দেশে এসে কায়েছকে ডিভিডি কিনে দিয়েছিলেন। যাবার সময় তিনি তাঁর ব্যবহার করা মোবাইল সেটটি দিয়েছিলেন কায়েছকে ব্যবহার করার জন্য। কায়েছকে

মোবাইল কার্ড কেনার জন্য মা-ই টাকা দেন, প্রতি মাসে একবার। মাসের শেষ দিকে এসে মা জিজ্ঞাসা করবেন মোবাইলে ক্রেডিট আছে কিনা।

কায়েছ বললো, 'আছে কিছু।'

'কতো?' মা জিজ্ঞাসা করলেন।

'কুড়ি টাকার মতো।'

মা হেসে তিনটি একশত টাকার নোট দিলেন কার্ড কেনার জন্য। মার কাছ থেকে মোবাইলের কার্ড কেনার জন্য টাকা নিতে কায়েছের অস্বস্তি লাগে।

কায়েছ পাশ করার পর চাকরি খুঁজছে। চাকরি না পেয়ে টিউশনি করতে শুরু করেছে। প্রতিদিন পাঁচটা টিউশনি করে। যা রোজগার হয় খারাপ না। ওর সিগারেট-পান-সুপারির নেশা নেই। এসব নেশা না থাকায় ভালোই হয়েছে। ধুমপান নিয়ে যে আইন হয়েছে তাতে দেশের চেইন স্মোকারদের কথা ভাবলে কষ্টই হয়। ওর নেশার মধ্যে একটি হলো ভালো ছবি কালেকশন করে সেগুলো দেখা, কায়েছের মা এসব জানেন।

কায়েছ টিউশনি করে যা পায় তা থেকে সামান্য কিছু টাকা রেখে বাকি টাকা মাকে দিয়ে দেয়। বাবা মারা যাবার পর থেকে মা অনেক কষ্ট করে সে ও তার বোনের পিছনে টাকা খরচ করেছেন। বাবা মারা যাবার পর ওর চাচা ওদের সম্পত্তির বেশিরভাগটুকুই হাতিয়ে নিয়েছেন। বাকি সামান্য অংশের জন্য ওর চাচা ওর মাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, মা তা মেনে নেন নি। ছেলে-মেয়ে দুটিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন।

নিজের দেয়া টাকা থেকেই মা টাকা দেন। তারপরও সে টাকা নিতে কায়েছের অস্বস্তি লাগে।

কিছুক্ষণ পর কায়েছ বের হলো। এখন টিউশনিতে যাবে, প্রথমে তিন্নিদের বাসায়। ও অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে। কায়েছ ওর টিউশনির জীবনে যে কজন ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়েছে তার মতে তিন্নি তাদের মধ্যে সেরা তিন জনের একজন। তিন্নি বৃত্তি পরীক্ষাও দিবে। কায়েছের দৃঢ় বিশ্বাস সে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পাবে।

কায়েছ রুমে ঢোকার পর তিন্নি হেসে সালাম দিল। কায়েছ সালামের জবাব দিয়ে পড়াতে লাগলো।

তিন্নিকে পড়ানো শেষ করে কায়েছ রাখীদের বাসায় গেলো। ওদের বাসা দেখেই বোঝা যায় রাখীরা খুব বড়লোক। ওর বাবার কয়েকটি ব্যবসা আছে। ও এ বৎসর দশম শ্রেণীতে পড়ছে। এ বাসায় যে ব্যাপারটি কায়েছের কাছে মজার তা হচ্ছে—যেদিন রাখীর বাবা বাসায় থাকেন না সেদিনের নাস্তাটা বেশ ভালোই আসে। আর যেদিন বাসায় থাকেন সেদিন সস্তা ধরনের নাস্তা আসে। এতোদিন ধরে রাখীকে পড়ানোর ফলাফল হলো—নাস্তা দেখেই বোঝা যায় এখন বাসায় রাখীর বাবা আছেন কি নেই। রাখীর বাবার সাথে কায়েছের বেশ কয়েকবার কথাও হয়েছে। ভদ্রলোক ব্যবসা খুব ভালো বোঝেন। টেবিলে বসার পর রাখী বললো, 'স্যার, বাপী আপনাকে দেখা করে যাবার জন্য বলেছেন।' কায়েছ বললো, 'তিনি এখানে আসবেন?'

'জি না। পড়ানো শেষ হলে বাপীর রুমে আপনাকে নিয়ে যাবো।'

'ঠিক আছে। এমনি, না কোনো কাজে?' জিজ্ঞাসা করার পর মনে হলো রাখীর বাপী এমনি ডেকে কয়েকদিন কথা বলেছেন।

রাখী বললো, 'আমাকে বলেন নি।'

কায়েছ পড়াতে শুরু করলো। রাখী পড়ালেখায় ভালো না হলেও একেবারে মন্দ নয়। তবে পড়ালেখার চেয়ে বন্ধুবান্ধবদেরকে নিয়েই ও বেশি সময় কাটাতে চায়। বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কী করে মজা করে তার বর্ণনা রাখী পড়ার মধ্যখানেই বলে ফেলে। 'ওকে, পড়া শেষ করে শুনবো।' বললে রাখী বলে, 'পড়া শেষ হবার পর তো আপনার মন থাকবে চলে যাবার দিকে। আমার বলা গল্পের দিকে মন থাকবে না।' অকাট্য যুক্তি। তাই ওকে শুনতে হয়।

রাখীকে কায়েছ প্রায় তিন বৎসর ধরে পড়াচ্ছে। এই সময়ের ভেতর রাখী তার টিচারকে দুই নববর্ষ, দুই ঈদ ছাড়াও টিচারের জন্মবার্ষিকী ও সেন্ট ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে কার্ড দিয়ে উইশ করেছে। কায়েছ অনেকবারই বলেছে, 'এসব করো না। এসএসসি-তে এ প্লাস পাও তাহলেই হবে।' উত্তরে রাখী বলেছে, 'এসএসসি তো অনেক দূরে। তাই কয়েকটি স্পেশাল দিনে শুধু আপনাকে উইশ করি। এখানে আর কিছু নেই। আপনি না করলেও শুনবো না। তখন কী করবেন? থাপ্পড় মারবেন?'

পড়ানো শেষ হবার পর রাখী ওর বাপীকে বলে এলো। তারপর বাপীর রুমেই কায়েছকে নিয়ে গেলো। বাপী ওকে চলে যাবার জন্য ইশারা করলেন। রাখীর বাপী মানিক সাহেব কায়েছকে বললেন, 'আপনাকে একটি বিষয়ের জন্য ডেকেছি।'

'জি বলুন।' কায়েছ বললো।

'বিষয়টি হলো, আমি নতুন একটি ব্যবসা করতে চাই। এ ব্যবসাটা আপনি দেখবেন।'

'কী ব্যবসা?'

'কোচিং ব্যবসা। কোচিং একাডেমি খুলবো। আপনি থাকবেন হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট। কতোজন টিচার জোগাড় করতে হবে, কী কী করতে হবে তা আপনিই ঠিক করবেন।'

'এখন তো ছেলেমেয়েরা কোচিং একাডেমিতে তেমন একটা পড়াতে চায় না। সাধারণত যার যার স্কুল-কলেজের টিচারের কাছেই প্রাইভেট পড়াটা সেরে নেয়।'

মানিক সাহেব হেসে বললেন, 'সে ব্যাপারটাও আমি ভেবেছি। ছাত্র-ছাত্রীরা আমাদের কোচিংয়ে আসবে কেন?

'খুব ভালো টিচার নিয়ে একাডেমিটা খুলবেন?'

'আরে নাহ্, শুধুমাত্র এটা নয়। ভালো টিচার তো অবশ্যই থাকবেন। এর মধ্যে থাকবে বিজ্ঞাপন।'

'বিজ্ঞাপন?'

'হ্যাঁ, বিজ্ঞাপন। আমরা বিজ্ঞাপনে যতো টাকা ঢালবো তার তুলনাই হতে পারে না। কিছুদিন আগে কী একটা বিজ্ঞাপনে দেখেছিলাম, বিজ্ঞাপন না দিলে ব্যবসা করা মানে অন্ধকার ঘরে কোনো সুন্দরী নারীর দিকে তাকিয়ে হাসি দেয়া একই কথা। পৃথিবীর সব জায়গায় পণ্য বিক্রি হয় বিজ্ঞাপনের জোরে। মান যে ভালো সেটা তো ক্রেতাকে জানাতে হবে। সেটা জানানোর উপায় হলো বিজ্ঞাপন দেয়া। দেখে থাকবেন,

টেলিভিশনে যে সাবানটির কমার্শিয়াল বেশি দেয়া হয়, সেটা দেখে পাবলিকের ব্রেইন ওয়াশ হয়ে যায়। তখন দোকানে গিয়ে র‍্যাকে অন্যান্য সাবানের পাশাপাশি কমার্শিয়ালে দেখা সাবানটি দেখলেই ওটি কিনে ফেলি। বিজ্ঞাপনের জোরে পণ্যটির বিক্রি শতকরা চল্লিশ ভাগ বেড়ে যায় বলে আমার ধারণা।'

কথাগুলো বলে মানিক সাহেব থামলেন। কায়েছ তার কলেজের প্রথম বর্ষে ফিরে গেছে, যেন মুগ্ধ হয়ে লেকচারারের লেকচার শুনছিল। মানিক সাহেব থামার পর কায়েছ বললো, 'আর কী স্পেশালিটি থাকবে?'

'টিচারদেরকে বলা থাকবে, দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদেরকে একটু আলাদা চোখে দেখে সবল করে তুলবেন। দুর্বলকে সবল করতে না পারলে একজন শিক্ষকের শিক্ষকতা করার কোনো মানেই হয় না।'

'এমনও ছাত্র-ছাত্রী আছে যাদেরকে টিচার গুলিয়ে খাওয়ালেও সে যেমন ছিল তেমনই থাকবে।'

'এটাই তো আমাদের পয়েন্ট। আমরা টিচারকে গুলিয়ে খাওয়াবো না। পড়ালেখায় মনোযোগী হবার জন্য যা যা করা প্রয়োজন তা করবো। প্রয়োজন হলে লাভের এক অংশ দুর্বলদের পিছনে ঢেলে দেখবো। তবুও তাদেরকে পড়ালেখায় মনোযোগী হতে বাধ্য করবো। আর মনোযোগী করতে পারলে তার পাশ করা কেউ ঠেকাতে পারবে না। খটমট করে দুই ঘণ্টা না পড়িয়ে পড়ার মাঝে দশ মিনিট বিরতি দিয়ে বিনোদনের ব্যবস্থা করলে ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ বাড়বে এবং একঘেঁয়েমি কমবে। একাডেমির বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কোনো তারকাকে আমন্ত্রণ করা হবে। সে অনুষ্ঠানে এই ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরাও নিমন্ত্রিত হবেন।'

'এখানে আমাকে কী করতে হবে?'

'আপনাকে কোচিং একাডেমির সবকিছু সামলাতে হবে। এ ব্যবসা আপনার ওপর ছেড়ে দেবো। ব্যবসা বলেছি বলে রাগ করবেন না। ভালো নীতিতে থেকে ব্যবসা করা তো খারাপ না। আপনার সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছি। রাখীও আপনার সম্পর্কে সব বলেছে। আপনার চাচা আপনাদের সাথে যে অবিচার করেছেন তা-ও জেনেছি। আপনি কী রকম মানুষ তা-ও জেনেছি। লেখাপড়ার প্রতি আপনার যে দরদ, সে দরদ থাকলে আমাদের একাডেমি উত্তরোত্তর সাফল্য পাবে বলেই আমার বিশ্বাস। কাজটা করতে রাজি আছেন?' কায়েছ কয়েক সেকেন্ড কথা বলতে পারলো না। শেষে জিজ্ঞাসা করলো, 'আমাকে এতো বিশ্বাস করছেন, যদি বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে না পারি?'

'তাহলে মনে করবো ব্যবসা সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতাই আমার নেই।'

'ভাবার জন্য আমাকে কিছু সময় দিতে হবে। আমি সামলাতে পারবো কিনা তা বুঝতে পারছি না।'

'খুব বেশিদিন নিবেন না।'

'আমি বলছি না যে এ দায়িত্ব নেবো। যদি এ দায়িত্ব নিই তাহলে কে কে টিচার হিসেবে থাকবেন সেটা বেছে নেবার দায়িত্বটা আমিই নেবো।'

'আপনাকে তো বললামই, কোচিং একাডেমির সব দায়িত্ব আপনাকেই দেবো। এর লভ্যাংশ থেকে একটা পার্সেন্টেজ আপনার। সব আপনার দায়িত্বে থাকবে, শুধু বিজ্ঞাপনের দিকটা আমি নিজে দেখবো।'

এতো বড় সুযোগ পাচ্ছে তা কায়েছ বিশ্বাস করতে পারছে না।

রাখীদের বাসা থেকে বের হবার পরই কায়েছ শুনতে পেলো মাইকে একটি মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করা হচ্ছে। মাইকে অনেক কিছু প্রচার করা হয়। হারানো সংবাদ, সিনেমার সংবাদ, ওষুধের ব্যবসার সংবাদ, ইত্যাদি। সবকিছুর মধ্যে মৃত্যু-সংবাদটা মাইকে ঘোষণা করামাত্র বুকে বাজে। আহারে, পৃথিবী থেকে আরো একজন চলে গেলো!

পাঁচ

শান্তা সামিউলের চিঠি খুললো। একটু আগে পিয়ন এসে দিয়ে গেছে। খুলে পড়তে শুরু করলো। সামিউল লিখেছে, আগামী মাসে সম্ভবত ওর একটি চাকরি হয়ে যাবে, শান্তা যেন ওর জন্য দোয়া করে। চাকরি হয়ে গেলে প্রথম দিকে বেশ কিছুদিন ওকে ব্যস্ত থাকতে হবে। নতুন ভুবনকে বুঝে নিতে হবে। তাই সামিউল ঠিক করেছে, এ মাসের মধ্যেই সে শান্তাদের এখানে বেড়াতে আসবে। কবে আসবে তা সে ফোন করেই জানিয়ে দিবে।

চিঠি পড়ে শান্তার বেশ ভালো লাগলো। সামিউলের চিঠি পড়তে বরাবরই ওর খুব ভালো লাগে। চিঠির মধ্যে সে মজার মজার ঘটনা লিখে পাঠায়। এসব পড়ে শান্তা চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিল, সে কেন লেখালেখির জগতে প্রবেশ করছে না। সামিউল উত্তর দিয়েছিল—সবাই লেখক হলে পাঠক কে হবে? তার চেয়ে এই ভালো।

কিছুদিন আগে সামিউল একটা চিঠিতে বাংলাদেশের একশততম ওয়ানডে ক্রিকেট ম্যাচের কথা লিখে পাঠিয়েছিল।

'২৬ ডিসেম্বর ২০০৪-এ বাংলাদেশ-ইনডিয়ার মধ্যে ওয়ানডে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথমে ব্যাট করে বাংলাদেশ করে ৯ উইকেটে ২২৯। বাংলাদেশ ১২০ রান করলেও আমি আশায় থাকি বাংলাদেশ লড়াই করবে (কিন্তু বাস্তবে এরকম হয় নি), লড়াই করেই হারবে। এক সময় বাংলাদেশের রানের জবাবে ইন্ডিয়া করলো ৬ উইকেটে ১৭০। রফিকের বোলিংয়ে কাইফকে রান আউট করলেন রাজিন সালেহ। ফলাফল ১৭০/৭। আমরা উল্লাসে ফেটে পড়লাম। মনে হলো জয় আমাদের দেশের দরজায় এসে নক করছে...তারপর রফিকের বলে আগারকারের ক্যাচ ধরলেন আফতাব। দর্শকরা (টিভির পর্দায়) উল্লাসে ফেটে পড়লেন। তারপর বোলিংয়ে এলেন খালেদ মাহমুদ (চাচা)। উনার বোলিং দেখতে আমার বেশ মজা লাগে। ২০৪/৮ যখন হলো, তখন মাহমুদের বলে মাশরাফি ক্যাচ নিয়ে জহির খানকে আউট করলেন। শেষ উইকেটে আফতাব যখন মুরালিকে রান-আউট করলেন, তখন এতো আবেগ-প্রবণ হয়েছিলাম যে ইচ্ছে হয়েছিল দৌড়ে ঢাকা স্টেডিয়ামে ছুটে যাই। বাংলাদেশ এই প্রথম দেশের মাটিতে ওয়ানডে ম্যাচে জয়লাভ করলো। এটি বাংলাদেশের ১০০তম ওয়ানডে ম্যাচ ছিল। সবচেয়ে খারাপ লাগে যখন দেখি উপস্থাপক বাংলাদেশের অধিনায়ককে ইংরেজিতে প্রশ্ন করলে উনি ভালো করে ইংরেজিতে উত্তর দিতে পারেন না। ক্রিকেটের

উপস্থাপক তো সাধারণত কয়েকটি কমন প্রশ্ন করেন। সেসব প্রশ্নের উত্তর একটু ভালো করে মুখস্থ করে এলেও বাইরের দেশে আমাদের দেশের মান বাড়বে।'

শান্তা রাহেনার কাছে গেলো। বললো, 'আপা, সামিউলের চিঠি এসেছে। ও এখানে আসছে।'

রাহেনা বললো, 'ও তো বরাবরই বলে আসছে, আসবে। কিন্তু আসে না তো।'

'এবার লিখেছে, এ মাসের ভেতরই আসবে।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

'তাহলে তো প্রস্তুতি নিতে হয়।'

'কিসের প্রস্তুতি?'

'তোর পত্রমিতাটি এতোদূর থেকে আসছে, তাকে তো আমাদের এখানকার সুন্দর জায়গাগুলো দেখাতে হয়। কী কী দেখাবো তার তালিকা তৈরি করে রাখবো।'

শান্তা ওর বাবার জন্য অপেক্ষা করলো। বাবাকে এ খবরটা দিতে হবে। অপেক্ষার সময় কাটতেই চায় না। সে সামিউলের চিঠির উত্তর লিখতে বসলো। জানালো, ও আসছে শুনে ওর ভালো লাগছে, ও এলে পরিবারের সবাই খুশি হবে।

শান্তা ওর বাবা-মাকে ওর সবচেয়ে ভালো পত্রমিতাটির কথা অনেক আগেই বলেছে। পত্রমিতাটি যে শান্তাকে ওদের ওখানে যাবার নিমন্ত্রণ করেছে তা-ও বলেছে। বাবা তো বলেছেন, ও আগে আসুক, তারপর সময় করে শান্তাকে নিয়ে সবাই যাবেন, বেড়িয়ে আসবেন। শান্তা পত্রমিতার বেশ কিছু গল্প বাসায় বলেছে। রাহেনাকে তো প্রায় সবই বলেছে। কিন্তু রাহেনাকে যা সে বলে নি তা হলো—সামিউল গালে টোল পড়া মেয়েদেরকে খুব ভালোবাসে। ওর প্রেমিকা আছে। কিন্তু ও টোল পড়া মেয়েকে বিয়ে করবে। শান্তা জিজ্ঞাসা করে নি, তাহলে ওর প্রেমিকার স্থান কোথায় হবে? মজা ভেবে এ বিষয়ে কথা হয় নি।

শান্তা ভয়ে ভয়ে আছে। বাবা বিশ্রাম নেবার পর সে তাঁকে সামিউলের কথা বললো। বাবা এডভোকেট খালেক সাহেব বললেন, 'তাহলে তো ভালোই হলো। এখানে তো ওর কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই, তাই না?'

'জি না, নেই।' শান্তা বললো।

'তাহলে ওকে বলে দাও, এখানে এসে ও আমাদের বাসায় থাকবে।'

'ঠিক আছে, লিখে দেবো। যদিও চিঠির উত্তর লিখে ফেলেছি, কিন্তু খামের মুখ বন্ধ করি নি। আপনি সকালে যাবার সময় চিঠিটি নিয়ে যাবেন।'

বাবা মেয়ের দিকে তাকালেন। বাবা জানেন, মেয়ে প্রায় প্রতিদিন এই সময় এসে তাঁকে বিভিন্ন কথা জিজ্ঞাসা করে, আলোচনা করে। এদের বেশিরভাগই আইন সম্বন্ধীয়। বাবাও তাঁর সাধ্যমতো মেয়েকে জানান। বাবা আইনের বই থেকে, কখনো পত্রিকার পাতা থেকে পড়া বিষয়টি মেয়েকে জানান।

বাবার সাথে বেশ কিছুক্ষণ আইন-বিষয়ক আলাপ করে শান্তা ওর রুমে চলে এলো। এসে সামিউলের চিঠির বান্ডিল নামালো। মাঝেমধ্যে এরকম করে। বই-টই পড়তে ভালো না লাগলে সামিউলের চিঠি পড়েই সময় কাটায়। এই অভ্যাস রাহেনা জানে।

চিঠির বান্ডিল থেকে একটি চিঠি বের করে পড়তে লাগলো শান্তা। পড়া শেষে চিঠিটি খামের ভেতর ঢুকিয়ে রাখলো। আরেকটি খাম থেকে আরেকটি চিঠি বের করলো। এভাবে বেছে বেছে চিঠি পড়তে লাগলো। সময় ভালোভাবেই কাটছে।

ছয়

কায়েছ লিপনকে বললো, 'আমরা একটা কোচিং একাডেমি খুলবো। তুই কি আমাদের সাথে কাজ করতে আগ্রহী?'

'আমরা বলতে কারা?' লিপন জিজ্ঞাসা করলো।

'আমি, তুই, এখলাছ স্যার, শিউলি।'

'এখলাছ স্যার রাজি হয়েছেন?'

'হ্যাঁ। স্যার স্কুলের চাকরি ছেড়েছেন এক বৎসর হলো। স্যারকে আমাদের উদ্দেশ্য বলার পর উনি রাজি হয়েছেন।'

'স্যার কোনো প্রশ্ন করেন নি?'

'অনেক প্রশ্ন করেছেন।'

এখলাছ স্যার শ্যামরার বাজার স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। সেখানে হেডটিচারের সাথে তাঁর ঝামেলা বাঁধে। স্যার চাকরি ছেড়ে দেন। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি ও ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক অনুরোধ করেছেন। স্যার শোনেন নি। তাঁর কথা হলো—নীতি বিসর্জন দিয়ে চাকরি করবো না। স্যার চাকরি ছেড়ে দেবার পরও ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর কাছে প্রাইভেট পড়তে এসেছে। স্যার বেছে বেছে মাত্র কয়েকজনকে পড়িয়েছেন। স্যারের সাথে হেডটিচারের কী হয়েছিল সে ঘটনা অনেকেই জানে না। হেডটিচারের দুই আপন ভাতিজার পরীক্ষার পেপার এখলাছ স্যারের কাছে পড়েছিল। এখলাছ স্যারকে বলা হয়েছিল, তিনি যেন ওদের প্রত্যেকেকই সত্তর মার্ক করে দিয়ে দেন, বাদবাকি হেডটিচার নিজেই সামলাবেন। এখলাছ স্যার হেডটিচারের কথা মেনে নেন নি। মেনে নিতেও পারেন না। কারণ, ওদের দুজনের একজন অংকে মাত্র ২৫, অন্যজন ১৭ নম্বর পেয়েছিল। এটা যে সম্ভব না তা এখলাছ স্যার জানালেন। ফলে তর্কাতর্কি শেষে নীতির কাছে হার না মেনে চাকরি ছেড়েছেন এখলাছ স্যার। চাকরি না ছেড়েও পারতেন। কিন্তু তিনি দেখলেন, এই ঘটনার পর স্কুলে থাকলে হেডটিচার তাঁর ক্ষমতা দেখিয়ে স্যারের ভুল-ত্রুটি ধরবেন। শেষে ঝামেলা আরো বাড়বে। তারচেয়ে এই-ই ভালো।

যারা এখলাছ স্যারের কাছে অংক করেছে তারা জানে তিনি কতো দরদ দিয়ে অংক বোঝান। দরদটাই আসল কথা।

কায়েছ লিপনকে বললো, 'বেতন কী রকম হবে?'

'বেতন ভালো থাকবে। এখন তো ছয়টি টিউশনি করছিস। তখন কিন্তু সেগুলো করতে পারবি না। এ ব্যাপারে আমাদের কোচিং সেন্টার কোনো কম্প্রোমাইজ করবে না। একমাত্র শর্ত হলো, কোচিং একাডেমিতে যোগ দিলে আলাদা করে টিউশনি করতে পারবি না।'

'তোর কথা শুনে তো আমার খারাপ লাগছে না।'

'তাহলে তুই আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছিস?'

'ধর্, আমি আমার প্রাইভেট টিউশনিগুলো ছেড়ে একাডেমিতে চাকরি নিলাম, কিন্তু দুমাস পর একাডেমি আমাকে রিজাইন দিতে বললো, তখন কী হবে?'

'সে ব্যবস্থাও আছে। শর্ত থাকবে, প্রথম দুই বৎসর পর কোনো টিচার চাইলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। তবে চাকরি ছাড়তে চাইলে তিনমাস আগে কর্তৃপক্ষকে বিকল্প ব্যবস্থা করার জন্য বলতে হবে।'

'আমি কয়েকটা দিন সময় চাই।'

'একটু তাড়াতাড়ি ভাববি। হাতে বেশি সময় নেই।'

কায়েছ লিপনের বাসা থেকে বেরিয়ে এলো। টিচার কালেকশন করার কাজটি ভালোই লাগছে। মোবাইলে সময় দেখলো। আজ বিশ তারিখ নয়। তারপরও জেসমিনের সাথে দেখা করার জন্য পান্না ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সে জায়গামতো গেলো। ওর হাতে জেসমিনের জন্য একটি প্যাকেট রয়েছে।

কিছুক্ষণ পর জেসমিন ও পান্না এলো। কায়েছ বললো, 'চলো, কফি খেতে যাই।'

জেসমিন হেসে বললো, 'আজকে খুব ভালো মুডে আছো মনে হয়।'

'তোমার কাছে এলে আমাকে কখনো খারাপ মুডে থাকতে দেখেছো?'

'আরে সে কথা না। তুমি যেভাবে পান্নাকে বলেছো, আজ যেন অবশ্যই দেখা করি, আমি তো ভেবেছিলাম কোনো স্যাড নিউজ আছে। তা না, এখন কফি খাওয়াতে চাইছো।'

কায়েছ হেসে বললো, 'স্যাড নিউজ দিতে হলে কফি খায় নাকি!'

পালটা হেসে জেসমিন বললো, 'তোমার কি মনে হয় কোল্ড ড্রিংকস কেউ খায়?'

পান্না বললো, 'কোন রেস্টুরেন্টে যাবে, চলো।'

তিনজন দুটো রিকশায় করে রওনা হলো। মিনিট পাঁচেক পর রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসলো। কায়েছ নুডুল্‌সের অর্ডার দিতে দিতে জানালো, 'আমি কয়েকদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি।'

জেসমিন জিজ্ঞাসা করলো, 'দেশের বাইরে?'

'আরেন্নাহ্, এ জেলার বাইরে।'

'ঢাকা?'

'না। আরেক জেলাতে। তুমি নিশ্চয়ই পান্নার কাছ থেকে শুনেছো যে আমি একটা কোচিং একাডেমির দায়িত্ব নিয়েছি। শুনেছো?'

'হ্যাঁ, পান্না বলেছে।'

'তুমি কি এই কোচিং একাডেমিতে যোগ দিতে চাও?'

সময় না নিয়েই জেসমিন বলল, 'না।'

'না কেন? তুমি চাকরি করবে না?'

'চাকরি করবো না কেন? অবশ্যই করবো। পড়ালেখা শেষ করে চাকরি করবো।'

পান্না বললো, 'জেসমিন চাকরি করবে, তার একটি কারণ আছে।'

'কী?' কায়েছ জিজ্ঞাসা করলো।

জেসমিনই বললো, 'লেখাপড়া শেষ করে চাকরি ধরবো। তারপর বিয়ে করবো। চাকরি করলে শাশুড়ি যখন-তখন কোনো কাজের হুকুম করতে পারবেন না। অফিসে যাবার আগে আমি টুকটাক কাজ সেরে নেবো। অফিস থেকে আসার পরই শাশুড়ি যাতে কাজের কথা না বলেন, সেটা উনাকে আগেই বলে রাখবো।'

শাশুড়িকে নিয়ে এরকম করে কথা বলাটা কায়েছের ভালো লাগলো না। কায়েছ বললো, 'আজকাল খুব বেশি হিন্দি সিরিয়াল দেখতে শুরু করেছো নাকি?'

'একথা বলছো কেন?'

'কারণ, বেশিরভাগ হিন্দি সিরিয়ালেই দেখা যায় বউয়ের সাথে শাশুড়ির সম্পর্ক ভালো নয়, ঝগড়া লেগেই থাকে। তা দেখে দেখে দর্শকদের ব্রেইন ওয়াশ হয়ে যায়।'

'বাংলা সিরিয়াল-নাটকে এরকম দেখা যায় না?'

'দেখায়, তবে এতোটা ফালতুভাবে না।'

পান্না বললো, 'কী শুরু করলে, ঝগড়া করবে নাকি? কী জন্য ডেকেছো ওকে বলো।'

কায়েছ বললো, 'আমি চার-পাঁচ দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি। ফিরে এসে কোচিং একাডেমির কাজ শুরু করবো। সবকিছু ঠিক করেই যাবো। জেসমিন, তুমি যদি এখানে যোগ দিতে চাও, যোগ দিতে পারো। আমরা ছয়জন টিচার নেবো। চারজন যোগাড় হয়েছে। একাডেমির জন্য দরদ থাকবে, ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দরদ দিয়ে পড়াবে, এরকম টিচার আমরা নেবো।'

কায়েছ থামলো। জেসমিন বললো, 'তোমার একাডেমির কথা বাদ দাও। আমার বিশ্বাস আছে, তুমি যা করবে সব তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যই করবে। একাডেমি থেকে তুমি উপকৃত হবে। তোমার ছাত্র-ছাত্রী বাড়বে, শেষে দেখবে এমন জনপ্রিয়তা বাড়বে যে, মাসের বিশ তারিখ এলে আমি ও পান্না জায়গামতো এসে বসে থাকবো, কিন্তু তোমার পাত্তা থাকবে না।'

জেসমিন হেসে হেসেই কথা বলছে। কায়েছকে জিজ্ঞাসা করলো, 'গত বৃহস্পতিবার কী ছবি দেখেছো?'

কায়েছ বললো, 'The Postman.'

'কাহিনীটা কী, বলা যায়?'

'অবশ্যই। আইল্যান্ডে বসবাসরত মানুষদের প্রধান ব্যবসা হলো ফিশিং ব্যবসা। কিন্তু ফিশিং ব্যবসা মারিওকে আকর্ষণ করে না। সে চাকরির খোঁজে একটা পোস্টঅফিসে যায়। মারিওকে জিজ্ঞাসা করা হয়—'লিটারেট পার্সন?' মারিও বলে—'লিখতে ও পড়তে পারি, তবে খুব দ্রুত পড়তে পারি না।' তাকে বলা হয়, তাদের এমন একজন লোকের প্রয়োজন যে 'কালা ডি সটো'-তে চিঠিপত্র বিলি করতে পারে। মারিও জানায়, সে সেখানেই বাস করে। তখন তাকে বলা হয়, সেখানে মাত্র একটি ঠিকানায়ই চিঠিপত্র আসে। উনি ছাড়া সবাই অশিক্ষিত। উনি হলেন পাবলো নেরুদা। মারিও বলে—'সেই নেরুদাকে নাকি মেয়েরা পাগলের মতো ভালোবাসে।' তাকে বলা হয়—'পাবলো নেরুদাকে সবাই ভালোবাসে। সবার মধ্যে তো মেয়েরা পড়ে এবং পাবলো নেরুদা একজন কম্যুনিষ্ট।'...মারিও নেরুদার কাছে চিঠিপত্র নিয়ে যায় এবং একসময় তাদের মধ্যে বেশ ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মারিও দেখে, পাবলো নেরুদার

কাছে বেশিরভাগ চিঠি আসে মেয়েদেরই।...একদিন মারিও নেরুদার এক বইয়ে তাঁর অটোগ্রাফ নিয়ে আসে। কিন্তু সে খুশি হয় না। সে তার সিনিয়রকে বলে—'আমি উনার কাছ থেকে অটোগ্রাফ নেবার সময় আমার নামটি স্পষ্টভাবে বলেছি—মারিও রুপোলো। কিন্তু উনি লিখেছেন—'রিগার্ডস, পাবলো নেরুদা'। এটাতে কি আমার খুশি হবার কথা? এটা তো কোনো অর্থই প্রকাশ করে না।' মারিও নেরুদার কবিতা পড়তে শুরু করে। একদিন সে পাবলো নেরুদার মুখে উচ্চারিত 'মেটাফোর' শব্দটার অর্থ বুঝতে পারে না। তখন নেরুদা বলেন, 'যখন তুমি কিছু একটাকে অন্যকিছুর সাথে তুলনা করো, সেটাকে মেটাফোর বলে।' একদিন মারিও তার মনের কথা নেরুদাকে বলে—সে কবি হতে চায়—সে কবিতা লিখতে চায়। নেরুদা বললেন, 'তুমি যে চাকরি করছো তা কবি হবার চেয়ে অনেক ভালো। কারণ, এই চাকরিতে প্রচুর হাঁটতে হয় বলে কখনো তুমি মোটা হবে না। কবিরা বসে বসে লেখেন, সেজন্য তাঁরা মোটা হয়ে যান।' মারিও আবারো জানতে চায়, সে কবি হবে কিভাবে। নেরুদা বললেন, 'সমুদ্রের তীর ধরে খুব ধীরে ধীরে হাঁটবে। সমুদ্রের গর্জন শুনবে এবং তোমার চারপাশের সবকিছু অনুধাবন করার চেষ্টা করবে, তখন তোমার 'মেটাফোর' তোমাকে ধরা দেবে।' আরেকদিন মারিও নেরুদাকে জানায়, সে একটা মেয়ের প্রেমে পড়েছে। সে আরো জানায়, সে মেয়েটির সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু তাকে ভালোলাগার কথা বলতে পারে নি। দশ মিনিট পরে মারিওকে মেয়েটি বলে—'তুমি কি আর কখনো মেয়ে-মানুষ দেখো নি?' তখন ঘোর কাটিয়ে মারিও জিজ্ঞাসা করে—'তোমার নাম কী?' মেয়েটি বললো, 'বেট্রিস রুশো।' মারিও নেরুদাকে বলে, 'বেট্রিসকে আমি পাঁচটি শব্দ বলেছি।' নেরুদা বলেন, 'পাঁচটি কোথায়? তুমি ওকে বলেছো, তোমার নাম কী? এখানে তো মাত্র তিনটি শব্দ।' মারিও বলে, 'তারপর বেট্রিস রুশো নামটি শোনার পর আমি পুনরাবৃত্তি করেছি—বেট্রিস রুশো? এই হলো পাঁচটি শব্দ।' মারিও নেরুদাকে বললো তিনি যেন তাকে সাহায্য করেন।'

কায়েছ সিনেমার কাহিনী বলে যাচ্ছে...

সাত

লঞ্চের কেবিনে বসে আছে কায়েছ। এই প্রথম লঞ্চে চড়েছে সে। প্রথমে ঢাকা এসেছে। ঢাকা থেকে লঞ্চে যাচ্ছে। এর আগে কখনো লঞ্চে চড়ে নি। শান্তা চিঠিতে ওদের ওখানে যাবার পথ লিখে দিয়েছিল। লঞ্চে চড়ার অভিজ্ঞতা মিস করতে চায় না বলে সদরঘাট থেকে লঞ্চে উঠেছে। লঞ্চে প্রথম ভ্রমণ, তাই কিছুটা ভয়ও করছে। অনেক লঞ্চডুবির কথা সে পত্রিকাতে পড়েছে। নিহতরা যে একটা করে ছাগল পায় তাও দেখেছে। কি হাস্যকর কথা! একটা জীবনের বিনিময়ে একটা ছাগল!

কায়েছ সিঙ্গেল কেবিন রিজার্ভ করেছে। ট্রেনে সময় কাটানোর জন্য বই নিয়েছিল। আর লঞ্চে সময় কাটানোর জন্য সাথে করে শান্তার কিছু চিঠি নিয়ে এসেছে। লঞ্চে পড়বে বলেই নিয়ে এসেছে।

একটা চিঠি বের করলো। শান্তা লিখেছে—

হ্যালো সামিউল আযিম কায়েছ,
কেমন আছেন ?
আজ আপনাকে আমার বাবার কথা লিখি। আমার বাবা যে একজন এডভোকেট তা তো জানেন। আমাদের দু বোনের ধারণা, আমাদের বাবার মতো সহজ-সরল লোক এ দেশে খুব কম আছেন। কোনো প্যাঁচে থাকতে চান না। মেয়ে হিসেবে বাবার গুণগান গাইছি না। আপনি যখন আমাদের এখানে আসবেন তখন ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। আমার বাবাকে আপনার কথা বলেছি।
আমার বাবা আগে ফুড ডিপার্টমেন্টে ছিলেন। তারপর সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এডভোকেটের লাইনে এসেছেন। আমি আর রাহেনা আপু মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই, এরকম হয়েও এতোসব কঠিন মামলা বাবা সামলান কিভাবে! আমি বাবার সাথে কয়েকদিন জর্জকোর্টে গিয়েছি। বাবা ও অন্যান্য এডভোকেটরা সামনের সারির চেয়ারে বসেন। পেছনের সারিতে গণ্যমান্য লোকেরা যেখানে বসেন আমি সেখানে বসেছিলাম। বাবার কথাবার্তা শুনেছি। বুঝতে পেরেছি এটা পরিবেশের কারণে হয়। বাবা ঘরে থাকলে খুব কম কথা বলেন। কিন্তু কোর্টে উনার কেসের ডাক আসামাত্র আমার বাবা অন্যরকম হয়ে যান—যেন আসামির জন্য নয়, নিজের জন্য মামলা লড়ছেন, এমনই দরদি মনে হয়।
বাসায় বাবা কী রকম? আমাদের বাসার পূর্বদিকে একটা বাসা আছে। সে বাসার মালিক ইমন সাহেব। লোকটি তেমন সুবিধের নন। তিনি জানতেন বাবা কী রকম। তাই তিনি যখন উনার বাসার পশ্চিম দিকে বাউন্ডারির দেয়াল তোলেন তখন আমাদের বাসার সীমানার একহাত জায়গা নিয়ে উনি দেয়াল তুলেছিলেন। তখন আমাদের বাউন্ডারি হয় নি। বাবা উনাকে দলিলপত্র দেখালেন। ইমন সাহেব তা মেনে নিলেন না। আমার এক চাচা বললেন ইমন সাহেবের নামে মামলা করতে। কারণ, বাবা লিগ্যাল আছেন। বাবা বললেন, প্রতিবেশীর নামে মামলা করবো কেন? একহাত জায়গা নিয়েছে সেজন্য? এর জবাব তো পরকালে দিতে হবে। তারপর বাবা ইমন সাহেবকে জায়গার ব্যাপারে কোনো কথা বলেন নি। আমাদের বাসাটি তো চারতলা ফাউন্ডেশনের, একতলা পর্যন্ত করা হয়েছে, বাবাকে বলার পর বাবা দোতলা করতে রাজি হলেন। সব প্ল্যান ঠিকঠাক। ইমন সাহেব এসে বললেন, যদি আমাদের দোতলা করা হয় তাঁদের বাসার ভেতর আলো-বাতাস প্রবেশ করবে না। উনার বাসার ভেতরটা স্যাঁতসেঁতে হয়ে যাবে। উনি অনুরোধ করলেন বাবা যেন দোতলা না করেন। বাবা দোতলা করলেন না। বাবার কথা হলো উনি প্রতিবেশীর মনে কষ্ট দিবেন না। সামিউল, যে লোক প্রতিবেশীর ভালো চায় না, সেরকম প্রতিবেশীর স্বার্থও বাবা দেখেন।

কায়েছ ঢাকায় নেমে শান্তাকে ফোন করেছিল সে দু-চার দিনের মধ্যে ওখানে আসছে। কায়েছ বলে নি যে সে ঢাকায় এসেছে। শান্তা তাকে যেদিন আশা করবে সেদিন শান্তাদের এলাকায় তার দুদিন থাকা হয়ে যাবে।

কায়েছ লঞ্চ থেকে নামলো। রিকশায় করে শান্তাদের বাসার কাছাকাছি রোডে মোটামুটি মানের একটা হোটেলে গিয়ে উঠলো।

সকালে ফ্রেশ হয়ে কায়েছ ঠিক করলো, শান্তাদের বাসার কাছাকাছি সে যাবে, তবে ভেতরে ঢুকবে না। হোটেল থেকে বেরিয়ে শান্তার জন্য একটা প্যাকেট নিল। রিকশায় করে শান্তাদের রোডে গিয়ে এডভোকেট সাহেবের নেমপ্লেট লাগানো বাসাটি খুঁজে পেতে কষ্ট হলো না। রিকশা থেকে নেমে গেটের কলিংবেলে চাপ দিল। বাসার ভেতর থেকে কোরআন শরীফ পড়ার আওয়াজ ভেসে আসছে। কায়েছ বুঝলো, শান্তার বাবা কোরাআন শরীফ পড়ছেন। একটা ছোট মেয়ে গেট খুলে জিজ্ঞাসা করলো, 'কাকে চান?'

কায়েছ বললো, 'শান্তা আছে?'

'জি আছেন।' মেয়েটি বললো।

'তাকে এই প্যাকেটটি দিয়ে বলবে, কুরিয়ার সার্ভিসের লোক এসে দিয়ে গেছে।' বলে হাতের প্যাকেটটি মেয়েটির হাতে দিয়ে ফিরে আসার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগলো। একটু পর মেয়েটি দৌড়ে কায়েছের কাছে গিয়ে বললো, 'আপা আপনাকে ডাকছে।' কায়েছ ঘুরে দাঁড়ালো না। সে বললো, 'তোমার আপাকে বলো, আমাদের কুরিয়ার অফিস খোলা রেখে প্যাকেটটি ডেলিভারি দিতে এসেছিলাম। আমার তাড়া আছে।'

কায়েছ লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগলো, এতো দ্রুত যে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পথের মোড় পেরিয়ে এলো। কিছু সময় পরে একটা মুদির দোকানে ঢুকলো। এই দোকানে ফোন আছে। কায়েছ শান্তাদের বাসার নম্বরে ফোন করলো। ফোন ধরলো শান্তা। কায়েছের কণ্ঠ শুনে বললো, 'আপনি এরকম করলেন কেন?'

'কেন, কী হয়েছে?' কায়েছ জিজ্ঞাসা করলো।

'প্যাকেট দিয়ে চলে গেলেন কেন?'

'প্যাকেট দিয়ে চলে গেলেন মানে!'

'শুনুন, কুরিয়ার সার্ভিস থেকে এতো ভোরে প্যাকেট ডেলিভারি দেয় না। এখনো আটটা বাজে নি...তাছাড়া আমাদের কাজের মেয়েটা আপনার কাছে যাবার পর আপনি একবারও পিছন ফিরে তাকান নি।'

কায়েছ অবাক হয়, শান্তা তাহলে সবই বুঝে ফেলেছে! এই না হলে লেখিকা!

শান্তা বললো, 'বাসায় আসলেন না কেন?'

'পরে আসবো।'

'উঠেছেন কোথায়?'

'হোটেলে।'

'হোটেলে কেন? আপনাকে তো লিখেছিলাম, বাবাকে আপনার কথা বলেছি। আপনার জন্য আমাদের বাসায় রুম আছে। কোনো সমস্যা নেই।'

'আরে উঠে যখন পড়েছি, টাকা তো দিতেই হবে, থেকেই দিই।'

'বাসায় আসছেন কখন?'

'বিকেলে।'

'না, এখনি আসুন।'

'এখন না। এখন রেস্ট নেবো। ঘণ্টা তিনেক পরে আসবো।'

'তা হবে না। বাবা কোর্টে যাবার আগে আসুন। বাবার সাথে দেখা হয়ে যাক।'

'ঠিক আছে, আমি আসবো, তবে বাসার ভেতরে ঢুকবো না। আপনার বাবা বের হবার পর আমরা কিছুক্ষণ বেড়াবো।'

'নাস্তা করেছেন?'

'হ্যাঁ, লঞ্চ থেকে নেমেই করেছি।' মিথ্যা বললো।

কায়েছ হোটেলে ফিরলো। রুম সার্ভিসকে ডেকে নাস্তার অর্ডার দিল। ঘণ্টা খানেক পর শান্তাদের বাসার সামনে গেলো। কলিংবেলের বোতামে চাপ দিল। যে গেট খুললো তাকে দেখেই চিনতে পারলো। ছবিতে দেখেছে। শান্তা। শান্তার গেট খুলে কায়েছের দিকে তাকানোর দৃশ্যটা ওর মাথার মধ্যে গেঁথে গেলো। অন্যান্য সুন্দর দৃশ্যের মতো এ দৃশ্য সে জীবনেও ভুলবে না। শান্তা গেট খুলে শুধু মাথাটা বের করে কায়েছের দিকে তাকিয়ে হাসলো। অপূর্ব সে দৃশ্য। শান্তাও চিনতে পারলো, হেসে বললো, 'ভেতরে আসুন।'

'না, আমি এখানে আছি। আপনি তৈরি হয়ে নিন।'

'বাবা এখনি বের হবেন। বাবাকে বলা আছে, উনি কোর্টে যাবার পর বের হবো।'

ওরা দুজন দুজনকে 'আপনি' সম্বোধন করে। কারো পক্ষ থেকে 'তুমি' বলার প্রস্তাব আসে নি।

শান্তা ভেতরে গেলো। একটু পরে গেটের ভেতর থেকে একজন ভদ্রলোক বের হলেন। চশমা পরা। কায়েছ গেটের সামনে থেকে সরে দাঁড়ালো। ভদ্রলোক কে কায়েছ তা বুঝতে পারলো। শান্তার বাবা। তাঁকে সে সালাম দিল। এডভোকেট সাহেব সালামের উত্তর দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ' মিস্টার সামিউল আযিম কায়েছ?'

'জি।' কায়েছ বললো।

'বাইরে কেন? ভেতরে যান...আর হোটেলে উঠেছেন কেন? বন্ধুর দেশে এসে হোটেলে থাকবেন কেন, আমাদের বাসায় থাকবেন।'

'হোটেলে যখন উঠে পড়েছি তখন হোটেলেই থাকি, আবার এলে বাসায় উঠবো।'

'আমাদের বাসায় থাকলে আমাদের কোনো অসুবিধা হতো না।'

'সেটা শান্তা বলেছে।'

'তাহলে যদ্দিন আছেন তদ্দিন আমাদের এখানে চারটা ডাল-ভাত খাবেন। এতে অন্যথা করবেন না যেন।'

কায়েছ মনে মনে বললো, কয়েকদিন মানে! বাড়ি থেকে ঢাকা, ঢাকা থেকে এখানে আসতে এক দিন। এখান থেকে ঢাকা যেতে ও ঢাকা থেকে বাড়ি ফিরে আসতে এক দিন। এই হলো দুই দিন। আর শান্তাদের এখানে দুই দিন থাকার প্ল্যান। মোট চার দিনের প্রোগ্রাম।

এডভোকেট সাহেব চলে গেলেন। একটু পর শান্তা বের হয়ে এলো। জিজ্ঞাসা করলো, 'বাবার সাথে কথা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, উনি আমাকে মিস্টার সামিউল আযিম কায়েছ বলে সম্বোধন করেছেন এবং আপনি বলে সম্বোধন করেছেন, যেন আমি আব্দুর রহমান বিশ্বাস সাহেব।'

শান্তা কায়েছকে নিয়ে হাঁটতে লাগলো।

কায়েছ জিজ্ঞাসা করলো, 'এখন কোথায় যাবার প্ল্যান করেছেন?'

শান্তা বললো, 'রিকশায় উঠে প্ল্যান করবো।'

সামনে গিয়ে একটি রিকশা পাওয়া গেলো। শান্তা রিকশায় উঠলো। কায়েছ দাঁড়িয়ে আছে দেখে শান্তা জিজ্ঞাসা করলো, 'দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

'রিকশার জন্য।'

'এ রিকশায় উঠুন।'

'আরেন্নাহ্। আরেকটায় উঠবো।'

'এ রিকশায় উঠতে পারেন, কোনো সম্যসা নেই। একই রিকশায় বন্ধুর সাথে যেতে খারাপ লাগবে নাকি?' বলেই শান্তা হেসে ফেললো।

কায়েছ রিকশায় উঠলো। রিকশাঅলা জিজ্ঞাসা করলো, 'কোনদিকে যাবো?'

কায়েছ বললো, 'নাক বরাবর যাবেন। ঘণ্টা খানেক যাবেন। তারপর ফিরে আসবেন।'

শান্তা ও কায়েছ গল্প করতে করতে যাচ্ছে। ঘড়িতে সময় প্রায় দশটা। রাস্তায় বেশ ভিড়। কায়েছ রাস্তায় দাঁড়ানো ও রিকশা করে যাওয়া কয়েকজন মেয়ের দিকে তাকালো। তারপর শান্তাকে বললো, 'আপনাদের এখানে বেশিরভাগ মেয়েই বেঁটে।' শান্তা হাসলো।

কায়েছ বললো, 'আসুন, একটা খেলা খেলি।'

শান্তা অবাক হলো, 'খেলা! এখানে!'

'আরে ফুটবলের মতো দৌড়ে খেলতে হবে না, বসে বসেই খেলবো। আমরা তো রিকশা করে যাচ্ছি। আমাদের উলটো দিক থেকে আসা রিকশায় কিংবা রাস্তার পাশে লোকজন থাকবে। যেহেতু আপনি রিকশায়, সুতরাং দেখবেন লোকজন আপনার দিকে তাকাচ্ছে। যদি একজন পুরুষ আপনার দিকে তাকায় তাহলে আপনি পাবেন এক পয়েন্ট। আর মেয়েরা যদি আমার দিকে তাকায় তাহলে আমার স্কোর হবে এক পয়েন্ট। জানি, মেয়েরা সরাসরি এদিকে তাকাবে না, কিন্তু অন্য রিকশা করে কে যাচ্ছে না-যাচ্ছে তা তারা ঠিকই দেখে নেবে, তবে আড়চোখে।'

শান্তা রাজি হলো এবং বিশ মিনিট পর দেখা গেলো শান্তা পেয়েছে ষাট আর কায়েছ মাত্র নয় পয়েন্ট পেয়েছে।

কিছুক্ষণ পর রিকশাঅলাকে উলটো দিকে ফিরতে বললো। কায়েছ জিজ্ঞাসা করলো, 'এখানে কোনো ভালো ফাস্ট ফুডের দোকান আছে, শান্তা?'

'আছে।'

'ওখানে নিয়ে যান।'

'আরেকটু পরে তো ভাত খাবার সময় হয়ে যাবে। এখন ফাস্ট ফুড খাবেন?' শান্তা কায়েছকে জিজ্ঞাসা করলো।

কায়েছ বললো, 'আরে, এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে গল্প করবো। সাথে হালকা কিছু খাবো।'

রিকশা একটি ফাস্ট ফুডের দোকানের সামনে থামলো। কায়েস রিকশাঅলাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'ভাড়া কতো?' রিকশাঅলা বললো, 'দুইশ টাকা দেন।'

কায়েছ অবাক হলো। দেড় ঘণ্টাও হয় নি। ঘণ্টা ১৩৫ টাকা করে নাকি! কিছু রিকশাঅলা আছে সময়-সুযোগমতো ওদের ঘাড়ের বাঁকা শিরাটা আরো বাঁকা করে ফেলে।

রিকশাঅলাকে একশ কুড়ি টাকা দেয়া হলো। ভাড়া শান্তাই দিতে চেয়েছিল, কায়েছ দিতে দেয় নি।

কায়েছ শপে ঢুকে কফির অর্ডার দিল। তারপর শান্তাকে বললো, 'আপনার প্রায় সবকিছু বলেছেন, কিন্তু একটা কথা বলেন নি।'

'কী?' শান্তা জিজ্ঞাসা করলো।

'আপনার গালে টোল পড়ে তা কিন্তু আপনি কখনো বলেন নি।'

এই ভয়টাই শান্তা করেছিল। বললো, 'আরে, এটা বলার মতো কোনো ঘটনা হলো নাকি!'

'আপনি নিশ্চয়ই বলবেন না, টোলপড়া মেয়েদেরকে আমার যে খুব ভালো লাগে তা আপনি জানেন না।'

দুজনে কফি খেতে লাগলো। শান্তা বললো, 'যে কদিন আছেন সে কদিন কিন্তু আমাদের বাসায় খাবেন। আর আগামীকাল থেকে আমাদের বাসায় থাকবেন।'

'বাসায় থাকবো না। ঠিক আছে আপনাদের বাসায়ই খাবো।' কায়েছ মনে মনে হিসেব করলো—খাবার বাবদ যতো টাকা খরচ হবে বলে ধরেছিল সে টাকা বেঁচে যাচ্ছে। দুপুরে শান্তাদের বাসায় খাবে বলে ওকে বিদায় দিয়ে কায়েছ হোটেলে ফিরে এলো।

দুপুরে শান্তাদের বাসায় গেলে ওর মা ও বোন রাহেনার সাথে পরিচয় হলো। কিছুক্ষণ পরে শান্তার বাবা এলেন। দরজার বাইরে থাকতেই শান্তা ওর বাবার পা থেকে জুতা নিজ হাতে খুলে নিয়ে ভেতরে এনে র‍্যাকে রাখলো। ভালোলাগার মতো একটা দৃশ্য। বিকেলে শান্তা, কায়েছ ও রাহেনা বেশ কিছুক্ষণ বেড়ালো। গল্প করলো। রাত্রে কায়েছ খেলো শান্তাদের বাসায়।

পরদিন ওরা শান্তাদের এক চাচাতো বোনের বাসায় বেড়াবে বলে রওনা হলো। সাথে সাজনা। সাজনা শান্তার ভাগ্নি। শান্তাদের বাসায় থেকে সে লেখাপড়া করছে। এখন ওদের সাথে বাড়িতে যাচ্ছে। শান্তার চাচাতো বোন খুব আদর করলেন। এতো তাড়াতাড়ি এতো খাবারের আয়োজন করেছেন দেখে কায়েছ অবাক হলো। এরকম চটপটে মহিলা যদি সব পরিবারে থাকতেন! সাজনার আম্মা এদেশের একজন রোল মডেল হতে পারতেন।

ফেরার সময় শান্তা কায়েছকে বললো, 'শুনুন, গতকাল যখন আমি-আপনি রিকশা করে ফেরার সময় আপনি এ-মেয়ে সে-মেয়ে বেঁটে বলছিলেন, তখন আমি কিন্তু খুব হাসছিলাম।'

'কেন?'

'কারণ, আমার বন্ধুটি একে-তাকে বেঁটে বলছেন, কিন্তু ওঁর বন্ধুটি যে বেঁটে সেটা সম্ভবত আমার বন্ধুটি খেয়াল করেন নি।'

'খেয়াল করবো না কেন? খেয়াল করেছি। কিন্তু আপনার গালে টোল পড়ে বলে সেই বেঁটেটুকু চোখে লাগে নি...অবশ্য রাহেনা বোন বেশ লম্বা।'

একে একে চারটি দিন কাটিয়ে দিতে হলো শান্তাদের এখানে। অথচ কায়েছ দুদিনের প্রোগ্রাম করে এসেছিল। টাকায় টান পড়লো। পঞ্চম দিনও ওকে থেকে যেতে

হলো। কায়েছ শান্তাকে একান্তে কিছু সময় দিতে বললো। শান্তা সময় দিল। কায়েছ বললো, 'ভণিতা করে বলবো, নাকি সরাসরি বলবো?'

'সরাসরি বলুন।' শান্তা বললো।

'আপনি তো জানেন, টোল পড়া মেয়ে দেখলে আমি কী রকম দুর্বল হয়ে পড়ি। জানেন?'

'হ্যাঁ, জানি।'

'আপনার গালে খুব সুন্দর একটা টোল পড়ে।' বলে একটু থামলো। তারপর বললো, 'আপনি আমাকে বিয়ে করবেন?'

শান্তা বোকা বনে গেলো। কায়েছকে শান্ত কণ্ঠে বললো, 'ফান করছেন কেন?'

'ফান করছি না।' কায়েছও শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল।

'কী বোকার মতো কথা বলছেন!'

'বোকার মতো হবে কেন? আপনি কি আমাকে বিয়ে করবেন না?'

'না। বন্ধু বন্ধুই। বন্ধুকে যারা লাইফ-পার্টনার করতে চায় বা করে নেয় আমি তাদের সমর্থন করি না।'

'আপনার কি মনে হয় আমি আপনার যোগ্য নই?'

'আপনি আমার চেয়ে অনেক ভালো মেয়ে পাবেন। আর আপনি অন্য কাউকে বিয়ে করলে জেসমিনের কী হবে ভেবেছেন? ওর তো একটাই খুঁত, ওর গালে টোল পড়ে না।...অবুঝের মতো কথা বলবেন না। আমরা খুব ভালো বন্ধু। আমি আপনার শ্রেষ্ঠ বন্ধু হতে চাই, লাইফ-পার্টনার নয়।...এরকম করবেন না তো, প্লিজ। আপনার কোচিং একাডেমির কাজটা ঠিকমতো চালান। এটাকে একটা শক্ত ভিতে দাঁড় করান, প্লিজ।'

আরো অনেক কথা হলো। শান্তা বলে যেতে লাগলো—শুধু বন্ধুত্ব। ব্যস।

কিছুক্ষণ পর কায়েছ বললো, 'আপনার কাছে কিছু টাকা হবে? আমি যে প্ল্যান করে টাকা নিয়ে এসেছিলাম সে টাকা প্রায় শেষের পথে।'

'কতো হলে চলবে?' শান্তা জিজ্ঞাসা করলো।

'আপনার কাছে কতো আছে?'

'হাজার খানেক হলে চলবে?'

'চলবে।'

দুজন উঠে পড়লো।

বিকেলে শান্তাদের বাসায় যাবার পর ওর বাবা কায়েছকে আরেকটা দিন থেকে যেতে বললেন। ওর সাথে তো ভালো করে কথা বলাই হয় নি। আজকের রাত পর্যন্ত কথা বলবেন। অনেক গল্প-সল্প করবেন।

অগত্যা কায়েছকে আরেকটা দিন থেকে যেতে হলো।

• • •

নদীর কিনারে

সংগীতা সুলতানা মুক্তি

উৎসর্গ :

মাসুম ভাইয়া

লেখিকা-পরিচিতি

কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানার বারুইপাড়া গ্রামে ১৩ এপ্রিল ১৯৭৮ সালে সংগীতা সুলতানা মুক্তির জন্ম। বাবা মৃত বিল্লাল হোসেন বিশ্বাস, মা মরহুমা রাশিদা খানম রানি। রাষ্ট্র বিজ্ঞানে মাস্টার্স।

যাই লিখুন না কেন, মুক্তি কখনো হাত থামিয়ে রাখেন না। অপ্রকাশিত উপন্যাস আছে বেশ কয়েকটি। এটিই তাঁর প্রথম অণুগ্রন্থ।

লেখালেখির জগতে পরিণতি অর্জন করতে হলে পরিশ্রমের বিকল্প নেই। পরিশ্রম দ্বারা সেই কাঙ্ক্ষিত পরিণতি অর্জন করতে মুক্তি সমর্থ হলেই সবুজ অঙ্গনের 'নবীন-লেখক' তৈরি প্রকল্প সার্থক হবে।

এক

সবুজ ছায়াঘেরা গ্রামের পাশ দিয়ে কুলকুল করে বয়ে গেছে ছোট্ট একটি নদী। নদী পার হয়ে সামান্য দূরে স্টেশন। ফুলতলী গ্রামে আসতে-যেতে নৌকায় চড়াটা মনে বেশ আনন্দ জাগায়। মাঝি গান গেয়ে যাত্রীদের এপার থেকে ওপারে নিয়ে যায়। সে গান শুনে কারো মনে জেগে ওঠে অতীতের স্মৃতি। কারো বুক ভাসে বেদনার জলে।

রহিম আলী বাজার থেকে ফিরে মেয়েকে ডাকলেন, 'কবিতা, কোথায় গেলি মা?'

ঘর থেকে বেরিয়ে সামনে এলো কবিতা। খুশি হয়ে বললো, 'যা-যা আনতে বলেছিলাম সব ঠিকঠাক এনেছো তো বাবা?'

'হ্যাঁ মা, সবই এনেছি, কিন্তু কিসের এতো আয়োজন শুনি?'

'কেন বাবা, তোমার মনে নেই আজ বছরের প্রথম দিন, ২০০৪ সাল পড়েছে? ভাবছি এ বছরটা খুব আনন্দে কাটাবো। বাবা, আমাকে কথা দাও আজ থেকে আর কাঁদবে না তুমি?'

'নারে মা, আমার চোখের এ পানি কখনো থামবে না, যতোদিন বাঁচবো একটু একটু করে ঝরবে, এ যে আমার বেদনার অশ্রু।' চোখ মুছে বাবা বললেন, 'অবাক হয়ে আমার কথা শুনছিস? পাগলী মেয়ে আমার, যা মা, এবার রান্নাটা সেরে নে।'

'তুমি কিছু খাবে বাবা?'

'এক গ্লাস পানি দিলেই হবে।'

কবিতা বাবাকে পানি দেয়। বাবা বললেন, 'কার জন্য এতোসব আয়োজন, কাউকে দাওয়াত করেছিস মা?'

মৃদু হেসে উত্তর দিল কবিতা, 'না বাবা, আমাদের এই ভাঙ্গা ঘরে আর কে আসবে?'

'তুই এ কথা কেন বলছিস মা? এ ঘর ভাঙ্গা হলেও এর ভিতটা বড় মজবুত, শক্ত ঝড়েও ভাঙ্গবে না।'

'এ ঘর এমনিতেই তো ভাঙ্গা, নতুন করে আর ভাঙ্গবে কী, বাবা?'

'পাগলী মেয়ে, দুঃখ করিস না মা, শ্বশুর বাড়ি গিয়ে ভালো ঘরে থাকিস, এই অক্ষম বাবার তো ক্ষমতা হলো না তোর জন্য একটা ভালো ঘর তুলে দিতে।'

'এই তোমার মন খারাপ হয়ে গেলো বাবা? আমার জন্য তোমার কিচ্ছু করা লাগবে না। দেখো তো, তোমার কবিতা কতো বড় হয়ে গেছে?'

রান্না করতে গেলো কবিতা। বাবা বসে ভাবছেন—মেয়ে বড় হলে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব তাকে ভালো পাত্রের হাতে তুলে দেয়া। খোদার ওপরই একমাত্র ভরসা, ধন-সম্পদ বলতে বসত-বাড়িটুকু ছাড়া আর কিছুই নেই, কী করে মেয়েকে ভালো ঘরে বিয়ে দেবেন?

ফুলতলী গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এক নতুন ডাক্তার আসছেন। খুব বড় ডাক্তার। আসার আগেই চারদিকে তাঁর নামডাক ছড়িয়ে পড়েছে। মেয়েকে এ খবর জানালেন রহিম আলী। খুশি হলো কবিতা। বললো, 'তাহলে তোমাকে নিয়ে কষ্ট করে আর শহরে যেতে হবে না, তাই না বাবা? আমি বলেছি না, এ বছরে আমাদের কোনো দুঃখ-কষ্ট থাকবে না? বাবা, তুমি উনার সাথে দেখা করে দাওয়াত দিয়ে এসো, পরশু তো ছুটির দিন, ডাক্তার সাহেব যেন আমাদের এখানে আসেন।'

দুই

কবিতা ডাকলো, 'বাবা, এদিকে আসো তো।'

'কিরে মা, কিছু বলবি?'

'ইয়েস মাই ডিয়ার বাবা, দেখো তো এটা কেমন হয়েছে?'

'ভালোই তো দেখছি, কার জন্য কিনেছিস?'

কবিতা একটু রেগেই বললো, 'আমার চৌদ্দ পুরুষের জন্য। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে বলো?'

বাবার গায়ে পাঞ্জাবিটা পরিয়ে দিয়ে বললো, 'যাও বাবা, এই ফুলের তোড়াটা নতুন ডাক্তারকে দিয়ে বলো আমি আপনার রেগুলার পেশেন্ট।'

রহিম আলী ডাক্তারের সাথে দেখা করতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গেলেন। অনুমতি নিয়ে ডাক্তারের ঘরে প্রবেশ করলেন।

'আসসালামু আলাইকুম ডাক্তার সাহেব।'

'ওয়ালাইকুম আসসালাম, বসুন।'

'আপনার জন্য এই ফুলের তোড়া।'

'ধন্যবাদ।'

'তা ডাক্তার সাহেব, কেমন লাগছে আমাদের এই গ্রাম?'

'ভালো, প্রথম-প্রথম তো, সবকিছু এখনো বুঝে উঠতে পারি নি। বুঝতে খানিকটা সময় লাগবে। তবে আমার মনে হচ্ছে এলাকাটা ভালো। সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি এসব নেই।'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। ওদিক থেকে এ গাঁয়ের লোকেরা শান্তিতেই আছে।'

'চাচা, আপনার বাড়িটা কোন দিকে?'

'ঐ তো বাবা, স্কুলটার পূর্ব পাশে। কাল তো ছুটির দিন, এসো না আমার ভাঙ্গা ঘরে একটু বেড়িয়ে যাবে। এই দেখুন, ভুল করে তুমি বলে ফেললাম।'

'দ্যাটস ওকে। আমি তো আপনার ছেলের মতোই। আমাকে তুমি করে বললেই খুশি হবো।'

'এখন তবে উঠি বাবা, আসবে তো কাল বেড়াতে?'

'ঠিক আছে চাচা, সময় পেলে আসবো।'

বাড়ি ফেরার পথে মাতব্বরের সাথে দেখা। মাতব্বর বললেন, 'কী ব্যাপার রহিম আলী, কই গিচিলা?'

'মাতব্বর সাহেব কেমন আছেন? একটু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়েছিলাম। নতুন ডাক্তার সাহেবের সাথে দেখা করতে।'

'তাই নাকি? তোমার তো আবার হাঁপানির ব্যারাম। ভালা অসুখই বাদাইচো, এই ব্যারামের মানুষেরা নাকি সহজে মরে না।'

মাতব্বরের কথায় রহিম আলীর মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো। ঘরে ফিরে চুপচাপ কী যেন ভাবছেন। মেয়ে এসে বললো, 'বাবা, কেমন দেখলে উনাকে?'

শুকনো হেসে উত্তর দিলেন, 'খুব ভালো, ডাক্তারের কথাগুলো খুব মার্জিত। সব মানুষের ব্যবহার যদি ভালো হতো তাহলে কারো কথায় কেউ কষ্ট পেতো না। তাই নারে মা?'

'তোমার চোখে পানি কেন, বাবা?'

'পানি? মা, তোর রেজাল্ট হতে আর কতোদিন বাকি আছে? তুই পারবি না দূরে কোথাও একটা চাকরি নিয়ে তোর বাবাকে এ গাঁয়ের মানুষের চোখের আড়াল করে রাখতে?'

কবিতা বাবার মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকলো, 'বাবা, এ গাঁয়ের কেউ তো তোমাকে খেতে-পরতে দেয় না, কিসের অসুবিধা তাদের? বলো বাবা, তোমাকে কে কী বলেছে? আমি তার জবাব দেবো।'

'না কবিতা, তুই পারবি না। কুকুর মানুষের পায়ে কামড় দিলে মানুষ কি পারে তার প্রতিবাদ করতে? বরং কুকুরের সাথে দেখা হলে নিজেকে সে সাবধান করে।'

'কিন্তু বাবা, কুকুরগুলো যে একদিন মানুষের মাথায় চড়ে বসবে, তখন ভালো মানুষগুলো হেরে যাবে, জয় হবে মানুষরূপী কুকুরগুলোর।'

'ঠিকই বলেছিস মা, ওপরের পৃথিবীটা ভালো মানুষের জন্য সৃষ্টি হয় নি। যারা ভালো মানুষ তাদের এখানে কোনো দাম নেই। জীবনের সাথে যুদ্ধ করে চলে তারা। এক সময় পরাজিত হয়ে মৃত্যুর দুয়ারে পা বাড়ায়।'

বাইরে থেকে কে ডেকে উঠলো—'কবিতা—বাড়িতে আছিস নাকি?'

বেরিয়ে এলো কবিতা। হাসি মুখে বললো, 'কেমন আছিস বকুল? কখন ফিরলি?'

বকুল কোনো উত্তর না দিয়ে অপলক তাকিয়ে রইলো কবিতার দিকে। কবিতা বললো, 'বকুল, কী দেখছিস অমন করে?'

'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য...পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন...তোর নাম কবিতা না হয়ে বনলতা সেন হলে ভালো হতো, আমি তোকে নিয়ে কবিতা লিখতাম।'

বাবা ঐ ঘর থেকে জানতে চাইলেন, 'কে এসেছে রে মা?'

'কবি এসেছে' বলে নিজের মুখ নিজেই চেপে ধরলো কবিতা। 'ভেতরে চল্, বাবা ডাকছেন।'

কবিতার সাথে বকুল ঘরে ঢোকে।

'স্লামালাইকুম চাচাজান।'

'ওয়ালাইকুম আসসালাম। বসো বাবা, বসো। কবিতা যে বললো অন্য কার কথা।'

'ও ভুল বলেছে। চাচা, আপনার শরীর কেমন চলছে?'

'এই আগের মতোই আছি বাবা, গরীবের ভালো থাকা! তোমার মা কেমন আছেন?'

'মার সাথে আমার দেখা হয় নি। বড় মা বললেন, বাবার সাথে রাগারাগি করে মা মামাদের বাড়ি চলে গেছেন। আমার আর ভালো লাগে না। যেবার বাড়িতে আসি সেবারই দেখি একটা না একটা সমস্যা লেগেই আছে।'

'তোমরা কথা বলো, আমি নামাজ পড়ে আসি।'

বকুল কবিতার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কবিতা, কেমন আছিস বললি না?'

'এই তো আছি, দিন চলে যাচ্ছে।'

'এখন কয়টা ব্যাচ পড়াস?'

'কেন, তুই পড়বি নাকি?'

'হ্যাঁ পড়বো তুই যদি পড়াস।'

'ঠিক আছে, কাল থেকে চলে আসবি। অ-আ-ক-খ ঠিকমতো পারিস তো?'

'সেটা যাচাই করে নিবি।'

'ওকে, আজ থেকে তুই আমার বুড়ো ছাত্র।'

'কী বললি, আমি বুড়ো হয়ে গেছি? তুই তাহলে বুড়ি?'

'দেখ্ বকুল, ম্যাডামকে অসম্মান করে কথা বলবি না।'

'স্যরি ম্যাডাম, এক্সিউজ মি। চলি, ও ম্যাডাম, কয়টার দিকে আসবো?'

'নো প্রবলেম, যে কোনো সময় আসতে পারিস।'

'রাতে এলে তোর সমস্যা আছে কবিতা?'

'না না, সমস্যা কিসের?'

'তাহলে রাত বারটার পরে আসি?'

'কী বললি, দাঁড়া পড়া শিখিয়ে দিচ্ছি তোকে।'

হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায় বকুল। বাড়ি ফেরার পর বাবা মাতব্বর সাহেব বললেন, 'কী ব্যাপার, বাড়ি আইসা খাওয়া-দাওয়া না কইরা কনে গিচিলা?'

'বাবা, মা কোথায় গেছে?'

'আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও।'

'রহিম চাচার ওখানে গিয়েছিলাম।'

'ক্যান গিচিলা?'

'কবিতার সাথে দেখা করতে।'

'ঐ ফকিন্নীর বাচ্চার লগে তোমার কিসের কতা?'

'বাবা, ওরা গরীব হলেও ওদের মাঝে মনুষ্যত্ব আছে।' বড় মা এসে বকুলকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন, 'ছিঃ বাবা, গুরুজনের মুখে মুখে উঠতে হয় না।'

'বড় মা, তুমিই বলো, বাবার সংসারে এসে কী পেয়েছো? কতোটা সুখ আর শান্তি সে তোমাকে দিতে পেরেছে? তোমার জীবন নষ্ট হয়ে গেছে জেনেও কেন তুমি মাকে এ বাড়ির বউ করে এনেছিলে? কাঁদছো কেন বড় মা? জানি, আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর তুমি দিতে পারবে না।'

'হাতমুখ ধুয়ে ভাত খেয়ে নে বাবা।'

'না বড় মা, আমার খিদে লাগে নি। আমি মামাদের বাড়িতে যাচ্ছি, মা যদি না আসে তাহলে ওদিক দিয়েই ঢাকা ফিরে যাবো।'

'দুটো ভাত খেয়ে যা বকুল।'

'না খাবো না। আসি।'

না খেয়ে চলে গেলো বকুল। খাবার সামনে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন বকুলের বড় মা। বিয়ের পর সন্তান হয় না বলে বুকে কষ্ট চেপে রেখে স্বামীকে দ্বিতীয় বিয়ে দিয়েছিলেন বুকলের বড় মা।

ঘরে ঢুকে স্ত্রীকে কাঁদতে দেখে মাতব্বর বললেন, 'ছেলের জন্য তো খুব দরদ দেখচি। ওরে কি তুমি নিজের প্যাটে ধরচিলা, ও তোমার কতা শুনবো? বেশি পরান পুড়লে ছেলের সাতে সাতে চইলা গেলেই পারতা, সারা জীবন চোকের পানি ফ্যালা কী পাইলা কও তো? বকুলের মারে আনতে লোক পাঠাইছিলাম, আসে নাই?'

'তার শরীল খারাপ, প্যাশার বাড়চে, কয়দিন পর আসতে চাইচে।'

'ঠিক আছে, সে আসলে তারে কয়ে দিও, ফের যদি রাগ কইরা যায় তাইলে এ বাড়ির দরজা চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবো।'

'আপনে এমন কতা কইতে পারলেন? কতো ঘুইরা ঘুইরা ওরে বিয়া করচিলেন, ভুইলা গিচেন?'

'চুপ করো, ওসব পুরনো কতা বাদ দাও। টাকা থাকলে মাইয়া লোকের অভাব নাই।'

'ছিঃ, এই বয়সে বিয়ার কতা ভাবতে আপনের লজ্জা করে না?'

'লজ্জা মাইয়া লোকের ভূষাণ। পুরুষ লোকের জন্য না।'

'আপনের এই গায়ের জোর আর টাকার গরম চিরদিন থাকবো না।'

'বড় বউ, কতা বাড়াইও না কইলাম।'

তিন

পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে বাড়ি ফিরছে কবিতা। সেকেন্ড ক্লাস পেয়ে বিএ পাশ করেছে। মিষ্টির প্যাকেট হাতে। মাঝি জিজ্ঞাসা করলো, 'কিরে মা, কিসের মিষ্টি নিয়া আলি?'

'চাচা, খুশির সংবাদ। আমি বিএ পাশ করেছি। ধরুন মিষ্টি খান।'

'বাহ্, ভালা মিষ্টি। বল্ তো মা, তোর জন্য কী দোয়া করতি হবি?'

'না না, আমার জন্য না, দোয়া আমার বাবার জন্য করুন। বাবা যেন আরো অনেকদিন বেঁচে থাকেন।'

'তোর বাবারে তুই খুব ভালোবাসিস, না মা?'

'হ্যাঁ চাচা, বাবা ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই, মাকে তো কখনো দেখি নি।'

'মন খারাপ করিস নি মা, চোখের পানি মুইছা ফ্যাল। আজ তোর খুশির দিন।'

কূলে ভিড়লো নৌকা। কবিতা অন্যমনস্ক হয়ে কী যেন ভাবছিল। মাঝি বললো, 'মামণি, নামবা না?'

'জি চাচা, আমার তো খেয়ালই নেই।' মিষ্টির প্যাকেট হাতে তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে বাঁশের ওপরে পা ফস্‌কে পড়ে যাচ্ছিল কবিতা। পার হওয়ার জন্য এক যুবক অপেক্ষা করছিল তীরে। পড়ে যাওয়ার আগেই ঐ যুবক কবিতাকে ধরে ফেলে, অমনি লজ্জা পেয়ে মাথাটা নিচু করলো কবিতা। যুবক বললো, 'না না, লজ্জা পাওয়ার কী আছে? আমি না ধরলে তো আপনি পানিতে পড়ে যেতেন। এ গাঁয়ে বেড়াতে এলেন বুঝি?'

'না, আমার বাড়ি এ গাঁয়েই।'

'ও, দেখি নি তো কখনো। আপনার নামটা?'

নাম না বলেই কবিতা জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনি কি আমাদের গাঁয়ে বেড়াতে এসেছেন?'

'বেড়াতে নয়, দায়িত্ব আর কর্তব্য নিয়ে এসেছি।'

'স্বেচ্ছাসেবক?'

'ঐ রকমই একটা কিছু। ঠিক আছে, চলি—দেখা হবে।'

যুবককে প্রথম দেখাতেই ভালো লেগে গেলো কবিতার। খুশির মাঝে নতুন আনন্দ দোলা দিতে লাগলো ওর মনে। কী যেন এক নতুন ভাবনা ভাবতে ভাবতে বাড়ি পৌঁছে গেলো। হাসি মুখে বললো, 'বাবা, আমি পাশ করেছি। সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছি। এবার আর কোনো কষ্ট থাকবে না বাবা, একটা চাকরি নিশ্চয়ই পেয়ে যাবো। হাঁ করো বাবা, মিষ্টি খাও...আর একটা খাও বাবা।'

'না মা, আর খাবো না। এক গ্লাস পানি দে।' পানি খেয়ে বললেন, 'কবিতা, কয়টা মিষ্টি দে, আমি ডাক্তার সাহেবকে দিয়ে আসি।'

'কিন্তু বাবা, উনি যদি না খান?'

'কেন খাবেন না, আমরা গরীব বলে? আমি বলবো—খাও বাবা, এ বড় খুশির মিষ্টি।'

'ঠিক আছে দিচ্ছি। বাবা, শুধু মিষ্টি না, তুমি একটু বসো, আমি কয়টা পিঠা তৈরি করে দিচ্ছি।'

পিঠা আর মিষ্টি বাবার হাতে দিয়ে বললো, 'যাও, উনাকে দিয়ে এসো।'

রহিম আলী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গেলেন। ডাক্তার সাহেব হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছেন চাচা? বসুন। এগুলো কী নিয়ে এসেছেন?'

'খাও বাবা, তোমার জন্য এনেছি, আমার মেয়ে বিএ পাশ করেছে।'

'ও, তাহলে কি নৌকা থেকে নামতে দেখলাম মিষ্টি হাতে...'

'হ্যাঁ বাবাজি, ঐ আমার মেয়ে, একমাত্র অবলম্বন। আমি তো অক্ষম, সংসারের দায়িত্ব সব ওর মাথার ওপর।'

'আপনার আর কেউ নেই? আমার কথায় কষ্ট পেলেন চাচা?'

'না বাবা, কষ্ট বলতে তো আমার জীবনে কিছু নেই, সবই আমার কপাল! যাই বাবা, মেয়েটা একা একা কী করছে দেখি।'

রাতে মেয়েকে বললেন, 'কবিতা, আমি মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তোকে বলবো মা?'

'কী বাবা, বলো?'

'আমি ঠিক করেছি, স্কুলের চেয়ারম্যানের কাছে যাবো। উনি যদি তোর একটা ব্যবস্থা করতেন, তাহলে আমার চিন্তাটা দূর হতো। আমার তো আর সাধ্য নেই টাকা-পয়সা খরচ করে তোকে একটা ভালো ছেলের হাতে তুলে দেয়ার।'

'বাবা, তোমাকে বলেছি না আমার জন্য চিন্তা করবে না?'

'চিন্তা কি আর এমনি হয় রে মা, তুই বড় হয়েছিস, গাঁয়ের নানা লোকে নানা কথা বলে, আমি তোর বাবা হয়েও পারছি না বাবার দায়িত্ব পালন করতে।'

'বাবা, গাঁয়ের লোকেরা শুধু ওটুকুই পারে। আমার পেটে খাবার না থাকলে ওরা চেয়ে চেয়ে দেখবে, মুখ টিপে হাসবে, হয়তো কেউ কেউ কষ্টও অনুভব করবে, কিন্তু বলবে না একটা ব্যবস্থা করি।'

'তবুও সামাজিকতা বলে তো একটা জিনিস আছে। তাছাড়া আমারও বয়স হয়েছে, কখন মরে যাই, তোকে কার কাছে রেখে যাবো, মা?'

বাবার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো কবিতা—'না বাবা, তোমাকে মরতে দেবো না। ও কথা আর মুখে আনবে না। তুমি মরে গেলে আমি কার কাছে থাকবো বাবা? কাকে বাবা বলে ডাকবো? তুমি ছাড়া এ পৃথিবীতে আমার আর কেউ কি আছে?'

মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, 'কান্না শুরু করলি? এই পাগলী, মানুষ কি চিরদিন বেঁচে থাকে? তোর মাকে আমি কতো ভালোবাসতাম, সেও তো চলে গেলো। যাওয়ার সময় আমার কথা একবারও ভাবলো না। কাঁদিস না মা।' বলতে বলতে একটা দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন।

কবিতার মার মরণব্যাধি ক্যান্সার হয়েছিল। পাড়ার এক বুড়ির আদরে বড় হয় কবিতা। বাবা-মেয়ের মনে সেই দুঃখ উথলে ওঠে। বুকের নীরব কান্না কেউ দেখে না।

চার

রহিম আলী চেয়ারম্যানের কাছে মেয়ের চাকরির ব্যাপারে খুব অনুরোধ জানালেন। চেয়ারম্যান বেশ ভালো মানুষ। বললেন, 'ঠিক আছে, দেখি কী করা যায়।'

কিছুদিনের মধ্যেই কবিতার চাকরি হয়ে গেলো। স্কুল-কমিটির সদস্যরা এবং ছাত্র-ছাত্রীসহ শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ ফুলের মালা দিয়ে কবিতাকে বরণ করে নিলেন নতুন শিক্ষিকা হিসেবে। মাতব্বর মনে মনে ভাবলেন, 'এমন একটা মাইয়ারে হাতছাড়া করন যাইবো না। আমি কবিতারে বিয়া করুম। কবিতা এতো সুন্দরী হইচে খেয়ালই তো করি নাই।'

চামচার কাছে মনের কামনা খুলে বললেন। চামচা বললো, 'মাতব্বর সাব, এ কাজ হবি নানে, কবিতা আপনের মাইয়ার বয়সী। তাছাড়া আপনের ঘরে দুইজন স্ত্রী আছে। তার চাইতে এক কাজ করেন, কবিতারে বকুলের লগে বিয়া দ্যান।'

'চুপ কর্ চামচা, ঐ ফকিন্নীর বাচ্চার লগে আমার পোলার বিয়া দেবো?' ধমক শুনে চমকে উঠলো চামচা। মাতব্বর মনে মনে বললেন—'ঠিক আছে, বকুলের লগেই কবিতার বিয়া হইবো। কবিতা মাসে মাসে ব্যাতন পাইবো, টাকাঅলা মাইয়া হাতছাড়া করন যাইবো না।' একটু হেসে বললেন, 'তুই ঠিক কতাই কইচিস, তোর বুদ্ধি আছে।'

বকুল আর কবিতা ছোট বেলা থেকে এক সাথে বড় হয়েছে এবং লেখাপড়াও একই ক্লাসে। কিন্তু বড় হওয়ার পর কবিতার সাথে মেশাটা বকুলের বাবা পছন্দ করতেন না। গরীব ঘরের মেয়ে বলে ঘৃণার চোখে দেখতেন। কবিতা বকুলকে নিয়ে অতোটা ভাবে না। কিন্তু বকুল কবিতাকে দূরে রাখতে পারে নি, মনে মনে ভালোবাসে, ভাবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তার মনের মানুষকে ঘরে তুলে আনবে।

একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে সেই অচেনা ভালোলাগা যুবকটির সাথে দেখা হয়ে গেলো কবিতার। মনে পড়ে গেলো প্রথম দেখার সেই স্মৃতিটা। একটু হেসে বললো, 'আরে আপনি?'

যুবক বললো, 'এতোদিন কোথায় ছিলেন?'

'মঙ্গলগ্রহে গিয়েছিলাম।'

'তাই নাকি? কাকে খুঁজতে?'

'আপনাকে।'

'সত্যি বলছেন?'

'আমি মিথ্যা বলি না।'

'তো, পৃথিবীতে এতো মানুষ থাকতে আমাকে খুঁজতে গেলেন কেন, ম্যাডাম?'

মায়াবী চোখে তাকিয়ে বললো, 'এ প্রশ্নের উত্তরটা ঠিক আমার জানা নেই।'

'আমি কিন্তু মনে মনে আপনাকে অনেক খুঁজেছি, পাই নি।'

'আমাকে? কেন?'

'আপনার হাতের পিঠা খাওয়ার জন্য।'

'মানে?'

'আপনি চমৎকার পিঠা তৈরি করতে পারেন সেটা আমি জানি।'

'কিভাবে জানলেন?'

'সেদিন রাতে ঘুমের মাঝে আপনার হাতের পিঠা খেয়েছিলাম, তার সাথে মিষ্টি।'

মনে পড়ে গেলো কবিতার। বললো, 'তার মানে আপনি নতুন ডাক্তার?'

'ইয়েস। আর তুমি?'

'আমি কবিতা, হাইস্কুলে চাকরি নিয়েছি। বাবার মুখে আপনার খুব প্রশংসা শুনি, তাছাড়া সেই প্রথম দিনে আপনার সাথে যেভাবে দেখা হলো...।'

'লজ্জা পেয়েছিলেন খুব, না?'

'হ্যাঁ। তো আমাদের গ্রামটা কেমন লাগছে আপনার?'

'সুন্দর, সবুজ ছায়াঘেরা পথঘাট, পাশ দিয়ে ছোট্ট একটি নদী, চমৎকার গ্রাম এটি। বিকেলে নদীর কিনারে বসে ভাবতে খুব ভালো লাগে।'

কথা বলতে বলতে পথ শেষ হলো। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আজ বিকেলে নদীর ধারে এসো, গল্প করা যাবে। এখন চলি, কেমন? খোদা হাফেজ।'

'খোদা হাফেজ।'

ভাবতে ভাবতে বিকেল শেষ হলো। বাবার শরীরটা ভালো ছিল না। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কবিতা যেতে পারলো না।

রাতে ঘুম আসছে না। অনেক রাত ভেবে ভেবে ঘুমিয়ে পড়লো। সকালে বাবাকে নিয়ে গেলো স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'তোমার বাবার শারীরিক অবস্থা খুব একটা ভালো যাচ্ছে না।' কবিতার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। বললো, 'ডাক্তার সাহেব, বাবার কী অসুখ হয়েছে? বাবা বাঁচবে তো?'

'হার্টে একটু প্রবলেম দেখা দিয়েছে, সেজন্য শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। যে কোনো সময় একটা এক্সিডেন্ট ঘটে যেতে পারে।'

ডাক্তার সাহেব রিপোর্টগুলো দেখছিলেন। কবিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি কাঁদছো কবিতা? প্লিজ কেঁদো না। তোমার বাবা ভালো হয়ে যাবেন।'

একটু মলিন হেসে কবিতা বললো, 'বাবা ছাড়া এ পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই তো, বাবাকে হারাবার কথা ভাবতে পারি না। বাবা অপেক্ষা করছেন, চলি।'

'কবিতা, শোনো।'

'জি?'

'বিকেলে এসো না একটু, গল্প করা যাবে।'

'আপনার মনটা ভালো নেই বুঝি?'

'না মানে, সারাদিন পেশেন্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকি, বিকেলটা একা একা কাটতে চায় না, কেমন বিষণ্নতা ফিল করি।'

'ও বুঝতে পেরেছি, কিন্তু তখন যে টিউশনি করি।'

'ওটা বাদ দেয়া যায় না?'

'না, টিউশনির টাকা দিয়ে বাবার ওষুধ, সংসারের খরচ, সব বহন করতে হয়।'

'কেন, তোমার বেতনের টাকা?'

'বেতনের টাকা? আমার বেতন এখনো হয় নি। এমপিও-ভুক্ত করতে বেশ কিছু টাকা লাগবে। বাবা বলেছেন মাতব্বর সাহেবের কাছে বাড়ির দলিলটা বন্দক রেখে টাকা নেবেন, স্কুলে দেয়ার জন্য।'

'ও, তাহলে যখন সময় পাবে আসবে।'

'ঠিক আছে, চলি, খোদা হাফেজ।'

হাত বাড়িয়ে দুটো প্যাড আর একটা কলম দিয়ে বললেন, 'এটা নিয়ে যাও কবিতা। মনের মানুষের কাছে চিঠি লিখো।'

মনে মনে কবিতা বললো—কোথায় পাবো মনের মানুষ? আমার মনের মানুষ তো তুমি।

পাঁচ

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন হওয়ার পর গ্রামের লোকেরা সুচিকিৎসা পায়, কাউকে কষ্ট করে দূরে যেতে হয় না। নতুন ডাক্তার সবার কাছে হয়ে উঠলেন জন-দরদি, প্রশংসার পাত্র।

মাছ কুটতে গিয়ে কবিতার হাতে কাঁটা ঢুকে গিয়েছিল। সে ডাক্তারের কাছে গেলো।

'আরে কবিতা, কেমন আছো?'

'জি ভালো, আপনি ভালো আছেন তো?'

'হ্যাঁ ভালো আছি। প্লিজ বসো, এতোদিন পর আমার কথা মনে পড়লো?'

'আপনার কথা তো আমার সব সময়ই মনে পড়ে।'

'সত্যি বলছো? তাহলে আসো না কেন?'

'বেশি এলে লোকে খারাপ ভাববে যে?'

'ও—ঠিক আছে, আসার দরকার নেই।'

'ডাক্তার সাহেব, দেখুন তো আমার হাতটা।'

'ইশ, কেমন ফুলে গেছে। কী হয়েছে?'

'মাছের কাঁটা ঢুকেছিল, বেরিয়ে গেছে। এখন শুধু ব্যথা আর যন্ত্রণা হচ্ছে।'

'এই ওষুধগুলো খাবে। কাল একবার এসো।'

'আচ্ছা আসবো।'

'কবিতা, চলে যাচ্ছো? একটু বসবে না?'

কবিতার চোখে কিসের যেন একটা স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়ার ভাবনা। ডাক্তার সাহেবের চোখে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

'কবিতা।'

'জি।'

'কিছু ভাবছো?'

'না...।'

'কাল আসবে তো?'

চোখে চোখ রেখে বললো কবিতা, 'আসবো।'

কবিতার চোখের ঘুম চলে গেছে। ডাক্তারকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে অনেক রাত কেটে যায়, সকালে টিউশনি—বিনা বেতনের চাকরি, সবকিছুই কবিতার কাছে অর্থহীন-ঝঞ্ঝাট মনে হচ্ছে। অভাবের মাঝে প্রেম-ভালোবাসা শোভা পায় না, কেবলই আবেগ, যে আবেগ অর্থহীন। তবু ভালোবাসা কোনো বাধা মানে না, ছুটে চলে স্রোতধারার মতো।

কবিতা স্বপ্ন দেখে ঘর বাঁধার, মনের মানুষকে আপন করে পাওয়ার, কিন্তু ভেবে দেখে না তার স্বপ্ন আদৌ বাস্তবে রূপ নেবে কিনা। কারণ, স্বপ্ন দেখতে মানুষ থেমে থাকে না।

ছয়

রহিম আলীর কাশিটা বেড়েছে। ভাবলেন ডাক্তার সাহেবের কাছ থেকে একটু ঘুরে আসি। ডাক্তারের কাছে গেলে পিয়ন বললো, 'স্যার অসুস্থ, নোটিশ দেখতে পান নি? আজ রোগী দেখা বন্ধ।'

'ও আচ্ছা, কী হয়েছে ডাক্তার সাহেবের?'

'জ্বর হয়েছে।'

বাড়ি ফিরে বললেন, 'ছেলেটার আবার অসুখ-বিসুখ কেন হলো? একা একা থাকে ছেলেটা বাবা-মাকে ফেলে।'

'কার কথা বলছো, বাবা?'

'ঐ যে ডাক্তার ছেলেটার কথা, জ্বর এসেছে, রোগী দেখা বন্ধ।'

'তুমি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়েছিলে বাবা?'

'হ্যাঁ, ডাক্তার সাহেবের সাথে দেখা করি নি, অসুস্থ।'

কবিতা মনে মনে ভাবছে—আমি কি যাবো উনাকে দেখতে? যাওয়া তো দরকার।

'কী ভাবছিস মা?'

'না বাবা, কিছু না। বাবা, আমি কি যাবো উনাকে দেখতে?'

'যা দেখে আয়, বিপদের সময় মানুষের পাশে দাঁড়াতে হয়।'

ঘরের ভেতর ঢুকে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে কবিতা। জ্বর দেখার সাহস হচ্ছে না। ডাক্তার সাহেব চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। মাথার কাছে গিয়ে আস্তে করে কপালে হাত দিল। ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ পেয়ে ডাক্তার সাহেব নিজের হাতটা কবিতার হাতের ওপর রাখলেন, তিনি কিন্তু বুঝতে পারেন নি তার কপালে কে হাত রেখেছে। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে দেখলেন কবিতা। দেখেই তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন।

'কখন এলে কবিতা? বসো।'

'আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না?'

একটু হেসে উত্তর দিল, 'তোমার সেবা পেলে কষ্ট নিবারণ হয়ে যাবে, আমাকে সেবা করবে না?'

'হ্যাঁ করবো।'

'কিভাবে?'

'আপনি যেভাবে বলেন।'

'না, আমাকে সেবা করলে তোমার কলঙ্ক হবে, লোকে খারাপ বলবে।'

'ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি।'

'একটু বসবে না?'

'কী হলো, আপনি অমন করছেন কেন?'

'না, কিছু না, ঠিক হয়ে যাবে।'

কবিতা পানির বালতি এনে মাথায় পানি ঢালতে লাগলো, মাথা মুছিয়ে ওষুধ খাইয়ে দিল। তারপর বললো, 'এবার ঘুমিয়ে পড়ুন।'

বাড়ি ফিরে কবিতার মন আর ঘরে দাঁড়াতে চাইলো না। অন্যমনস্ক, কী যেন ভাবছে। বাবা ডাকলেন, 'কবিতা।'

'জি বাবা।'

'আজ কদিন ধরে লক্ষ করছি তুই কেমন অন্যমনস্ক থাকিস, কী হয়েছে রে মা? স্কুলে কোনো সমস্যা হয়েছে?'

'না বাবা।'

'তাহলে অমন মনমরা হয়ে থাকিস কেন?'

'বাবা, সত্যি তোমার বুদ্ধি কমে গেছে, আমি তো আগের মতোই আছি।'

'তোকে একটা প্রশ্ন করলে তুই ঠিক উত্তর দিবি তো মা?'

'প্রশ্ন? কী প্রশ্ন বাবা?'

'তুই আগে বল্, সঠিক উত্তর দিবি কিনা?'

'হ্যাঁ দেবো, বলো কী প্রশ্ন।'

'তুই কি ডাক্তারকে ভালোবাসিস?'

বাবার প্রশ্নের উত্তর জেনেও দিতে পারলো না কবিতা। চোখ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়তে লাগলো, যার অর্থ একটাই—সে ডাক্তারকে ভালোবাসে।

বাবা বললেন, 'মা রে, তুই ভুল করেছিস। মাটিতে দাঁড়িয়ে আকাশের ছোঁয়া পাওয়া যায় না। আমরা গরীব, সে কথা তুই ভুলে গেলি কী করে মা?' মেয়ের মাথায় হাত দিতেই ঝরে পড়তে লাগলো অক্ষম বাবার চোখের পানি। 'তুই ডাক্তারকে ভুলে যা মা, গরীবের ঘরে ভালোবাসা শোভা পায় না, ভুল পথে পা রেখে তুই তোর সুন্দর জীবনটা নষ্ট করিস না মা।'

নিরুত্তর কবিতা—ঝরনা যেমন ছুটে চলে পাহাড় বেয়ে, নদী যেমন ছোটে সাগরের খোঁজে, তেমনি কবিতার মন ছুটে চলছে তার ভালোবাসার মানুষটির কাছে।

রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, কবিতা নিজের অজান্তেই ছুটে গেলো তার আপনজনের কাছে। ততোক্ষণে ডাক্তার সাহেব ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। দরজাটা খোলা ছিল। ভিতরে ঢুকে একটু দাঁড়িয়ে মেঝেতে বসে হাতের ওপর মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো কবিতা। রাত ভোর হয়ে গেলো। ঘুম ভাঙ্গলে ডাক্তার সাহেব দেখলেন তাঁর হাতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে কবিতা। প্রথমে ভাবলেন—আমি কি স্বপ্ন দেখছি! আস্তে করে ডাকলেন, 'কবিতা, কবিতা!'

'জি!' উঠে দাঁড়ালো কবিতা।

'কবিতা, কখন এসেছিলে তুমি?'

কোনো কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরে এলো কবিতা।

বাবা ঘুম থেকে উঠে বললেন, 'কবিতা, আমাকে এক গ্লাস পানি দে তো মা।'

পানি হাতে বাবার সামনে দাঁড়ালো। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'সব সময় মনমরা থাকিস কেন মা?' কবিতা উত্তর দিল না। বাবা আবার বললেন, 'রাতে ভাত খাস নি কেন কবিতা? আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস না মা?'

এবার কবিতা বললো, 'পানি খাবে না বাবা?'

'হ্যাঁ খাবো।'

মেয়ের মানসিক অবস্থা দেখে বাবার মনের অবস্থাও ভীষণ খারাপ। ভাবতে লাগলেন—এক রকম ভালোই তো ছিলাম। মেয়েটাও ভালো ছিল, ওর সুন্দর মনটা নষ্ট হয়ে গেলো। হে খোদা, এ কোন পরীক্ষায় ফেললে আমার মেয়েটাকে? কী হবে আমার কবিতার? বৈশাখী ঝড় যেমন সাজানো বাগানকে তছনছ করে ফেলে, তেমনি ওর সুন্দর জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে না তো?

সাত

ডাক্তার সাহেব জানালায় তাকিয়ে দেখলেন কবিতা আসছে। ভাবতে লাগলেন—কবিতা কি আমাকে ভালোবাসে? আমিও তো ওর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছি।

দরজায় দাঁড়িয়ে কবিতা। 'ভেতরে আসবো?'

'এসো। কেমন আছো কবিতা? স্কুলে যাও নি?'

'না, কদিনের ছুটি নিয়েছি।'

'কেন, কোথাও বেড়াতে যাবে?'

'না।'

'তাহলে?'

'জানি না।'

'তোমার মন খারাপ, কবিতা?'

'না।'

'তাহলে কথা বলছো না কেন? মুখটা কেমন শুকিয়ে গেছে। কিছু বলবে কবিতা?'

'না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে উঠে চলে গেলো কবিতা।

বাড়ি ফেরার পথে ক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়লো কবিতার চোখ বেয়ে। আর ডাক্তার সাহেব বসে ভাবতে লাগলেন। নিজেকে প্রশ্ন করছেন—কেন হঠাৎ কবিতার সাথে দেখা হলো? ওর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে ওর হৃদয়ে আমার স্থান কতোটুকু হয়েছে। না, আমি এখানে থাকবো না। আমাকে ভালোবেসে কবিতার সুন্দর জীবনটা নষ্ট হতে পারে না। আমি কী দিয়ে বোঝাবো কবিতাকে—তুমি আমাকে ভুলে যাও কবিতা। ডাক্তার সাহেবের চোখে পানি দেখে পিয়ন বললেন, 'কী হয়েছে স্যার?'

'না, কিছু না, আর কোনো রোগী আছে বাইরে?'

'না স্যার, কেউ নেই।'

'ঠিক আছে, ঘর বন্ধ করে দাও।'

চেম্বার ছেড়ে নিজের বেডরুমে গেলেন ডাক্তার সাহেব। বিছানায় শুয়ে কী যেন ভাবতে লাগলেন, মনে পড়ছে প্রথম দিন কবিতাকে দেখার সেই স্মৃতি-স্পর্শ।

একদিন রাতে রহিম আলী কেমন ছটফট করতে লাগলেন।

কবিতা বললো, 'বাবা, তোমার কী হয়েছে? এমন ছটফট করছো কেন বাবা?'

'বুঝতে পারছি না মা। আমার গলাটা কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে, পানি খাবো আমি।'

কবিতা বাবাকে পানি দিয়ে ছুটে গেলো ডাক্তারের কাছে।

'ডাক্তার সাহেব, ডাক্তার সাহেব দরজা খুলুন।'

দরজা খুললেন ডাক্তার। 'কী হয়েছে কবিতা? এতো রাতে?'

কেঁদে ফেললো কবিতা, বললো, 'বাবা যেন কেমন করছে।'

ডাক্তার তড়িঘড়ি এইডবক্স নিয়ে কবিতাদের বাড়ি আসে।

রহিম আলী ছটফট করতে করতে বললেন, 'তুমি এসেছো বাবা? আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। কবিতা বড় অসহায়, আপন বলতে ওর কেউ রইলো না, তুমি যদি পারো ওকে একটু দেখে রেখো বাবা। কবিতা আমাকে ক্ষমা করে দিস মা, তোর জন্য কিছুই করতে পারলাম না।'

'আমাকে ছেড়ে যেও না বাবা!' বাবার মুখটা ধরে কাঁদতে লাগলো কবিতা।

'কবিতা, কাঁদিস না মা, আমি তোকে দোয়া করে গেলাম, তোর জীবন খুব সুখের হবে।'

এর কিছুক্ষণ পরই রহিম আলী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

আকস্মিক বাবার মৃত্যুতে পাথর হয়ে গেলো কবিতা। ডাক্তার সাহেব ইচ্ছে করলেও দেখতে আসতে পারেন না কবিতাকে। কী যেন ভাবতে ভাবতে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। ঘর থেকে বেরিয়ে কবিতার খোঁজে ওদের বাড়ি গেলেন। কবিতা বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে কাঁদছিল।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কাছে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'ওঠো কবিতা, এভাবে প্রতিদিন কান্নাকাটি করলে শরীর খারাপ হবে। অসুস্থ হয়ে পড়বে। এসো, বাইরে চলো, একটু ঘুরে আসি কোথাও।'

'আমি যাবো না। আপনি যান।'

'প্লিজ কবিতা, চলো তো, এভাবে সব সময় ঘরে বন্দি থাকলে তোমার কষ্ট আরো বাড়বে। আমি নদীর পাড়ে গেলাম, তুমি এসো। আসছো তো?' চোখের দিকে তাকিয়ে 'না' বলতে পারলো না কবিতা।

নৌকায় চড়লো কবিতা, সাথে তার মনের মানুষ, চুপচাপ বসে। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'জানো কবিতা, মা চিঠি পাঠিয়েছে, পরশু আমার জন্মদিন। তাই বাড়ি যাওয়ার কথা লিখেছে। মা একেবারে অস্থির হয়ে পড়েছে, কয়েক মাস হলো আমার সাথে দেখা হয় নি তো।'

'কাল যাচ্ছেন তাহলে?'

'না, ছুটি নেই, ডাক্তার মানুষের আবার ওসব মানায় নাকি? তোমার জন্মদিন কবে?'

'পহেলা বৈশাখ।'

'বাহ্, খুব সুন্দর দিনে তোমার জন্ম হয়েছে তো!'

'দিনটাই শুধু সুন্দর, ভাগ্যটা খারাপ।'

'ভাগ্যের দোষ দিতে নেই। যখন তোমার বিয়ে হবে, ঘর-সংসার হবে, তখন দেখবে জীবনটা কতো সুন্দর। যুগ যুগ ধরে তখন বাঁচতে ইচ্ছে করবে। কী ভাবছো কবিতা?'

'না, কিছু না। সন্ধ্যা নেমে আসছে, বাড়ি ফিরতে হবে না?'

'কেন, আজকের রাতটা নৌকায় চড়ে কাটালে হবে না?' ডাক্তার সাহেবের কথা শুনে হাসলো কবিতা। ডাক্তার বললেন, 'আচ্ছা, তোমার নাম তো কবিতা। কয়টা কবিতা লিখেছো জীবনে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল, 'একটাও না।'

'তাহলে তো তোমার নাম সার্থক হলো না।'

'শুধু নাম না, আমার পুরো জীবনটাও সার্থক না। ঠিক আছে, একদিন একটা সুন্দর কবিতা লিখে আপনাকে গিফ্‌ট করবো।'

'কবে আসবে সেই দিন?'

'জানি না।'

'কবিতা, তোমার কোনো ছেলেবন্ধু নেই?'

'এ প্রশ্ন কেন হঠাৎ? বন্ধু তো সবারই থাকে। আসলে আমি কারো সাথে কখনো তেমন ফ্রি ভাবে মিশি নি। বাবা বলতো, তুই বড় হয়েছিস, ভালোমন্দ দেখে চলবি। সাদা কাপড়ে একবার দাগ লাগলে দামি সাবান দিয়ে ধুলেও তা আগের মতো পরিষ্কার হয় না।'

'তুমি খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে, চলো যাওয়া যাক।'

আট

গ্রামে চার দুষ্টু মেয়ে ছিল। কবিতা তাদেরকে আদব-কায়দা শিখিয়ে মানুষ করেছে। তাদের একজনের বিয়ে। আজ সকালে এসে ওরা কবিতাকে দাওয়াত করে গেছে। ওরা ডাক্তারকেও বড্ড জালাতন করেছে, তাঁকেও নিমন্ত্রণ করেছে।

কবিতা ভাবছে বিয়েতে কী উপহার দেবে। ভালো কিছু দিতে হলে অনেক টাকার দরকার। কিন্তু টাকা তো সীমিত। শহরে গেলো দুষ্টু মেয়েটির জন্য একটা শাড়ি আর জন্মদিনে ডাক্তার সাহেবকে উপহার দেয়ার জন্য একটা পাঞ্জাবি কিনতে।

দোকানে কবিতার সাথে ডাক্তার সাহেবের দেখা হয়ে গেলো।

'কবিতা, কার জন্য শাড়ি কিনছো, তোমার?'

'না, বিয়েতে উপহার দিতে হবে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, আমি পছন্দ করে দিই, এটা নাও। কবিতা, আমাকে খুব সুন্দর দেখে দুটো শাড়ি পছন্দ করে দাও তো।'

কবিতা দুটি শাড়ি পছন্দ করে দেয়ার পর ডাক্তার বলেন, 'কিছু খাবে, চলো।'

'না, কিছু খাবো না আমি।'

'চলো তো, সব কিছুতেই লজ্জা আর আপত্তি তোমার। আজকালের মেয়েদের মতো ফ্রি-ভাবে চলতে পারো না?'

হোটেলে বসে ডালপুরি আর মিষ্টি খেলো, সাথে চা। কবিতা ভাবলো, ডাক্তার সাহেবের সাথে ঘুরতে দেখলে কে কী ভাবে তার ঠিক নেই। তাই বললো, 'আমার জরুরি কাজ আছে, আমি যাই।'

'মিথ্যা বলার দরকার নেই। আমার সাথে ঘুরতে তোমার লজ্জা করছে, তাই তুমি চলে যেতে চাইছো। ঠিক আছে যাও, সাবধানে যেও। সন্ধ্যায় দেখা হবে।'

মনটা স্থির করে বাড়ি ফিরে এলো কবিতা। ভাবছে, দুটো শাড়ি কিনলেন কেন ডাক্তার সাহেব? পাঞ্জাবিটা খুলে দেখছে, পছন্দ হবে তো ওঁর?

ফুলতলী গ্রামে একটা রেওয়াজ আছে, সন্ধ্যার পর বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হয়। তার সাথে নাচ-গানের আসর জমানো হয়।

বিয়ের অনুষ্ঠানে নাচ-গান শুরু হলো। এক পাশে বরবধূ, অন্য পাশে মেহমানরা।

ডাক্তার সাহেব কবিতার চোখে তাকিয়ে, কবিতা হাসছে। গান শুনতে শুনতে ডাক্তার সাহেব হারিয়ে গেলেন আপন ভুবনে।

সকালবেলা চুপিচুপি ডাক্তারের ঘরে ঢুকে কিছু ফুল রাখলো আর একটা মোমবাতি জ্বেলে নরম আলো করে দিল কবিতা, তারপর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলো। ডাক্তার সাহেব ঘুম থেকে উঠে অবাক হলেন। কে করলো এমন কাজ? দরজায় আবার কে?

'কে?'

লাল গোলাপের তোড়া হাতে কবিতা বললো, 'শুভ জন্মদিন।'

'অনেক ধন্যবাদ, তোমার মনে আছে আজ আমার জন্মদিন?'

'শুধু আজ নয়, যতোদিন বাঁচবো মনে থাকবে।'

কবিতার দেয়া প্যাকেটটা খুলে বললো, 'বাহ্, খুব সুন্দর তো, তোমাকে টাকা খরচ করে আমার জন্য পাঞ্জাবি কিনতে কে বলেছে?'

'কেউ না, আমার কি ইচ্ছে হয় না তোমাকে কিছু দিতে? স্যরি ভুল হয়ে গেলো।'

'তুমি বলাতে? না, ভুল হয় নি। আমাকেও তুমি করে বললে খুব খুশি হবো।'

বসে আছে কবিতা। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'ভাবছি, আমার মেহমানকে কিভাবে কী দিয়ে আপ্যায়ন কররো। কী খাবে কবিতা?'

'আমি খেয়ে এসেছি।'

'কবিতা, আজ না আমার ঘরে জিন ঢুকেছিল।'

'সত্যি বলছেন, এটা কিন্তু খুব খারাপ লক্ষণ। শুনেছি ব্যাচেলর ছেলেদের ঘরে জিন ঢুকলে তাড়াতাড়ি বিয়ে না করলে অনেক সমস্যা হয়।'

'তা তো জানতাম না! আচ্ছা কবিতা, জিন মানুষকে ধরে কী করে?'

'তা কী করে বলবো? হয়তো কিছু একটা করে। তো, জিন ঢুকেছিল সেটা বুঝলেন কী করে?'

'এসো দেখাচ্ছি।' বলে ফুলের সাজানো দেখালো কবিতাকে।

'বাহ্, খুব সুন্দর তো! যা হোক, জিনটার রুচি আছে। আপনার মতো মানুষকে সে পছন্দ করেছে। মনে হয় ভালোও বাসে।'

'জিনটাকে পেলে কী করতাম জানো?'

'কী করতেন?'

'চেপে ধরতাম এই ভাবে।'

'আরে আরে, কী করছেন আপনি? আমি তো জিন না।'

'ও কবিতা, স্যরি স্যরি, রিয়েলি স্যরি। এই জিন, তুমি কখন ঢুকেছিলে আমার ঘরে?'

'মোটেও ঢুকি নি, আমি কেন আপনার ঘরে ঢুকতে যাবো? পুরুষের ঘরে মেয়েমানুষ ঢোকে নাকি, শরম লাগে না?'

'শরমটা আবার কী?'

'শরম হচ্ছে...আমি এখন চলে যাচ্ছি।'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আমিও তো চলে যাচ্ছি বন্ধু।'

'কোথায়?'

'ঢাকায়।'

'কেন?'

'এটা দেখো।'

বদলির অর্ডারের কাগজটা হাতে নিয়ে কবিতা কোনো কথা বলতে পারলো না। অন্তরফাটা কান্না তার চোখে। বৃষ্টির মতো ঝরঝর করে ঝরছে কবিতার চোখের পানি। ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। ডাক্তার সাহেব ডাকলেন। একটু দাঁড়ালো কবিতা। কবিতার হাতে শাড়ির প্যাকেটটা দিয়ে ডাক্তার বললেন, 'আমার জন্মদিনে তোমার জন্য এই উপহার।'

হাত বাড়িয়ে উপহারটা নিয়ে কাঁদতে লাগলো কবিতা।

ডাক্তার সাহেব ফুলতলী গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। ব্যাগপত্র নিয়ে নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ পর নৌকায় উঠবেন। অনতিদূরে বিষণ্ন বদনে ভগ্ন-হৃদয় বালিকা কবিতা।

ডাক্তার সাহেব বিদায় চাইলেন কবিতার কাছে। বিদায় জানানোর মতো কোনো ভাষা নেই কবিতার, শুধু নীরব চাহনিতে ক ফোঁটা অশ্রু উপহার দিল।

নৌকা ছেড়ে দিবে এখনই, ডাক্তার নৌকায় বসে আছেন। কবিতা আর্ত স্বরে ডেকে উঠলো, 'নতুন ডাক্তার, একটু শুনে যান প্লিজ।'

নৌকা থেকে নেমে এলেন ডাক্তার সাহেব। 'কিছু বলবে কবিতা?'

'আপনার ঠিকানাটা দিয়ে গেলেন না যে?'

'ও স্যরি, ঠিকানা লিখে রেখেছিলাম, দিতে মনে নেই। নাও। তুমি কি আমাকে ভুলে যাবে কবিতা?'

'না...।'

'আমাকে বিদায় দিতে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে? চোখের পানি মুছে ফেলো কবিতা, ভালো থেকো, চিঠি দিও।'

ঘরে ফিরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো কবিতা—'বহুবার চেষ্টা করেও বলতে পারি নি, নতুন ডাক্তার, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না।'

সেদিন ডাক্তার সাহেব ঢাকা ফিরে মামার বাসায় গেলেন। মামাতো বোন দৃষ্টির ঘরে ঢুকে বললেন, 'দৃষ্টিমণি কেমন আছো?' দৃষ্টি কোনো কথা বলে না। ডাক্তার আবার বলেন, 'কী হলো, কথা বলবে না? অভিমান করেছো? ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি।'

পিছন থেকে হাত ধরে ফেললো দৃষ্টি। 'এতোদিন কোথায় ছিলে আমাকে একা ফেলে? ফোন করো নি কেন?'

'পাগলি মেয়ে, অমনি চোখে পানি এসে গেলো? কেঁদো না। ওখানে এক আজব গ্রামে ছিলাম। না আছে ভালো কম্যুনিকেশন, না আছে শিক্ষিত মানুষ, সারা দিনরাত ট্রাই করেও নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না।'

'তাহলে থাকতে কিভাবে?'

'শুধু একজনের জন্য দিনগুলো এক রকম কেটে যেতো।'

'সে একজনটা আবার কে?'

'একটা মেয়ে। ওর নাম কবিতা।'

'তোমাকে নিয়ে আবার কবিতা লিখতে শুরু করে নি তো?'

'না না, তেমন কিছু হয় নি। তবে হয়ে যেতো আর কিছুদিন থাকলে। কবিতা আমাকে খুব ভালোবাসতো।'

'আর তুমি বাসতে না?'

'হ্যাঁ বাসতাম।'

'তাহলে বিয়ে করে নিয়ে এলেই পারতে।'

'কবিতাকে বিয়ে করে নিয়ে এলে তোমার কী হতো তখন?'

দৃষ্টি বললো, 'কিচ্ছু হতো না।'

'কাঁদছো কেন তাহলে? দৃষ্টি প্লিজ, আমি ওকে বন্ধুর চোখে দেখেছি, বন্ধু হিসেবে ভালোবেসেছি। আমার ভাবনা শুধু তোমাকে নিয়ে, বিশ্বাস করো, কবিতা আমার বন্ধু ছিল।'

'বন্ধু? পুরুষ মানুষের জীবনে মেয়েবন্ধু আসবে কেন? পুরুষের জীবনে একজনই আসবে, সে হবে প্রেমিকা বা স্ত্রী।'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'তাহলে ধরে নাও, কবিতা আমার প্রেমিকা। না, প্রেমিকা না, তার চেয়েও বেশি কিছু।'

'সে হয়তো তোমাকে আপন করে পাওয়ার আশায় অনেক স্বপ্ন দেখেছে। আমার কথা তাকে কিছু বলেছিলে?'

'না।'

'কেন বলো নি? বললে মেয়েটা তোমার কাছে ভিড়তো না, তাই না?'

'দৃষ্টি, আমাকে বুঝতে চেষ্টা করো, প্লিজ দৃষ্টি।'

'শাওন, আমি আর দূরে থাকতে পারছি না, বাড়িতে বলে এ মাসের মধ্যেই বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলবে, না হলে আমাকে পাবে না। আর একটা কথা, যতোদিন আমাদের বিয়েটা না হচ্ছে ততোদিন—তোমার কাছে অনুরোধ, আমাদের বাসায় আসবে না, এমনকি আমার সাথে দেখাও করবে না।'

'দৃষ্টি, অমন পাগলের মতো কথা বলছো কেন তুমি?'

'ঠিকই বলেছি।'

'অবুঝের মতো কথা বলো না দৃষ্টি। এক মাস কেন, এক বছরের মধ্যেও আমার পক্ষে বিয়ের কথা ভাবার সময় নেই। কারণ, আমি ডক্টরেট করতে বিদেশে যাবো।'

'ওকে মিস্টার শাওন, ফিরে এসে আমাকে পাবে না।'

'নো নিড। যে ভালোবাসা অপেক্ষা করে না, তেমন ভালোবাসা আমি চাই না।'

দৃষ্টি বললো, 'চাইবে কেন? না চাইতেই তো অনেক কিছু পেয়েছো।'

ওদের কথা কাটাকাটির আওয়াজ পেয়ে দৃষ্টির মা ঘর থেকে বেরিয়ে বললেন, 'কী হয়েছে দৃষ্টি? শাওন, তুমি কতোক্ষণ বাবা? বসো।'

পায়ে হাত দিয়ে মামিকে সালাম করলো শাওন। দৃষ্টি ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদে গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে আর দু চোখের পানি অনবরত ঝরছে। শাওন বললো, 'মামি, আমি চলে যাচ্ছি।'

'কেন, কী হয়েছে? এতো রাতে কোথায় যাবে? দৃষ্টি তোমাকে কিছু বলেছে?'

'না, বলে নি। জরুরি প্রয়োজনে আমার ঢাকার বদলিটা ক্যানসেল করেছে। নতুন পোস্টিং মাদারীপুরে। আগামী মাসের এক তারিখে জয়েন করতে হবে।'

'সে তো অনেক দেরি। সে কটা দিন এখানেই থাকো বাবা।'

মামির অনুরোধে শাওন অভিমান ভেঙ্গে থেকে যায়।

দৃষ্টি ভাবলো, কবিতা গাঁয়ের সহজ-সরল মেয়ে, আমার কারণে ও কেন কষ্ট পাবে? আমি আকাশের কাছে ফিরে যাবো। ও আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসে।

বেশ কিছুদিন পার হয়ে গেছে। একদিন দুপুরের পর স্কুল থেকে ফিরে ডাক্তারের দেয়া শাড়িটা ধরে কাঁদছে কবিতা। স্মৃতিগুলো ওর অন্তরে অহর্নিশি ঝড় তোলে। এমন সময় সাইকেলের বেল বাজানোর শব্দ শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

পিয়ন বললো, 'কবিতা কে? আপনি?'

'জি।'

'আপনার চিঠি।'

খুশি হয়ে চিঠিগুলো হাতে নিয়ে দেখলো সেগুলো ওরই লেখা। ডাক্তারের অনুপস্থিতিতে চিঠিগুলো ফেরত এসেছে।

চিঠিগুলো হাতে নিতে কবিতার বুক ফেটে যায়। দু চোখে অবিরল ঝরতে লাগলো ব্যথার অশ্রু।

তবুও কবিতা আশায় বুক বাঁধে—একদিন ফিরে আসবে তার মনের মানুষ। নদী পার হয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে, কল্পনায় ডাক্তারকে ফিরে পায়, পরক্ষণে সব কল্পনা মিলিয়ে যায়, ক ফোঁটা চোখের জল ফেলে ফিরে আসে ছোট্ট কুটিরে।

মাতব্বর সাহেব হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁর ছেলের সাথে কবিতার বিয়ে দিবেন। কবিতার কাছে প্রস্তাব রাখলে কবিতা বললো, 'আমি একজনকে ভালোবাসি, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আপনারা যেতে পারেন।' কবিতার কথা শুনে দুই ঘটক ফিরে এসে মাতব্বরকে বললে মাতব্বর রেগে গেলেন।

বালিশে মাথা দিয়ে কাঁদছে কবিতা। জোরপূর্বক মাতব্বর সাহেব বিয়ের দিন ধার্য করেছেন।

বকুল খুব খুশি। বিয়ের আগের দিন হলুদমাখা অবস্থায় বুকলের কাছে খবর পাঠালো কবিতা—জরুরি দরকার। দেখা করতে চাই। বকুল আনন্দে ছুটে এলো।

'কী হয়েছে কবিতা? এনি প্রবলেম?'

'ইয়েস।'

'কী সমস্যা, বলো?'

'তুই কি আমাকে ভালোবাসিস বকুল?'

'কবিতা, আজ বাদে কাল তুই আমার বউ হতে যাচ্ছিস। তাছাড়া ছোটবেলা থেকে মনে মনে আমি তোকে ভালোবেসে আসছি। আর এখন হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন তোর মুখে?'

'তুই কি আমার সুখ চাস, সত্যি করে বল্?'

'কবিতা, আমি চাই জগতের সমস্ত সুখ এসে তোর জীবনটা ভরে দিক, আমি চাই তোর জীবনে দুঃখের কোনো ছায়া যেন না আসে।'

'তাহলে আমার একটা কথা রাখতে হবে। রাখবি কিনা বল্।'

'হ্যাঁ রাখবো, বল্ কী কথা?'

'আমার মাথায় হাত রেখে বল্।'

'হ্যাঁ রাখলাম।'

'তোর বাবাকে বলবি—বলবি আমাকে তোর পছন্দ নয়, এ বিয়ে হবে না।'

বকুলের মাথায় মেঘ চমকালো। 'এ তুই কী বলছিস কবিতা?'

'হ্যাঁ ঠিকই বলছি, আমার মতের বিরুদ্ধে জোর করে তোর বাবা আমার সাথে তোর বিয়ে দিতে চান।'

'আমাকে বিয়ে করতে তোর অসুবিধা কোথায়, কবিতা?'

'আছে, আমি একজনকে ভালোবাসি।'

'ভালোবাসিস? কাকে ভালোবাসিস?'

'তাকে তুই চিনবি না।'

ছলছল দৃষ্টিতে বকুল বললো, 'কবিতা, এখন আমাকে কী করতে হবে বল্?'

'এ গ্রাম ছেড়ে আমি চলে যাবো। তুই আমাকে নদীটা পার করে দিয়ে আসবি। এখানে থাকলে তোর বাবা আমার ওপর অত্যাচার করবেন।'

'ওকে, এ্যাজ ইউ লাইক। তবে মনে রাখিস কবিতা, ভালোবাসা অনেক সময় আবার ছলনায় পরিণত হয়। গভীর প্রেমে বড় জ্বালা।'

ভোরবেলায় বকুল কবিতাকে নদী পার করে ট্রেনে তুলে দিয়ে বিমর্ষভাবে বাড়ি ফিরে এলো।

ডাক্তার সাহেব যে ঠিকানা দিয়েছিলেন সেখানে গিয়ে জানতে পেলো অনেকদিন আগেই ডাক্তার বদলি হয়ে চলে গেছেন।

কলেজ জীবনের এক বন্ধুর ফ্ল্যাটে কয়েকদিন থেকে বন্ধুকে সাথে নিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করলো কবিতা। ডাক্তার শাওনকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে মানসিক ভাবে ভীষণ ভেঙ্গে পড়লো।

মাতব্বর অন্য মেয়ের সাথে তার ছেলের বিয়ে দিলেন। এক চামচা এসে মাতব্বরকে বললো, 'মাতব্বর সাব, কবিতা নাকি ঢাকার শহরে পরপুরুষের লগে রিকশায় ঘুইরা বেড়ায়। মাইয়াডা শেষ পর্যন্ত এমন ব্যাশ্যা হইয়া গেলো! ছিঃ ছিঃ ছিঃ, গ্যারামের মান-ইজ্জত সব ভাইসা গেলো।'

মাতব্বর রাগে গজগজ করতে লাগলেন।

বন্ধুর স্ত্রী অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কবিতাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল। কবিতা ভাবলো, বকুলকে কষ্ট দিয়ে ভুল করেছি। নিজেকে সে সৎ ও স্বাভাবিক ভাবলেও গ্রামের লোকেরা তা মেনে নিতে পারলো না।

কবিতা ফিরে আসার পর মাতব্বর লোকজন ডেকে সারা গ্রামে ঢোল পিটিয়ে জানালেন—নষ্ট মেয়েকে এই গ্রামে রাখা যাবে না। চুল কেটে মাথায় আলকাতরা মেখে কাল সকালে কবিতাকে গ্রামছাড়া করবেন।

নীরব কবিতা, প্রতিবাদ করার মতো কোনো সাহস বা শক্তি তার নেই। সারারাত কাঁদলো। ভোরের আজান কানে এলো। নামাজ পড়ে জায়নামাজে বসে কাঁদতে লাগলো—হে খোদা, তোমার আদালতের চেয়েও মানুষের আদালত কঠিন। এ কেমন বিচার খোদা?

এর মাঝে কে যেন দরজায় শব্দ করছে, চম্‌কে উঠলো কবিতা। 'এই কবিতা, কবিতা! কবিতা! দরজা খোল্, আমি বকুল।' দরজা খুলে বুকলের বুকে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলো কবিতা। বকুল বললো, 'চুপ কর্ কবিতা, এখন কাঁদবার সময় না। তোর যা যা নেয়া দরকার নিয়ে নে, আমি তোকে নদী পার করে দিয়ে আসছি। সকাল হয়ে গেলে আর যাওয়া যাবে না।'

মায়ের মতো আপন, গ্রামের সমস্ত জায়গায় সে বাবা-মায়ের স্মৃতি খুঁজে পায়, যেখানে জুড়ে আছে আনন্দ-বেদনার অনেক স্মৃতি। সে গ্রাম ছেড়ে যেতে কবিতার বুকটা ফেটে যাচ্ছিল।

মাঝির ঘুম ভাঙ্গে নি তখনো। ডাক দিল। কবিতা আর বকুল নৌকায় চড়লো। মাঝি কবিতাকে খুব ভালোবাসতো। বললো, 'কবিতা, তুই পালিয়ে যাচ্ছিস মা? যা, মেলা পশুর মাঝে একটা মানুষ বাস করতে পারে না।'

বিদায়-বেলায় কবিতা-বকুল দুজনেই কাঁদতে লাগলো। বকুল বললো, 'ভালো থাকিস কবিতা, তোর জন্য দোয়া রইলো।'

কবিতা বললো, 'বকুল, আমাকে ক্ষমা করিস। তোকে আমি খুব কষ্ট দিয়েছি।'

'তুই ভালো থাকিস...।'

কোথায় যাবে কবিতা, ভাবতে লাগলো। ট্রেন থেকে নেমে ভাবলো—ডাক্তার সাহেবের গাঁয়ের বাড়িতে গেলে কি আমাকে তাড়িয়ে দেবে?

প্রায় সন্ধ্যা নেমে এসেছে। রিকশা নিল কবিতা, এক দোকানিকে ঠিকানাটা দেখিয়ে জানতে চাইলো আর কতোদূর। দোকানি বললো—বেশ দূর, হেঁটে যেতে হবে। রিকশা যাবে না।

হাঁটতে লাগলো কবিতা। ডাক্তার সাহেবের বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে ব্যাগটা রেখে দরজা ধাক্কাতে লাগলো। ভিতর থেকে শব্দ হলো, 'কে?'

'আমি, দরজাটা খুলুন।'

এক মহিলা দরজা খুলে বললেন, 'কে তুমি? কোত্থেকে এসেছো? কাকে চাও?'

'ডাক্তার সাহেব বাড়িতে আছেন?'

'না, তুমি চেনো শাওনকে?'

'জি, আমার পরিচিত।'

'কী দরকারে এসেছো?'

'ডাক্তার সাহেবের সাথে একটু দেখা করতে এসেছি।'

'শাওন বাড়িতে থাকে না। তুমি যেতে পারো।' বলে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন, তারপর আবার দরজাটা একটু খুলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কী?'

'কবিতা।'

'ঠিক আছে, শাওন এলে ওকে বলবো।'

'ডাক্তার সাহেব আপনার কে হোন?'

'আমি ওর মা।'

'ও আচ্ছা, আসি মা।'

মা বলে ডেকে কবিতা চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারলো না। কবিতাকে কাঁদতে দেখে ডাক্তারের মা বিস্মিত হলেন, বললেন, 'কী হয়েছে তোমার, কাঁদছো কেন?'

'না, কিছু হয় নি।' বলে ফিরে এলো কবিতা। চোখ মুছতে মুছতে আবার হাঁটতে শুরু করলো। কোথায় যাবে ভাবতে পারছে না। পাশের গ্রামে এক বাড়ির বারান্দায় গিয়ে বসলো। ঐ বাড়ির ছোট বউয়ের মনটা বড়ই উদার। কবিতাকে দেখে কাছে এসে বললো, 'তুমি কে বোন? এখানে বসে আছো কেন? ভিতরে চলো।'

এই বাড়িতেই কয়েকদিন কেটে গেলো কবিতার। সে মানসিক এবং শারীরিক ভাবে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ডাক্তার দেখালে ডাক্তার বললেন, 'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কী অসুখ হয়েছে। অনেকগুলো টেস্ট করাতে হবে।'

গ্রামে মাইকিং হচ্ছে—শহর থেকে বড় ডাক্তার আসছেন, ফ্রি রোগী দেখবেন। ডাক্তার আসার কথা শুনে রোগীদের লাইন পড়ে গেছে।

ছোট বউ বললো, 'কবিতা, চলো তোমাকে নিয়ে যাই ডাক্তারের কাছে।'

মলিন মুখে কবিতা জানতে চাইলো, 'কোথায় আপা?'

'ডাক্তারের কাছে।'

উৎফুল্ল হয়ে কবিতা বললো, 'ডাক্তার সাহেব ফিরেছেন আপা?'

'ফিরেছেন মানে, উনি তো এই প্রথম আসছেন এ গ্রামে।'

'ও। থাক না আপা, রোজ রোজ আমাকে নিয়ে তোমার অতো কষ্ট করার দকরার নেই।'

'না কবিতা, তা হয় না, তোমাকে সুস্থ করে তোলা আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য, চলো। আগের রিপোর্টগুলো নিয়েছো কবিতা?'

'জি নিয়েছি।'

অনেক বড় লাইন পড়েছে। সব শেষে কবিতা। ছোট বউ কবিতাকে রেখে বাড়িতে টাকা নিতে এসেছিল। অন্যমনস্ক ভাবে মাথা নিচু করে ডাক্তারের সামনে চেয়ারে বসে আছে কবিতা।

ডাক্তার সাহেব আগের রিপোর্টগুলি দেখতে দেখতে বললেন, 'মনে হচ্ছে খুব বড় একটা অসুখ হয়েছে আপনার। এতোদিন চিকিৎসা করান নি কেন? কী নাম আপনার?'

নিচু স্বরে মাথা নিচু করেই জবাব দেয়, 'জি—কবিতা।'

এমনও তো প্রেম হয়, যা চোখের জলে কথা কয়, নিজে নিজে জ্বলে পুড়ে পাষাণে বাঁধে যে হৃদয়।

'কবিতা, তোমার এই অবস্থা কী করে হলো? এখানে কিভাবে এলে তুমি?'

রুমে ঢোকার সময় ডাক্তারের মুখের দিকে তাকায় নি কবিতা। সহসা তাঁর দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, কোনো কথা বলতে পারে না। শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ দেখে কবিতাকে দ্রুত ঢাকায় নিয়ে চিকিৎসা শুরু করলেন। কবিতাকে রাখার মতো কোনো জায়গা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত দৃষ্টিদের বাড়িতে রাখলেন। এক সময় দৃষ্টি জানতে পেলো—এই সেই মেয়ে, যে শাওনকে ভালোবাসে। যাকে নিয়ে নদীর কিনারে মেতে থাকতো শাওন। দৃষ্টি মনে মনে ভাবলো—শাওনই কবিতার অসুস্থতার কারণ। শাওনকে ভালোবেসে কবিতা আজ মৃত্যুর মুখে। শাওন কেন এমন করলো, কবিতাকে কেন মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল?

বেশ কিছুদিন আগেই শাওন আর দৃষ্টির বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ কবিতার আগমনে সবকিছু কেমন উলট-পালট হয়ে যাচ্ছে।

দৃষ্টি কবিতাকে সহ্য করতে পারে না। কবিতার ব্যাপারে শাওন আর দৃষ্টি ছাড়া কেউ জানে না। দৃষ্টি কবিতার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। কবিতা শুয়ে ছিল। উঠে বসলো।

দৃষ্টি বললো, 'শাওনের সাথে তোমার কতো দিনের পরিচয়?'

একটু পরে উত্তর দিল কবিতা, 'এ বছরের গোড়ার দিকে।'

'আমি শাওনের কে, তোমার জানা আছে?'

'না।'

'জানলে নিশ্চয় এখানে আসতে না।'

কোনো উত্তর দিল না কবিতা। কিছু ফল হাতে শাওন ঘরে ঢুকলো। কবিতা চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলো, কিছু বললো না। দৃষ্টি শাওনকে আসতে দেখে নিজের ঘরে চলে গেলো। শাওন বললো, 'দৃষ্টি তোমাকে কিছু বলেছে কবিতা?'

কবিতার চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ছে। শাওন ভাবলো, দৃষ্টি নিশ্চয়ই কবিতাকে আঘাত দিয়ে কথা বলেছে। কবিতার শাড়ির আঁচল টেনে চোখ দুটো মুছিয়ে বললো, 'কবিতা, কেঁদো না প্লিজ।'

একদিন রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে দৃষ্টি শাওনের রুমে গেলো। শাওন না ঘুমিয়ে বসে বসে কী যেন ভাবছিল।

'কী ব্যাপার দৃষ্টি, এতো রাতে ঘুমাও নি তুমি?'

দৃষ্টি রেগে বললো, 'না, তুমি আমার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছো। কবিতাকে এ বাড়িতে কেন এনেছো? তোমার ভালোবাসার মানুষটাকে আমার সামনে না এনে অন্য কোথাও রাখলেই পারতে। কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটা কেন দিচ্ছো? কেন?'

'দৃষ্টি প্লিজ। কবিতা আমার জীবনে ভালোবাসার স্মৃতি হয়ে এসেছে এবং চলেও যাবে এক সময়। ও আর বেশিদিন বাঁচবে না। ওর জীবনের আয়ু শেষ হয়ে আসছে। কবিতার ক্যান্সার।'

পাশের ঘর থেকে চমকে উঠলো কবিতা। ওদের কথাগুলো সবই শুনছিল। মৃত্যুর কথা ভেবে আর বাঁচার স্বপ্নগুলো মনে করে চোখের পানি ফেলে রাত কাটালো সে। পরদিন সকালে ডাক্তার সাহেব ওষুধ হাতে কবিতার রুমে ঢুকে দেখলেন কবিতা ঘরে নেই। বিছানার ওপর একটা কাগজ ভাঁজ করা অবস্থায় পড়ে আছে। আস্তে এগিয়ে কাগজটা হাতে নিলেন।

ভাঁজ খোলো, চক্ষু মেলো, করো কবিতার তর্জমা।

ভাঁজ খুলে দেখলেন :

নতুন ডাক্তার,

আমাকে ক্ষমা করবেন, আমার কারণে হয়তো অনেক কষ্ট পেয়েছেন। আমি কিন্তু আপনাকে কষ্ট দিতে চাই নি, কেন যে এমন হলো! যেদিন প্রথম নদীর কিনারে আপনাকে দেখেছিলাম, তখন কিন্তু আমি জানতে পারি নি আপনি একজন বড় ডাক্তার! আপনার সেবার পরশ পেয়ে কতো মানুষ নতুন জীবন ফিরে পায়, বাঁচতে চায় নতুন করে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমরা কতো প্রদীপ জ্বালি, কিন্তু জীবন-প্রদীপ একবার নিভে গেলে শত চেষ্টাতেও তাকে আর জ্বালানো যায় না।

প্রতি ক্ষণে কতো না হাজার ফুল ফোটে, কিন্তু সব ফুলের জীবনেই ফুলদানি জোটে না, কিছু ফুল কলি থেকেই ঝরে যায়, আর কিছু ফুটে ঝরে যায়।

আমার জীবন ঠিক ফুটে ঝরে যাওয়া ফুলের মতোই। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের জীবনে একটা অবলম্বন থাকে, যা আমার নেই। টাকা-পয়সা অর্থবৃত্ত কিছুই নেই, আমার আছে শুধু একটি হৃদয়, সেখানে যার নাম আমি লিখেছি সে আমাকে কখনো বোঝার চেষ্টা করে নি, আমি অসহায় বলে ঘৃণা করেছে। এই ছোট্ট জীবনে অনেক আশা ছিল, ছিল স্বপ্ন, সবই পড়ে আছে, শুধু মিটেছে একটি আশা—আমি একজনকে ভালোবাসতে পেরেছি।

এই শাড়িটা আপনি আমাকে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন, আমার বুকটা তখন আনন্দে ভরে গিয়েছিল; কেঁদে উঠেছিল অন্তর—যখন জানতে পারলাম এটা বিদায়ী উপহার। ভেবেছিলাম, আমার কোনো শুভক্ষণে শাড়িটা গাঁয়ে জড়িয়ে সুখের কথা কিছু ভাববো। কিন্তু আমার সে আশা, আশাই রয়ে যাবে, তাই শাড়িটা রেখে গেলাম।

আপনার ভালোবাসার দৃষ্টিকে দেখলাম, খুব ভালো মেয়ে; দৃষ্টিকে বিয়ে করে সুখী হোন। সুখে থাকুন।

আপনাদের মাঝে আমি ভালোবাসার দেয়াল হয়ে দাঁড়াতে চাই না। তাই চলে গেলাম, যেখানে যতো দূরেই থাকি, প্রতিক্ষণে আপনাকে মনে রাখবো। দোয়া করবো, পৃথিবীর সমস্ত সুখ যেন আপনাকে ঘিরে থাকে। সুখী হতে সবাই চায়, সবার কপালে সুখ সয় না। বাঁচতে চায় সবাই, কিন্তু মৃত্যু এসে ডাক দেয় বারবার। নৌকা নদীর কিনারে ভিড়লেও যে-স্রোত একবার বয়ে যায় সে আর কখনো ফিরে আসে না।

আমার লিখা একটা কবিতা আপনাকে উপহার দিতে চেয়েছিলাম, অনেক কষ্ট করে লিখলাম একটা কবিতা—বেদনার জল। আমার কাঁচা হাতে এটা কোনো কবিতা হয় নি জানি, কিন্তু এর প্রতিটি লাইনই আমার জীবনের ছায়া। শাওন—আপনার নামটা খুব মধুর। আপনার চোখ দুটো অ-নে-ক সুন্দর! মিষ্টি আপনার কথাগুলো।

আমার ক্যান্সার হয়েছে সে কথা আপনি গোপন রাখলেও আমি সব জেনেছি। জীবনে অনেক কিছুই তো পেলাম না, না-পাওয়ার বেদনায় কেঁপে ওঠে অন্তর, অঝরে ঝরে দুটি চোখে।

যে চোখে হঠাৎ ভেসেছিল সুখের শাওন
জানি না সহসা কেন উঠলো ঢেউ, নামলো বর্ষণ।
স্মৃতির ঢেউয়েরা ক্ষণে ক্ষণে অন্তরে দোলে,
নিজেকে বিলীন করে সাগরের গভীরতা নদী কি কখনো ভোলে?
পাহাড় বেয়ে ছুটে চলে ঝরনা অবিরল,
ঐ তো মলিন দুটি আঁখি যাতে শুধু বেদনার জল!
প্রাণে গাঁথা ছোট ছোট স্বপ্নগুলো সবই সেদিন নিঃশেষ হয়েছিল।
অভাগীর জীবনের কর্মের ফল
ভগ্ন হৃদয়ে সমুদ্রধারা—যেমন বয়ে চলে শ্রাবণের ঢল।
মাঝি কভু জানে না—মাঝপথে ঝড় উঠবে কিনা।
অর্ধেক ভালোবাসা নয়তো প্রেম, সে শুধু ছলনা।
গভীরে ঠাঁই দিয়ে সবটুকুই করেছিল উজাড়,
তার নয়নে ছিল সৌন্দর্যের বান—
মুহূর্তে সঁপেছিল অবলা তার হৃদয়-মন-প্রাণ।
সে শুধু ভালোবাসার আশ্বাস দিয়েছিল,
ছলনার জাল টেনে অবশেষে সবটুকুই কেড়ে নিল।
টু-জিরো জিরো ফোর, দুই হাজার চার,
পৃথিবীতে কখনো ফিরে আসিবে না আর।
রয়ে গেলো অন্তরে ছোট-বড় অসংখ্য ঢেউ,
হৃদয়ের গভীরে দিবানিশি দোলে বেদনা, বোঝে কি তা কেউ?
যার বুকে নেই ভালোবাসা স্নেহ-মমতা,
কী করে বুঝবে সে অপরের ব্যথা?
ফুরিয়ে গেছে সময় যে তার,
সে কারো ভালোবাসা পায় নি, কোনোদিনই চাইবে না আর।

—কবিতা

দৃষ্টিদের বাসা থেকে বেরিয়ে এসে কবিতা বাসের টিকিট নেয়ার জন্য রাস্তা পার হচ্ছিল। খানিকটা যেতেই মাথা ঘুরে রাস্তায় পড়ে গেলো।

সামনে একটা গাড়ি থামে। গাড়ির তরুণ ভদ্রলোক কবিতাকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। মাথা সামান্য ফেটে রক্ত ঝরছিল, কিছুক্ষণের মধ্যে জ্ঞান ফিরলে কবিতা জানতে চাইলো—'আমি এখানে কেন?' ভদ্রলোক বললেন, 'তোমাকে আমি রাস্তা থেকে তুলে এনেছি। কোথায় যাবে তুমি? তোমার ঠিকানাটা বলো।'

'ঠিকানা?' কবিতার চোখ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। ভদ্রলোক বললেন, 'তোমার কিছুই হয় নি। ঠিকানাটা বলো, বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসবো।'

'ভাইয়া, আমার কোনো ঠিকানা নেই। এ পৃথিবীতে কেউ নেই, বাবা কিছুদিন আগে মারা গেছেন।' এটুকু বলে কাঁদতে লাগলো কবিতা।

ভদ্রলোক বললেন, 'কেঁদো না বোন, যার কেউ নেই, তার আল্লাহ্ আছেন। আমি তোমাকে বাসায় নিয়ে যাবো, তুমি আজ থেকে আমার আশ্রয়ে থাকবে।'

কবিতাকে সাথে করে বাসায় নিয়ে গেলেন। রাত্রি বেলায় কবিতা আরো অসুস্থ হয়ে পড়লো, সারারাত ধরে ছটফট করলো।

সকালে নাস্তার টেবিলে বসে ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে বললেন, 'যাও, মেয়েটাকে ডেকে নিয়ে এসো।'

ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকে দেখলেন কবিতা অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে ফোন করে ডাক্তার ডেকে আনলেন। জ্ঞান ফেরার পর ডাক্তার সাহেব বললেন, 'কবিতা, আপনার কী অসুখ হয়েছে? আমাকে সব খুলে বলুন।'

'তেমন কিছুই হয় নি, রিপোর্ট দেখলেই বোঝা যাবে।'

রিপোর্টগুলো হাতে নিয়ে ডাক্তার সাহেব চমকে উঠলেন। ভদ্রলোককে ডেকে নিয়ে বললেন, 'রিপোর্টে তো ক্যান্সার লিখা আছে, মেয়েটা আর বেশিদিন বাঁচবে না, আপনি ওকে বাসায় না রেখে যে কোনো হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিন।'

ভদ্রলোক কবিতার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'কবিতা, চলো তোমাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিই, অসুখ সেরে গেলে আবার আমরা সবাই একসাথে থাকবো।'

চোখে অশ্রু আর মুখে হাসি নিয়ে কবিতা বললো, 'মৃত্যুর পরে কেউ কারো সাথে থাকতে পারে না ভাইয়া। আমি জানি আমার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। বেঁচে থাকায় আমার কোনো সাধ নেই। তবু ভাইয়া, আমি যাবো, আমাকে রেখে আসুন হাসপাতালে, নার্স ডাক্তারদের সেবা পেলে আমার আয়ু বেড়েও যেতে পারে।'

কবিতা দৃষ্টিদের বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর থেকেই শাওন তাকে পাগলের মতো খোঁজাখুঁজি করছে। কবিতার স্মৃতিগুলো ক্ষণে ক্ষণে অন্তরে দোলা দিতে থাকে, ফেলে যাওয়া শাড়িটা হাতে নিয়ে কল্পনা করে—এই শাড়ি পরে কবিতা বউ সেজে তার দিকে হাসতে হাসতে ছুটে আসছে।

কবিতার লেখা চিঠিটা টেবিলে রেখে তার ওপর মাথা দিয়ে কাঁদছিল শাওন, দৃষ্টি মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, 'শাওন, প্লিজ, অতো টেনশন করছো কেন তুমি? কবিতা

যদি সত্যি সত্যি তোমাকে ভালোবেসে থাকে তাহলে মৃত্যুর আগে অন্তত একবার হলেও তোমাকে দেখতে চাইবে।'

'দৃষ্টি, কবিতা যদি ভালো হয়ে যায়, বেঁচে থাকে তাহলে আমাদের মিলনে তুমি কি বাধা দেবে?'

'না, আমি তো চাই কবিতা বেঁচে থাকুক, আমি নিজ হাতে তোমাদের বাসর সাজাবো।'

'সত্যি বলছো, দৃষ্টি?'

চোখের পানি মুছে দৃষ্টি বললো, 'হ্যাঁ সত্যি, তুমি দেখো, তোমার কবিতা ফিরে আসবে।'

কবিতা হাসপাতালের বেডে শুয়ে মৃত্যুর দিন গুনছে। কোনো ডাক্তার এলেই তাঁকে প্রশ্ন করে, 'এখানে কোনো নতুন ডাক্তার আছেন?'

'না। যাঁরা আছেন সবাই পুরনো। কেন, নতুন ডাক্তার এলে কি তোমার অসুখ তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে?'

কোনো উত্তর না দিয়ে একটু হাসে কবিতা।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর শাওন কবিতার সন্ধান পেলো। হাসপাতালের বেডে কবিতার উদাস-ঝাপসা চোখ, ওর চারপাশে নার্স-ডাক্তার দাঁড়িয়ে, শেষ মুহূর্ত ওর এলো বুঝি। কবিতা বিড়বিড় করছে, যন্ত্রণায় ছটফট করছে, কেউ অশ্রু ধরে রাখতে পারছে না।

ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে কবিতার শিয়রের কাছে অস্থির ভাবে বসে শাওন। কপালে কাতর হাত রেখে ডাকে, 'কবিতা!'

কবিতা অস্পষ্ট উচ্চারণে হয়তো জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনি কি নতুন ডাক্তার?' কিন্তু এরপর নতুন ডাক্তারের বুকফাটা আর্তনাদেও কবিতার আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না, কোনোদিনই না।

• • •

খাঁচা

মাসউদ আহমাদ

উৎসর্গ :

আমার লেখার অনুরাগী পাঠক, যে-তোমাকে চিনি—

এ কে এম সালাহউদ্দীন—কোদালিয়া, টাঙ্গাইল
রোকেয়া খাতুন (শিক্ষিকা)—পুঠিয়া, রাজশাহী
নুসরাত জাহান নূপুর—কলেজ রোড, বরিশাল
ডাঃ হাফিজুর রহমান জুয়েল—দূর্গাপুর, রাজশাহী
স্বপ্না কুজুর—সেন্ট ভিনসেন্ট হসপিটাল, দিনাজপুর
গোলাম সারওয়ার পথকলি—রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
আরিফ বখতিয়ার—ছড়াড্ডা ছড়া সংসদ, বগুড়া
এবং
যে-তোমাকে চিনি না, তাকেও...

লেখক-পরিচিতি

লেখক-নাম মাসউদ আহমাদ হলেও পারিবারিক নাম মাসুম আহমেদ। জন্ম ৩ অক্টোবর ১৯৭৯, রাজশাহী জেলার পুঠিয়া থানার ভালুকগাছি দমদমা গ্রামে। বাবা নূরুল ইসলাম অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য, মা খোদেজা খাতুন গৃহিণী। চার ভাইবোনের মধ্যে মাসউদ আহমাদ দ্বিতীয়। বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অধ্যয়নরত।

কবিতা দিয়ে লেখালেখি শুরু হলেও ইদানীং প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও ফিচার এবং গল্প লিখছেন। সবুজ অঙ্গনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এবার লিখলেন 'অণু-উপন্যাস' এবং এটিই হবে তাঁর প্রথম প্রকাশিত অণুগ্রন্থ। যুগপৎ, একুশে বইমেলা ২০০৬-এ 'কলমবন্ধু ও অন্যান্য গল্প' নামে তাঁর একটি ছোটগল্পের বই বের হচ্ছে।

এক

ছুটির দিনে বড় একা আর অসহায় লাগে রোমেলের।

সপ্তাহের আর সব দিন কোনো না কোনোভাবে কেটে যায়। ব্যস্ততার বহতা নদীতে ভেসে চলে সেইসব দিনের অখণ্ড সময়গুলো। ডিপার্টমেন্টে নিয়মিত ক্লাসে যাওয়া, টিউশনি আর শিউলি নামের অভিমানী বান্ধবীটাকে সঙ্গ দেয়া—মোটামুটি এই জাতীয় কাজ ও অকাজের মধ্য দিয়ে দিনগুলো কেটে যায়। কিন্তু শুক্রবার কিংবা সরকারি ছুটির দিনগুলো যেন কাটতেই চায় না।

আজ একটু বেলা করেই ঘুম ভেঙ্গেছে রোমেলের। হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হলো প্রথমে। এরপর দৈনিক পত্রিকায় চোখ বুলিয়ে নিজের রুমে চলে এলো। শার্ট-প্যান্ট পরে তৈরি হতে যাবে, এমন সময় খেয়াল হলো আজ ছুটির দিন। ঠিক তখনই যেন একটা স্থবিরতা এসে ভর করলো।

রুমে অবশ্য কিছু কাজ জমে আছে। কাপড়গুলো ধুতে হবে। বাড়িতে একটা চিঠি লেখাও জরুরি। কিন্তু কেমন যেন একটা অলসতা এসে ভর করেছে মনের ওপর। সকাল থেকেই আকাশটা মেঘলা হয়ে আছে। যেন বিষণ্নতা ভর করেছে আকাশের গায়ে। আর তার ছায়া পড়েছে রোমেলের সমস্ত শরীরে। মাঝে মাঝে মনে হয়, মানুষের অসীম দুঃখ-কষ্টগুলোই বোধ হয় মেঘ হয়ে আকাশের বুকে ভেসে বেড়ায়। তখন চারদিকে আঁধার নেমে আসে। দুঃখ-হতাশাগুলো নিঃশব্দে আমাদের জীবনের পথে ব্যারিকেড দেয়।

মেসের বড় ভাই সালাহউদ্দিন এসে জানালো, একটা মেয়ে রোমেলের খোঁজ করছে। বাইরে এসে চমকালো রোমেল—'শিউলি তুমি!'

'কেন, আসতে নেই বুঝি?'

'না, মানে, আমাদের এই জীর্ণ মেসবাড়িতে তোমার পদচারণা কাঙ্ক্ষিত অবশ্যই। কিন্তু প্রত্যাশিত নয়।'

'এভাবে বলছো যে, আমার হুট করে চলে আসায় রাগ করেছো।'

রোমেল আন্তরিকতার পূর্ণতা মেলে হাসলো, 'এসো। তোমার ওপর রাগ করা যায়! তুমি তো আমার অনুরাগের স্পর্শ।'

শিউলিকে রুমে এনে বসালো রোমেল। রুমটা সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। পুরাতন দালানের এই রুমটায় দেখার মতো কিছু নেই। চুনকাম করা রুমের দেয়ালে থেকে

থেকে ক্ষতের আবরণ স্পষ্ট। তবু পোস্টার, কাগজ আর নানা রকম প্রাকৃতিক ছবিগুলো রুমটাকে সুন্দর ও সজীব করে রেখেছে।

'তারপর কেমন আছো?' বেশ কিছু সময় পরে বললো শিউলি।

'এই তো চলে যাচ্ছে দিন। সত্যি বলতে, কেন জানি মনটা জমাট মেঘের মতো বিষণ্নতায় ছেয়ে ছিল। তুমি আসাতে বেশ ভালো লাগছে।'

রোমেলের চোখে চোখ রাখলো শিউলি, 'সত্যি!'

'হুঁ। আমার ধারণা ছিল তুমি মিষ্টি কম পছন্দ করো।'

'কী রকম?'

'এই ধরো, তুমি মিষ্টি কথা কম বলো, চা কিংবা কফিতে মিষ্টি কম খাও আর মিষ্টি কাপড় কম পরো—'

'মিষ্টি কাপড় কোনটা?'

'জানো না মনে হচ্ছে—শাড়ি।'

শিউলি নিজের অঙ্গের দিকে তাকালো। শাড়িটা মন্দ নয়। পাড়ের রংটা ভিন্ন, তবে জমিনটা হালকা আকাশী।

শিউলি বললো, 'শাড়ি তোমার ভালো লাগে?'

'খুব। একদিন নীল শাড়িতে তোমাকে দেখার বড় শখ ছিল। সত্যি, আমার কল্পনার সেই ছবির সাথে বেশ মিলেছে আজকের দিনটি। এই দিনের মানুষটিও। নীল শাড়ি, নীল টিপ, আর খোলা চুল—'

'নীল শাড়ির কথা কখনো তো বলো নি।'

'বলি নি, কারণ, প্রত্যাশিত বিষয়ের প্রাপ্তিতেও অনেক সময় মন ভরে না। আবার অপ্রত্যাশিত ক্ষুদ্র প্রাপ্তিতেও মনের দু কূল সুখের বন্যায় ভেসে যায়। তোমাকেও তাই এমন করে সহসা পাওয়ার বাসনা জপেছি, কিন্তু ফরম্যালি নয়।'

শিউলি রোমেলের ডান হাতটা নিজের মুঠোয় তুলে নিল। কি এক নিদারুণ ভালোলাগায় ভেসে গেলো রোমেল। চোখ বন্ধ করে সমস্ত সত্তা দিয়ে সে শিউলির স্পর্শটুকু অনুভব করলো।

'এই লিবেন আলু, বেগুন, মরিচ, রসুন...'

রাস্তায় ফেরিঅলার হাঁকে চেতনা এলো রোমেলের। শিউলির হাতটা শক্ত করে ধরে বললো, 'কী খাবে বলো, ঠাণ্ডা না গরম?'

শিউলি ঠোঁটের কোণে হাসি এনে বললো, 'বেশ সচ্ছলতা এসেছে মনে হয়। চাকরি-বাকরি পেলে নাকি?'

'আরে না!'

'তাহলে?'

'ঠাণ্ডা-গরমের ব্যাপারটা আসলে খুব সিম্পল। যদি ঠাণ্ডা খেতে চাও, তাহলে কল চেপে এক গ্লাস পানিতে একটা মিনি ট্যাংক গুলিয়ে দেবো। আর যদি গরম পছন্দ করো, তাহলে তিন মিনিটে এক মগ পানি গরম করে চা বানিয়ে দিতে পারি। অবশ্য চিনি আছে কিনা দেখতে হবে।'

রোমেলের নাক ধরে ঝাঁকিয়ে শিউলি বললো, 'খুব ঢং, না? বেশ আছো তাহলে?'

'ভালো আর থাকতে দিচ্ছ কই? এক সপ্তাহ ধরে তোমার কোনো পাত্তা নেই!'

'আমি খুব দুঃখিত রোমেল, বাবার সঙ্গে হুট করেই ঢাকা চলে গিয়েছিলাম। আমার মামাতো বোনের বিয়েতে না, খুব মজা করলাম কদিন।'

'তোমরা পারো গো, মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে সটকে পড়তে। মেয়েরা অবশ্য এমনই। স্বার্থপর। মেয়েবন্ধু পেলে ছেলেবন্ধুকে ভুলে যায়।'

শিউলি প্রত্যুত্তরে কিছু না বলে কটমট করে তাকালো। চোখ বাঁকা করে ঠোঁটে রহস্যের ঢেউ তুলে বললো, 'নারী নির্যাতনের আসামি করে মামলা ঠুকে দেবো কিন্তু!'

রোমেল কিছু বললো না। ঠোঁট প্রসারিত করে জানালায় চোখ রাখলো। একটা নীল প্রজাপতি একবার ভেতরে একবার বাইরে যাচ্ছে-আসছে। চোখ ফিরিয়ে সে শিউলির দিকে তাকালো, 'মামলায় যদি আমার লালঘরে যাওয়ার নির্দেশ হয়, তুমি আমায় দেখতে যাবে না?'

'তা যাওয়া যেতে পারে। তবে ডেটিং করতে নয়, অনলি টু সি এন্ড টু টক এ লিট্‌ল বিট, ব্যস।'

'ঠিক আছে, তাতেই চলবে। তোমার দর্শন পেলে তবু নির্ঘুম রাত্রির দহন পোহাতে হবে না, কী বলো?'

দুজনে সশব্দে হেসে উঠলো।

শিউলি রিস্ট-ওয়াচে চোখ রেখে বললো, 'আগামীকাল একটা সুন্দর দিন, কেন বলো তো?'

রোমেলের দৃষ্টি দেয়ালের গায়ে গলায় ফাঁস বেঁধে ঝুলে থাকা ক্যালেন্ডারের দিকে চলে গেলো। ফেব্রুয়ারি মাস চলছে। আজ তের তারিখ। কালকের বিশেষ দিনটা যে কী, সহসা মনে পড়লো না। তাই বললো, 'ঠিক বলতে পারছি না।'

শিউলি ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে প্রথমে একটা সুদৃশ্য কার্ড বের করলো। উইশ করার সুরে বললো, 'হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন্স ডে টু ইউ!'

'ও তাই বলো! আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম!'

শিউলি এবার একটা পাঞ্জাবি বের করলো। বললো, 'এটা তোমার জন্য। দেখো তো, পছন্দ হয় কিনা। হাইটে ফোরটি ফোর আছে। শোনো, কাল সারাদিন আমরা ঘুরবো। দুপুরে বাইরে খেয়ে নেবো। তুমি মেসে মিল অফ রেখো। কিছু বলছো না যে?'

'ভালোবাসা কি দিবস পালন করার মাধ্যমে পূর্ণতা পায়? মনের টান আর আন্তরিকতার পরিপূর্ণ বিকাশই কি বড় কথা নয়?'

'তা তো বটেই!'

'এখন অবশ্য সময় বদলে গেছে। এক সময় ভালোবাসা লুকিয়ে চুরিয়ে করা হতো। এখন হচ্ছে জনসমক্ষে ক্যানভাস করে। ভালো। আমাদের মনের দুয়ারে শুভ চেতনা জেগেছে! ঠিক আছে, এমন দিন উপলক্ষে সুন্দর উপহারের জন্য আমার মনের এই লক্ষ্মী মানুষটাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু...'

'কিন্তু কী? তোমার জীবনে অনেক কিন্তু রোমেল। জীবনে সুখী আর সফল হতে গেলে কিন্তু-টিন্তুকে ঝেড়ে সামনে এগুতে হয়, বুঝলে আমার বোকা প্রেমিক! আজ আসি। তুমি ঠিক সাড়ে ন'টায় তৈরি থেকো। দুজনে এক সঙ্গে বেরুবো।'

'এখনই যাবে! কিছু অন্তত মুখে দিয়ে যাও।'

শিউলি উঠতে যাবে এমন সময় রোমেলের রুমমেট দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো—'আপা, একটু বসুন প্লিজ! সামান্য কিছু এনেছি, পানি দিচ্ছি, নিন।'

রোমেল পরিচয় করিয়ে দিল, 'শিলু, এ আমার রুমমেট বেলাল। খুব ভালো ছেলে। তোমার কথা ও জানে, শুধু দেখতে বাকি ছিল।'

বিস্কুট, চানাচুর আর লাড্ডুর প্লেট থেকে একটা বিস্কুট নিল শিউলি। বেলাল বললো, 'রোমেলটা বড় মনভোলা। আমি না এলে আপনাকে খালি মুখেই বিদায় করতো। ওর সঙ্গে কথা হয়েছে, আমার গেস্টকে ও আপ্যায়ন করবে। আর আমি করবো ওরটাকে।'

শিউলি পানির গ্লাস হাতে নিয়ে বললো, 'চমৎকার আইডিয়া!'

শিউলিকে রিকশায় উঠিয়ে দিয়ে রোমেল রুমে চলে এলো। ঘরে ঢুকতেই পাশের রুমের ইদরিস বললো, 'বাব্বাহ্! তোমার তাহলে মেয়েবন্ধুও আছে? আমি তো ভেবেছিলাম—। তা তোমার পছন্দ আছে বলতে হয়।'

রোমেল মুচকি হেসে বললো, 'কেমন দেখলি আমার শিলুকে?'

'ভালোই, ফিগারটা দারুণ! দেহের ভাঁজে ভাঁজে সৌন্দর্যের ঢেউ...'

'হাসলে গালে টোল পড়ে দেখেছিস?'

ইদরিস বোকার মতো বললো, 'কই, না তো!'

'তুই পেপার পড়ার সময় ওকে দেখেই তো গোল চোখে তাকিয়েছিলি। ও তখন হেসেছিল। সুন্দর ফিগারটায় আগে চোখ পড়লো, বোকা!'

বিছানায় বসে শিউলির দেয়া পাঞ্জাবিটা দেখতে লাগলো রোমেল। সাদা সুতির কাপড়ে নিপুণ হাতের কাজ করা। খাম থেকে কার্ডটা বের করতেই একটা চমৎকার মিউজিক বেজে উঠলো। রোমেলেল দৃষ্টি ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে এলো। ওর চোখ যেন দেখছে না, ভাবছে। ভাবনার শিয়রে ভেসে এলো ওদের প্রথম পরিচয়ের সেই দিনগুলোর কথা।

শিউলির সাথে রোমেলের অদ্ভুতভাবে পরিচয়। একদিন দুপুরে, বেলা তখন দুটো হবে। রোমেল টিউশনিতে যাবে বলে বেরিয়েছে। সেদিন আকাশটা বেশ মেঘলা ছিল। দুপুরের পর থেকেই বৃষ্টিটা জমে এলো। মতিহার হলের গেটে আসতেই মেয়েটিকে চোখে পড়লো। লম্বা বারান্দার মতো করিডোরে দাঁড়িয়ে ছিল সে। বারবার ঘড়ি দেখছে আর অস্থিরভাবে এদিক-ওদিক দৃষ্টি ছুঁড়ছে। দেখেই বোঝ যায় কোনো সমস্যা হয়েছে। ছেলে হলে হয়ত শাঁ করে দৌড় দিয়ে চলে যেতো। রোমেল অনেকক্ষণ ব্যাপারটা লক্ষ করে এগিয়ে গেলো।

'এক্সকিউজ মি, কাউকে খুঁজছেন?'

মেয়েটি যেন কূল পেয়ে গেলো। মনের দ্বিধা-সংকোচকে পেছনে ফেলে সে রোমেলের চোখে ভরসা খুঁজলো। বললো, 'আমার একটা জরুরি টিউটোরিয়্যাল ক্লাস আছে। এখানে একজনের খোঁজে এসে আটকে গেছি। একটা রিকশাও নেই যে চলে যাবো। দেখুন, কি ঝুম বৃষ্টি!'

আকাশ মেঘলা দেখে রোমেল ছাতা নিয়ে বেরিয়েছিল। বললো, 'আপনার আপত্তি না থাকলে ছাতাটা মাথায় দিয়ে যেতে পারেন।'

'কিন্তু আপনি?'

'আমি মতিহারেই থাকি। পরে না হয় কষ্ট করে এসে ফেরত দিয়ে যাবেন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে মেয়েটি যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো। লাবণ্যময় মুখে খুশির আভা ছড়িয়ে বললো, 'আমি শিউলি। পলিটিক্যাল সায়েন্স, সেকেন্ড ইয়ার।'

'আমি রোমেল, থার্ড ইয়ার। ইসলামিক হিস্টরি এন্ড কালচার।'

'আবার দেখা হবে, আসি ভাইয়া!'

প্রথম পরিচয়টা হয়েছিল এভাবেই। এরপর তার সঙ্গে এখানে দেখা হয়, ওখানে দেখা হয়। একটি ঘটনা আরেকটি ঘটনার দিকে এগিয়ে যায়। অফ পিরিয়ডে প্যারিস রোড, লাইব্রেরির সামনের দেবদারু গাছের ছায়ায় অথবা টুকিটাকির সামনে বসে চা খেতে খেতে অনির্ধারিত বিষয়ে আলাপ হয়। এমন করেই দুজনের মধ্যে আন্তরিকতার জন্ম নেয়। আন্তরিকতা গড়ায় ভালোলাগায়। শিউলি তাকে সত্যিই বন্ধু ভাবে এবং তার জন্য একটা আলাদা আন্তরিকতা আছে, এটা রোমেল বুঝতে পারে। এই উপলব্ধিটা যেদিন প্রথম হয়, সেদিন সে আনন্দে নেচে উঠেছিল, যেন পরীক্ষায় খুব ভালো নম্বর পাওয়ার মতো কিংবা দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর একটি কাঙ্ক্ষিত প্রিয়মুখ আপন করে পাওয়ার আনন্দে হলে ফিরেছিল সে।

ইউনিভার্সিটির হলে রোমেল মাস তিনেক ছিল। পরে এই মেসে চলে এসেছে।

দুই

আক্কেলপুর স্টেশনে তিতুমীর ট্রেনটা ঝিরঝির করে থামলো।

এখান থেকে বাড়িটা খুব কাছেই। রিকশায় দু টাকা ভাড়া। হেঁটেও যাওয়া যায়। রোমেল যখন আঙ্গিনাতে পা রাখলো তখন বাড়িটা নিঃশব্দে ডুবে আছে। বাবা বাড়িতে নেই। ছোট বোনটা কলেজে গেছে। এবারই সে মাধ্যমিক ডিঙ্গালো। বড় ভাইয়ের একমাত্র ছেলেটা এসে রোমেলকে জড়িয়ে ধরলো, 'আঙ্কেল কখন এলেন?'

'এই তো বাবা, কেবলই। তোমার আম্মু, দাদি কোথায়?'

'আম্মুর জ্বর হয়েছে তো, শুয়ে আছে। দাদি কাপড় কেঁচে এখন এলো। আঙ্কেল, আমার জন্য কী এনেছেন?'

রোমেল ব্যাগটা কাঁধের ওপর ফেলে বললো, 'এবার কিছু আনা হয় নি যে!'

'সত্যি আনেন নি? দেখি ব্যাগের মধ্যে কিছু আছে নাকি?'

'কিছুই নেই।'

'না, আমাকে ব্যাগ দেখাতে হবে। মনে হয় আছে।'

রোমেল বসে নাহিদকে বুকে চেপে ধরলো, 'এনেছি বাবা, আম এনেছি, একটা গাড়ি এনেছি। চলো ভিতরে যাই।'

নাহিদ অবাক চোখে বললো, 'আঙ্কেল, এখন আম ধরে?'

রোমেল ব্যাগ থেকে ড্যানিশের প্যাকেট বের করে বললো, 'চোখ বন্ধ করো। হ্যাঁ, এখানে মুখ লাগিয়ে চুমুক দাও। বলো তো, কী খাচ্ছো?'

নাহিদ খুশির গলায় বললো, 'সত্যই তো আম!'

'মা কেমন আছো?'

কাপড় কাঁচার পর মা বোধ হয় গোসলটা সেরে এসেছেন। গামছা দিয়ে চুল ঝাড়ছিলেন। 'মা' ডাক শুনে পেছন ফিরলেন, 'খোকা! কখন এলি বাবা?'

'এই তো।'

'কখন বেরিয়েছিলি? তুই অনেক শুকিয়ে গেছিস। খবর সব ভালো তো?'

'হ্যাঁ, ভালো। বাবা নেই?'

'সাত সকালে কোথায় যে বেরিয়েছে! খোকা, হাত-মুখ ধুয়ে আয়, সকালের রুটি আছে, খেয়ে বিশ্রাম নে। আমি ভাত চড়িয়ে দিই।'

বিকেলে বাজার থেকে বাবা মস্ত বড় একটা সিলভারকাপ মাছ এনেছেন। মা বসে বসে হলুদ বাটছে। চুলায় ভাতটা হয়ে এসেছে। মা ঝুঁকে ঝুঁকে গভীর মনোযোগ দিয়ে হলুদ-আদা বেটে চলেছে। রোমেল অদূরে বসে নীলার সাথে কথা বলছিল। কিন্তু তার উৎসুক চোখ ছিল মায়ের দিকে। সেই কতোগুলো দিন হয়ে গেলো, মা বউ সেজে এই বাড়িতে এসেছিলেন। কলেজ পড়ুয়া এক দুরন্ত মেধাবী ছাত্রীটি গিন্নী সেজে সেই যে রান্না ঘরে ঢুকেছেন, আর বেরুবার ফুরসত পান নি। একটা গৎবাঁধা অভ্যস্ত জীবনের আবর্তে কেটে গেলো তাঁর সুন্দর জীবন।

'দাদা, মেয়েটা কে রে? ভারি সুন্দর তো!'

রোমেল যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল। সম্বিত পেয়ে চোখ সরু করে বললো, 'কোন মেয়েটা?'

'এড়িয়ে যাচ্ছিস কিন্তু। তোর ঘরটা গোছাতে গিয়ে বালিশের নিচে পেলাম। নাম কী দাদা?'

'ও, শিউলির কথা বলছিস? মেয়েটা ভালো রে। ভার্সিটিতে পড়ে। আমার জুনিয়র।'

'ভালোই বাগিয়েছিস!'

'আরে না, একদিন আকস্মিকভাবে পরিচয়। মাঝে মধ্যে দেখা হয়, কথা হয়, এই আর কী।'

'কানাকে হাইকোর্ট দেখিয়ে দিলি? যাকগে, মনিরাকে যেন ছবিটা দেখাতে যাস নে। দাদা, একটা কথা শুনবি?'

'মণিকে দেখালে সমস্যা কী?'

'মনিরা তোর কাজিন। এক সময়ের ক্লাসফ্রেন্ডও। কোনো মেয়ে তার প্রিয় ছেলের সাথে অন্য মেয়েকে সহ্য করতে পারে না। তোর মাথার নাট-বল্টু ঢিলা থাকলে বলিস গিয়ে। কাজের কথাটা শোন—।' বলে নীলা থেমে যায়।

রোমেল আগ্রহী চোখে প্রশ্নের ভাঁজ ফেললো।

'বলতে লজ্জাও করছে। ইচ্ছে থাকলেও মা তোকে বলবে না।'

'কী?'

'তোর কাছে কিছু টাকা হবে?'

'কতো?'

'বড়পা আর দুলাভাইকে ঈদে কিছু দেয়া দরকার। গত দু ঈদে কিছুই দেয়া হয় নি।'

রোমেল স্বাভাবিক গলায় বললো, 'হ্যাঁ, দিতে হবে।'

'বাবার হাত খুব টানাটানিতে যাচ্ছে। নিজের লুঙ্গি দুটোই শেষ বয়সে চলে গেছে। নতুন কেনার সামর্থ্য যে নেই, আমি বুঝি। বাবা না কদিন থেকে খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে আছেন। মার কথা না হয় বাদই দিলাম।'

'ভাইয়া ইচ্ছে করলেও তো দিতে পারে।'

'হুঁ, তা যা বলেছিস। সংসারের বড় ছেলে হিসেবে তার উচিত মা-বাবা, ছোট ভাই-বোনদের দেখা। অথচ সে বৌ-বাচ্চা নিয়ে এতো ব্যস্ত যে, তাদেরই সামাল দিতে পারে না। কী সব বীমা, ডিপোজিট খুলেছে, কুলিয়ে উঠছে না। ওকে হেল্প করলেই সুবিধে হয় যেন। ইদানীং সংসার আলাদা করার জন্য তো রেডি হয়ে আছে।'

'ভাবী কোথায়?'

নীলার গলা সহসা উচ্চে উঠলো, 'কোন সখীর কাছে বসে গল্প জুড়েছে।'

মা ডান হাতের পিঠে কপালের ক্লান্তিভরা ঘাম মুছে বললেন, 'নীলা তুই থামতো।'

নীলা এবার রেগে গেলো, 'থামবো কেন? সন্তান মানুষ করেছো সারাজীবন তার গু-মুত সাফ করতে? ছেলের বৌ থাকতে কেন তোমাকে তিন বেলা চুলার আগুনে পুড়তে হয়? কেন রোজ রোজ দুটো টাকার জন্য আমাকে হেঁটে কলেজে যেতে হয়? অথচ তোমার সেই সোনার ছেলে আর তার বউ-বাচ্চার সেবায় কোনো ক্লান্তি নেই। বয়স হলে কোন বাবা-মা চায় না আপন কপালে সন্তানের হাতের এতোটুকু কোমল স্পর্শ?'

রোমেল কদিন থেকে একটা বিষয় নিয়ে ভাবছে। ভেবেই চলেছে। কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারে নি। ভাবতে গেলেই বিষম রহস্যের আড়ালে বিষয়গুলো ভাসতে থাকে। যদিও ভাবনাটা তেমন কঠিন কিছু নয়। ভেতরে তার উপলব্ধি সায় দিচ্ছে, বিষয়টা আসলে এই রকম। কিন্তু ভাষায় আসছে না।

একটা সংসার। দায়িত্ববান বাবা, মমতাময়ী মা—মোটামুটি সুস্থ ও সবল এক ঝাঁক সন্তান। সংসারে অভাব থাকলেও দুর্ভিক্ষের পীড়ন নেই। একে অপরের প্রতি সবাই

সহানুভূতিশীল। এমন পরিবারকে সুখী পরিবার ভাবা যায়। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে যেন একের সঙ্গে অপরের দূরত্ব বাড়তে থাকে। আপন আপন জগৎ নিয়ে সবাই বিভোর হয়ে যায়। কেউ কাউকে ভাবার ফুরসত পায় না যেন। এই যে বিচ্ছিন্নতা—গ্যাপ, এটা কি সংসার ভাঙ্গার পূর্বাভাস? রোমেল ভেবে পায় না।

নীলা কী একটা অজুহাতে ওড়নায় মুখ চেপে উঠে গেলো।

শীতের আবহাওয়া। হুহু করে রাত বাড়ছে। চুলোর আগুনের পাশে মার সাথে কথা বলছে রোমেল। এমন সময় বাবা ফিরলেন।

'খোকা, ঘুমাস নি?'

'জি না, মার সাথে বসে আছি।'

বাবা হাত-মুখ ধুয়ে একটা পিঁড়ি এনে বসলেন। এ কথা সে কথার পর বললেন, 'তোর পড়াশুনা আর কতোদূর বাবা?'

'এই তো, সামনেই অনার্স ফাইনাল দেবো। তারপর হয়তো আর বছর খানেক লাগতে পারে।'

'নীলার একটা সম্বন্ধ এসেছে। ওরা পছন্দ করেছে। আমরা এখনো কিছু বলি নি।'

'ভাইয়াকে কিছু বলেছেন?'

বাবা কিছুক্ষণ নীরব থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'ও সারাদিন এতো ব্যস্ত থাকে যে, কথা বলার সুযোগই পায় না। সকালে অফিসে যায়, ফেরে অনেক রাতে। সারাদিন কী যে করে বেড়ায়! পাত্রটা খারাপ না। বিয়ে দিতে তো নগদ কিছু খরচের ব্যাপার আছে। আমি সাহস পাচ্ছি না।' এরপর বাবা আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে গিয়েও লুকালেন।

'নীলা তো পড়ছে। আইএ-টা পাশ করুক না।'

'ওকে নিয়েই যতো ভাবনা। মেয়ে বড় হয়েছে, কখন কী হয়! সময় তো ভালো না। কলেজে যাবার পথে নাকি কিছু ছেলে এটা-ওটা বলে।'

রোমেল আর কথা খুঁজে পেলো না। বললো, 'মা, আমার ঘুম পাচ্ছে।' বলে সে উঠে গেলো।

সকালে বারান্দায় রোদ পড়েছে। পাটি পেতে বসে রোমেল পিঠা খাচ্ছিল। রাতে মা কয়েক পদের পিঠা বানিয়েছেন। সকালের মিষ্টি রোদে দারুণ লাগছে খেতে।

'কিরে রোমেল্যা, কেমন আছিস?'

রোমেল পিছন ফিরে দেখে মনিরা। সাত সকালেই বেশ সেজে-গুজে বেরিয়েছে। বছর খানেক হলো বিয়ে হয়েছে ওর।

'বস্, নে পিঠা খা।'

'ফরম্যালিটি দেখাচ্ছিস? শহরে গিয়ে অনেক বদলে গেছিস তুই। শুনলাম, গত পরশু এসেছিস। কই, একবারও তো আমাদের বাড়ি গেলি না?'

মনিরা সেই আগের মতোই ঝলমলে। অবিকল আগের মতো চেহারা। ব্যবহারও একচুল এদিক-ওদিক হয় নি। তফাতটুকু শুধু অনেকদিন না দেখার জন্য।

রোমেল বললো, 'বিকেলের দিকে যাবো ভাবছিলাম। শ্বশুরবাড়ি থেকে কবে এলি?'

'সপ্তাহ খানেক হলো।'

'উনি আসেন নি?'

'হুঁ, এসেছিল। কাজ আছে বলে থাকে নি।'

'তোর স্বামী ভালো-টালো বাসে তো?'

'ভালোবাসে মানে?'

'না মানে, কথায় কথায় এই শালি চুপ! অথবা ওগো শুনছো, এক গ্লাস পানি দাও গো, পরাণটা খাখা করতিছে...এমন ডায়ালগ ব্যবহার করে কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম আর কী!'

মনিরা বললো, 'ঢং করিস না, আমার মন ভালো নেই।'

'তুমি তো আমাদের গরীবের ঘরে আসো না মা, অনেকদিন পর এলে। নাও, পিঠা খাও।' প্লেটে করে কিছু পিঠা এগিয়ে দিলেন রোমেলের মা।

ফুফুকে দেখে মনিরা হাসলো, 'এখন থেকে আসবো।'

আপন রক্তের সম্পর্ক না হলেও রোমেল আর মনিরা মামাতো ভাই-বোন। একই পাড়ায় বাড়ি। দূরত্ব তেমন কিছু নয়। রোমেলদের বাড়ি থেকে ওদের বাড়িটা দেখা যায়। কিন্তু সামাজিক দূরত্বটা অনেক। মোটামুটি অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে মনিরা। রোমেলদের তুলনায় ওরা বেশ সচ্ছল। অসচ্ছলতার অসুবিধা এই যে, সম্পর্ক সবাই স্বীকার করতে চায় না। কেমন যেন এড়িয়ে চলে। মনিরার বাবা ঐ টাইপের মানুষ।

'মামা-মামি কেমন আছেন, মণি?'

মনিরা না শোনার ভান করে বললো, 'তুই আমার কষ্টটা বুঝলি না, রোমেল! বিয়ের আগে পর্যন্ত একবার ভুল করে বললি না, ভালোবাসি। ছোটবেলা থেকে তোকেই আপন জেনেছিলাম...।' সহসা ফুঁপিয়ে উঠলো মনিরা।

'তুই কাঁদছিস মণি! ছিঃ কাঁদে না বোন, তুই তো আমার সব জানিস। আমরা এক সঙ্গে বড় হয়েছি। স্কুল-কলেজ পাশ করেছি পাশাপাশি থেকে। তোর সাথে জীবনের কতো স্মৃতি জড়িয়ে আছে আমার! তোর মনে পড়ে, একবার বিলের ধারে মাছ ধরতে গিয়ে শিং মাছের কাঁটা ফুটেছিল আমার পায়ে। তাই দেখে তোর চোখে নদী বয়েছিল। মুখটা তোর শুকিয়ে এতোটুকুন হয়ে গিয়েছিল। সেইসব স্মৃতি কি ইচ্ছে করলেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারবো? আমি তোকে বন্ধুর মতো দেখতাম, আজও দেখি। আমাদের এই সম্পর্কটাই আজীবন থাক না! আমরা একে অপরের শুভকামনা করে যাবো। ভালোবাসা মানুষকে কাঁদায় মণি, খুব কাঁদায়...।'

কথাগুলো বলতে বলতে চোখ দুটো ভিজে উঠলো রোমেলের। মনিরা আড়চোখে একবার তাকালো। কিন্তু রোমেলের চোখের জল দেখতে পেলো না।

ফুফুর যত্ন করে বানানো একটা পিঠা খেয়েছে মনিরা, আরেকটা নেবে, এমন সময় রোমেল একচিঠি পরিমাণ কথা বলে থামলো। মনিরা শীতল গলায় বললো, 'আমি

যে-কদিন থাকবো, তুই আসিস না। আমার কষ্ট বাড়বে।' আর দেরি করলো না সে। চোখের জল লুকিয়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো।

'দাদা, এখন তোর কোনো কাজ আছে?'

রোমেল জিজ্ঞাসু চোখে নীলার দিকে তাকালো।

'আমাকে একটু কলেজে রেখে আসবি, দাদা?'

'হুঁ, যাওয়া যায়। অনেকদিন তো ওদিকে যাওয়া হয় না। বেড়িয়ে আসা হবে।'

নীলার ভালো ড্রেস বলতে কলেজ ড্রেসটাই সম্বল। কলেজে ভর্তি হওয়ার পর বাবা বানিয়ে দিয়েছিলেন।

কলেজের কাছাকাছি আসতেই নীলা দেখলো, কয়েকটা ছেলে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। ছেলেগুলো ওকে দেখলে কেমন করে যেন তাকায়। নীলা ভেতরে ভেতরে দমে যায়। অবশ্য ওর দিকে আজকাল অনেকেই তাকায়। না, সে খুব সুন্দরী নয়, তা নীলা জানে। তবে ইদানীং ওর মনে হয়, বখাটেদের তাকানোর জন্য সুন্দর চেহারার দরকার হয় না। মেয়ে হলেই হলো। সে আর সব মেয়েদের মতো উদার নয় বলেই হয়তো ছেলেগুলো ওকে দেখে। মাপে। নিজেদের মধ্যে আলাপ করে। নীলা টের পায়।

ছেলেগুলোর কাছাকাছি হতেই একজন ফস্ করে সালাম দিল। নীলার ঠোঁটে বাঁকা হাসির ঢেউ উঠলো, যেন কতো ভদ্র ছেলে, আদব-কায়দা শিখেছে বেশ!

'দাদা—' বলে রোমেলের হাত ধরলো নীলা।

'কী হলো?'

'না, কিছু না।'

'বল্ না, বাবা!'

নীলা ইতস্তত করে বললো, 'এই ছেলেগুলো না'—বলে সে থেমে গেলো। রোমেল কী বুঝলো কে জানে! ছেলেগুলোর একেবারে নিকটে এসে বললো, 'কেমন আছো তোমরা? কী করছো এখানে?'

একজন বললো, 'এমনি দাঁড়িয়ে আছি, ভাইয়া।'

রোমেল আন্তরিক গলায় বললো, 'আমার ছোটবোন, নীলা। এই কলেজেই পড়ছে। কোন ছেলে যেন বিরক্ত করে। তোমরা অবশ্য ভালো ছেলে, তা আমি জানি। দেখো তো ছোট ভাইয়েরা, ওকে যেন কেউ ডিস্টার্ব না করে।'

সবাই সমস্বরে বললো, 'জি ভাইয়া।'

রোমেল ঠোঁটের কোণে হাসি ঝুলিয়ে বললো, 'আসি!' এতে কিছুটা হলেও কাজ হবে ভেবে স্বস্তিবোধ করলো সে।

নীলা যেখানে পড়ছে, এই কলেজ থেকেই রোমেল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছে। ভালো ছাত্র হিসেবে তার নাম আছে। এসএসসিতে কয়েকটি লেটার মার্ক্স সহ প্রথম বিভাগ এবং এইচএসসিতে স্টার নম্বর পেয়েছিল সে। সেই সময় তুলনামূলকভাবে সরাদেশেই ফলাফল সন্তোষজনক ছিল না, যে কারণে রোমেলের প্রতি টিচার ও স্টাফদের একটা অন্য রকম স্নেহ আছে।

অফিসরুম থেকে রোমেল জানলো, ইকবাল স্যার কদিন ধরে অসুস্থ। ক্লাস নিতে পারছেন না। মনটা ব্যথায় ভরে গেলো রোমেলের। ইকবাল স্যার তাকে বড় ভালোবাসেন। নিজের ছেলে দুটোকে নিয়ে খুব আশা ছিল তাঁর। দুজনের কেউই কলেজ লেভেলটা পেরুতে পারে নি।

বাসায় গিয়ে খোঁজ করতেই খালাম্মা স্যারের রুমে নিয়ে গেলেন। স্যার শুয়ে ছিলেন। রোমেলকে দেখে বেশ উচ্ছ্বসিত হলেন, 'কেমন আছো বাবা?'

'জি, ভালো। কলেজে শুনলাম আপনি অসুস্থ।'

'তেমন সিরিয়াস কিছু না। জ্বর আর মাথা ব্যথা। বিছানা থেকে মাথা তুলতেই পারি না। তোমার পড়াশুনার কী খবর?'

'জি, ভালো।'

'ভার্সিটির অবস্থা কেমন এখন?'

'আপাতত ভালো চলছে।'

'জানো রোমেল, বড় মন্দা সময় যাচ্ছে এখন। মাঝে মধ্যেই অজানা শঙ্কায় বুক ভেঙ্গে যায়। শুধু দুশ্চিন্তার ঢেউ নামে বুকে। ছোট্ট সন্তানটাকে কেউ কিডন্যাপ করছে না তো? মেয়েটা কান্নাভেজা চোখে কলেজ থেকে ফিরেছিল কেন? সন্ধ্যার পর বাড়ির সামনে উচ্ছৃঙ্খল ছেলেদের জটলা কেন?'

খালাম্মা নাস্তা নিয়ে এলেন—'খাও বাবা।'

স্যার বললেন, 'টেলিফোন সেটটা নেয়ার পর থেকে সমস্যা দেখা দিয়েছে।'

'কী সমস্যা স্যার?'

'অসময়ে ফোনটা বেজে ওঠে। অপরিচিত রুক্ষ কণ্ঠস্বর কিসের যেন চাঁদা দাবি করে! তোমার জন্য মাঝে মাঝে ভাবি। ক্যালেন্ডারে নির্দেশনা না থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ কেন? জ্ঞানচর্চার অনবদ্য পবিত্র প্রাঙ্গণে শিক্ষা বিধ্বংসী ষড়যন্ত্রের কথা শুনলে মনটা খারাপ লাগে।'

রোমেল বললো, 'সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কিছু করার নেই। নির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠি স্বার্থের প্রয়োজনে ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করে তোলে। অবশ্য বছর খানেক ধরে ভালোই চলছে।'

'আসলে কী জানো, গোটা দেশ—বরং পৃথিবী জুড়ে অমানিশার ছায়া নেমেছে। ঠিক পূর্ণিমায় অমানিশার মতো। বড় দুর্বিষহ সময়ের খাঁচায় মানুষ হাবুডুবু খাচ্ছে। আজ আমরা আমাদের দ্বারাই নির্যাতিত, শোষিত। আমাদের জীবন, জীবনের ভাবনা, সুখ-সমৃদ্ধি আমাদেরই মতো মানুষের খেয়ালি ভাবনায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। একদিন আমরা অন্য জাতির শোসনের হাত থেকে মুক্তি পেতে যুদ্ধ করেছি। কিন্তু আজ? আমার ভাইয়ের দুঃশাসন, নির্যাতন আর বাঁকা চোখের লেলিহান শিখায় ভস্ম না হওয়ার জন্য যুদ্ধ রকতে হয়। আমার জীবন, সম্পদ, সন্তান-সন্ততিকে আমার জাতিভাইয়ের করাল গ্রাস থেকে নিরাপদে রাখার জন্য অবিরত সাধনার মালা গাঁথতে হয়। বলো, এইসব অনুভূতি কি কম যাতনার?'

স্যারের বুক ভেঙ্গে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

'বাড়িতে কদিন আছো?'

'আরো দিন কয়েক থাকবো।'

'মাঝে মধ্যে এসো। আর আমার জন্য দোয়া রেখো।'

বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেলো রোমেলের। সরাসরি নীলার রুমে এসে দেখলো ও পড়ছে।

'নীলা।'

'এতো দেরি করলি কেন, দাদা? মা বারবার জিজ্ঞাসা করছিল।'

'বাবা ফিরেছে?'

'হুঁ। চুলার পাশে বসে আছে মনে হয়।'

রোমেল একটা প্যাকেট নীলার সামনে ধরে বললো, 'দেখ্ তো সব ঠিক আছে কিনা?' নীলা প্যাকেট খুলে দুটো শাড়ি আর দুটো লুঙ্গি বের করলো—'এতো কাপড় কার জন্য এনেছিস? টাকা পেলি কোথায়?'

'প্রিন্টের শাড়িটা বড়পার জন্য। আর এটা মার জন্য। দেখ তো কেমন হয়েছে?'

'আপুর শাড়িটা সুন্দর হয়েছে। রংটা একটু গাঢ়—সমস্যা নেই। আপুকে মানাবে। মার শাড়িটাও খারাপ না। লুঙ্গি দুটো কি বাবার জন্য?'

'চেক লুঙ্গিটা দুলাভাইয়ের জন্য। অন্যটা বাবার। আর এটা তোর জন্য।' বলে রোমেল পেছন থেকে একটা আকাশী রঙের থ্রি-পিছ নীলার দিকে বাড়িয়ে দিল।

নীলা আনন্দে কেঁদে ফেললো, 'এতো সুন্দর! সত্যি তোর পছন্দ আছে। এবার লক্ষ্মী ছেলের মতো বল্ তো দাদা, এতোগুলো টাকা কোথায় পেলি?'

'চুরি করি নি।'

'আমি কি সে কথা বলেছি?'

'আমার স্কুল-কলেজের রেজাল্টের কথা তোর মনে আছে?'

'হুঁ, কলেজে সব থেকে ভালো করেছিলি।'

'ইউনিভার্সিটি সেই রেজাল্টের স্বীকৃতি দিয়েছে। কলা অনুষদ থেকে আমাদের ডিপার্টমেন্টের জন্য সংরক্ষিত বৃত্তি পেয়েছিলাম। এতোদিন একাউন্টে জমা ছিল। বাড়ি আসার সময় কী মনে করে হাজার দেড়েক টাকা তুলেছিলাম। চল্, মা-বাবাকে কাপড়গুলো দিই।'

'চল্।'

বাবার ঘরে এসে রোমেল সঙ্কোচ নিয়ে বললো, 'বাবা, এই লুঙ্গিটা আপনার জন্য। মা, শাড়িটা তোমার।' নীলা সঙ্গে যোগ করলো, 'আপা আর দুলাভাইয়ের জন্যও আছে।'

বাবা বললেন, 'খোকা তুই—'

নীলা বাবাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, 'বাবা ওসব পরে শুনো। আগে দেখো, পছন্দ হয়েছে কিনা।'

বাবা যেন ভাবনায় পড়ে যান।

নীলাকে রেখে রোমেল বাবার রুম থেকে বেরিয়ে এলো।

তিন

ডিপার্টমেন্টের নোটিশ-বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল রোমেল। এমএ ক্লাসে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। সহসা পেছন থেকে কে যেন ওর মনোযোগ কেড়ে নিল।

'একটা ট্যাকা দেন না, ভাইজান!'

ভাঙ্গা কণ্ঠের একটি মেয়েলি আবেদনের অর্থ বুঝতে কষ্ট হলো না রোমেলের। সে না শোনার ভান করে থাকলো। একটু পর আবার সেই আবেদন। কিছুটা বিরক্তি নিয়ে পেছন ফিরতেই চমকালো রোমেল—'শিলু তুমি! ও, তুমিই তাহলে এভাবে একটা ট্যাকা দেন না বলছিলে?'

শিউলি মায়াবী ঠোঁটে অদ্ভুত ঢং করে বললো, 'দেখলাম, আমাকে চিনতে পারো কিনা।'

'ক্লাস আছে এখন?'

'একটা করলাম, আর ভালো লাগছে না।'

'তাই?'

'হুঁ। তোমার কি মন খারাপ?'

'কই, না তো!'

'তাহলে হাসলে না কেন?'

'পরে হাসবো। চলো, স্টেডিয়ামের ওদিকে যাই।'

'জরুরি কোনো কাজ আছে?'

'ছবি উঠিয়েছি, নিতে হবে।'

'চলো।'

ওরা সিঁড়ি বেয়ে নিচে এলো। লাইব্রেরির দক্ষিণের রাস্তা ধরে দেবদারু গাছের নিচ দিয়ে হাঁটতে থাকলো। বাস-স্ট্যান্ড হয়ে স্টেডিয়াম মার্কেটে পৌঁছে গেলো। স্টুডিও থেকে ছবি নিয়ে চলে এলো শহীদ মিনারে। একটা ভালো জায়গা দেখে শিউলি বললো, 'এখানে বসা যায়।'

রোমেল শীতল গলায় বললো, 'গতকাল এলে না যে?'

'আর বলো না, বেরুবো, এমন সময় ছোট খালা এসে হাজির। অনেক চেষ্টা করেও আসতে পারলাম না।'

রোমেল নিস্পলক চোখে একটা গোলাপ দেখতে লাগলো।

'তোমার মন খারাপ হয়েছে? স্যরি, আর কখনো এমন হবে না।'

ঘনিষ্ঠ কজন বন্ধু-বান্ধব মিলে পদ্মার চরে যাওয়ার কথা ছিল গতকাল। নির্দিষ্ট সময়ে সবাই উপস্থিত। শুধু শিউলি নেই। রোমেল বন্ধুদের বলেছিল, তোরা থাক, আমি আসি। সবাই জোড়ায়-জোড়ায় গিয়েছিল। শিউলির অনুপস্থিতি মানতে পারছিল না সে। নদীর স্তিমিত ঢেউয়ের মতো বুকের ভেতর বিষণ্নতার ঢেউ নেমেছিল রোমেলের।

'কী হলো, কথা বলছো না যে? প্লিজ রোমেল, আই এ্যাম সো স্যরি। বুঝতে পারি নি, তুমি এতো কষ্ট পাবে।' রোমেলের হাত দুটো চেপে ধরে বললো, 'প্লিজ, তুমি মন খারাপ করে থেকো না, প্লিজ একবার হাসো!'

রোমেল এবার স্বাভাবিক হলো—'মেয়েরা এমনই। কথার জাহাজ। ছেলেদের মন ভোলাতে পটিয়সী। অবশ্য রহস্যময়ীও।'

'কী রকম?'

'এই ধরো, মেয়েরা কথায় কথায় অকপটে কেন জানি হ্যাঁ-হ্যাঁ, না-না করে। আর এই সময় রঙিন ঠোঁটে ঝুলিয়ে রাখে রহস্যময় এক হাসি। যে কারণে তোমাদের কোনটা যে হ্যাঁ, আর কোনটা যে না—বোঝার সাধ্য কোন নরাধমের আছে?'

'আমাকেও এমন মনে হয়?'

'জানি না।'

'আমি কিন্তু সত্যি তোমাকে খুব আপন ভাবি।'

'তা আমি জানি।'

'কী জানো?'

'তুমি আমাকে ভালোবাসো। আমার সুখ কামনা করো।'

'তুমি ভালোবাসো না?'

রোমেল শব্দহীন মুচকি হাসলো।

'কই, বললে না তো?'

রোমেল তবু নিশ্চুপ।

'তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে, লজ্জা পাচ্ছো! বাব্বাহ্, ছেলেদের আবার লজ্জাও থাকে! থাকে নাকি?'

শিউলির নাক টিপে দিয়ে রোমেল বললো, 'থাকে না মানে, অবশ্যই থাকে। মেয়েদের থেকে বেশি না হলেও কম নয়। লজ্জা নারীর সৌন্দর্যের ভূষণ, আর ছেলেদের জীবনের ভূষণ।'

'বাহ্! চমৎকার বলেছো তো!'

'ইদানীং ক্যাম্পাসে কম আসো নাকি?'

'কেন বলো তো!'

'দেখা মেলে না যে।'

'সামনে পরীক্ষা তো, ক্লাস সাসপেন্ড হয়েছে।'

'খুব পড়াশুনা করছো বুঝি?' রুমেল জিজ্ঞাসা করে।

'আরে না। ও, ভালো কথা, চলো না একদিন আমাদের বাসায় যাবে। আম্মুর সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবো। বিকেলে এলে ভালো হয়।'

'জরুরি কিছু?'

'না, ঐ সময় বাসায় তেমন কেউ থাকে না। আম্মুকে তোমার কথা বলেছি। তোমাকে দেখতে চেয়েছে।'

রুমেল বললো, 'একদিন গেলেই হবে।'

শিউলি উদাস চোখে হঠাৎ আকাশের দিকে তাকালো। এরপর চোখ নামিয়ে রোমেলকে নিস্পলক দেখতে থাকলো। রোমেল বললো, 'কী দেখছো?' শিউলি কোনো শব্দ করলো না।

'কী দেখছো এমন করে?'

শিউলি কণ্ঠস্বর গাঢ় করে বললো, 'আচ্ছা রোমেল, যদি কখনো আমি তোমার জীবন থেকে হারিয়ে যাই, তুমি কী করবে?'

'তোমার প্রতীক্ষায় থাকবো।'

'আমি যদি আর না ফিরি?'

'তবু তোমার অপেক্ষায় প্রহর গুনবো।'

শিউলি ভীষণ অবাক হওয়ার মতো বললো, 'তুমি আমাকে এতো ভালোবাসো?'

'হ্যাঁ, শিলু। আমি মিথ্যা বলতে শিখি নি। আমি তোমাকে ভালোবাসি। এভাবেই ভালোবাসি। আমার ভালোবাসার ধরন এমনই।'

চার

এ বাসার নিয়ম হচ্ছে সকালে নাস্তার টেবিলে সবাইকে থাকা চাই। লাঞ্চ কিংবা ডিনারে যে কেউ ইচ্ছে মতো খাবার গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু সকালের এই নিয়ম ভাঙ্গা চলবে না।

নাস্তার টেবিলে সকলেই উপস্থিত, কেবল শিউলি নেই। ইয়াকুব সাহেব সুমীকে বললেন, 'তোর আপু কোথায়?'

'আপু তো ঘুম থেকে ওঠে নি।'

'ওঠে নি মানে? এতো বেলা করে ঘুমুচ্ছে, শরীর খারাপ করে নি তো?' বলে তিনি স্ত্রীর দিকে তাকালেন।

'শিউলি কাল থেকে ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করছে না। আমার সাথে পর্যন্ত ভালো করে কথা বলছে না।'

'ব্যাপারটা কী বলো তো?'

'মেয়েকে জিজ্ঞাসা করো গে।'

ইয়াকুব সাহেব নাস্তা শেষ করলেন। বললেন, 'শিলু কোথায়?'

সুমি বললো, 'আপু ওর রুমের দরজা বন্ধ করে রেখেছে।'

গতকাল বিকেলের ঘটনা। শিউলি এক বান্ধবীর বাসায় বেরুবে, এমন সময় মা আদুরে গলায় ডাকলেন, 'শিলু, এদিকে আয়।'

শিউলি ব্যস্ত ভঙ্গিতে বললো, 'কী বলবে, জলদি বলো।'

'আমার কাছে বস্।'

'এই বসলাম, বলো।'

'দেখ্ তো, এই ছবিটা কেমন?'

'ভালোই তো, ছেলেটা কে মা?'

'ভালো করে দেখ, ছেলের বাবা-মা সম্বন্ধ এনেছেন। তোকে ওদের খুব পছন্দ। ছেলে তোকে ভার্সিটিতে দেখেছে। ছেলের বাবা-মাও দেখেছেন, তুই হয়তো খেয়াল করিস নি।'

শিউলি যেন আকাশ থেকে পড়লো, 'মা, একি বলছো?'

'তোর বাবার খুব পছন্দ হয়েছে। ছেলে বিদেশে ছিল। এখন দেশেই ভালো চাকরি করছে। খুব শীঘ্রি আনুষ্ঠানিকভাবে তোকে দেখতে আসবে।'

'মা, আমি মরে গেলেও এই ছেলেকে বিয়ে করতে পারবো না।'

'বিয়ে না করে করবিটা কী, শুনি? বাবা-মার মুখে চুনকালি দিবি? তুই না করেছিস শুনলে তোর বাবা কষ্ট পাবে।'

এরপর সে আর মার সামনে থাকে নি। নিজের রুমে এসে সেই যে দরজা বন্ধ করেছে, আর খোলে নি।

বাবা কড়া নাড়লেন, 'মা শিলু, আমি তোর বাবা, দরজা খোল্ শিলু।' তবু সে দরজা খোলে না।

বাবা বললেন, 'শিলু, দরজা খোল্ মা, তোর কী হয়েছে আমাকে বল্, আমি সব ঠিক করে দেবো।'

আর শুয়ে থাকতে পারে না শিউলি। নীরবে বিছানা ছেড়ে দরজা খুলে দেয়। বাবা শিলুর কপালে হাত রেখে বলেন, 'কী হয়েছে মা, শরীর খারাপ?'

কান্নাভেজা গলায় শিউলি বলে, 'বাবা!'

'বল্ মা, কী হয়েছে?'

'বাবা, আমি রোমেলকে পছন্দ করি। ওকে ছাড়া আমি কিছু ভাবতে পারছি না।'

বিজ্ঞ বাবা বুঝলেন মেয়ের কী হয়েছে। বললেন, 'এক সঙ্গে পড়ালেখা করলে, চলতে-ফিরতে একটু-আধটু সম্পর্ক-ভালোলাগা এই বয়সে হতেই পারে। সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয়াটাই বড় কথা। বিচক্ষণ মানুষ ভুল করে না।'

বাবা একটু থামলেন। এরপর ঠোঁটের কোণে হাসি ঝুলিয়ে মেয়ের মাথায় হাত রেখে বললেন, 'সেই বিচক্ষণতা তোর আছে বলেই আমার বিশ্বাস।'

'কিন্তু বাবা, আমরা দুজন দুজনকে খুব পছন্দ করি।'

'শোন মা, ভালোবাসাবাসি করে বিয়ে করলে সম্পর্ক স্থায়ী হয় না। সংসার ভেঙ্গে যায়। তাছাড়া ছেলেটা সম্পর্কে তোর মার কাছে শুনেছি। তুই কি ওর ফ্যামিলিতে গিয়ে সুখী হতে পারবি? মা-বাবা সন্তানের অমঙ্গল চায় না। তুই বোঝ্ মা!'

'মনের সুখই প্রকৃত সুখ বাবা। আমরা সে সুখের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে পারবো। ওকে ছাড়া আমি কাউকে বিয়ে করতে পারবো না, বাবা।'

বাবা কিছুটা নরম হলেন, 'একটা অজপাড়াগাঁয়ে গিয়ে তুই জীবন কাটাতে পারবি? যেখানে আধুনিকতার ছোঁয়া নেই। ইলেকট্রিসিটিও হয়তো নেই। ডিশ এন্টেনা থাকার প্রশ্নই ওঠে না। দম বন্ধ হয়ে তুই মারা যাবি মা। তোর সুখের জন্যই বলছি।'

শিউলি কিছু বলে না। মাথা নিচু করে বাবার কথা শুনে যায়। বাবা বলেন, 'আর তাছাড়া এটা আমার সম্মানের প্রশ্ন। পলাশ আমার বন্ধুর ছেলে। দেখতে খারাপ না। কোন দিক দিয়ে সে তোর উপযুক্ত নয়, বল্? শুধু ইমোশনকে পুঁজি করে জীবনে বেশিদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। বাস্তবতা বড় কঠিন।'

'কিন্তু বাবা!' কান্নায় শিউলির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

'তুই আর না করিস না মা। তাহলে আর মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না। আমি ওদের কথা দিয়েছি। বিয়ের পর দেখবি, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'বাবা!' অস্ফুট স্বরে শিউলি প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু কান্নায় গলা বন্ধ হয়ে আসে।

'এখন আর এসব কথা তুলে লাভ নেই, মা। আমরা তোর ভালোর জন্য করছি। সবকিছুই ফাইনাল। আজই তোকে এনগেজমেন্ট-রিং পরাতে আসবে। কার্ডও ছাপতে দেয়া হবে কাল। তোর মার কাছে কিছু কার্ড থাকবে। তোর বন্ধুদের ইনভাইট করিস। তোর অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে না!'

বাবা আর দাঁড়ান না। শিউলিকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তিনি মেয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে যান। শিউলি কিছু ভেবে পায় না—এখন সে কী করবে! কী তার করা উচিত। সে কিছুই বুঝতে পারে না।

বালিশ আঁকড়ে ধরে শিউলি ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। তার কোমল গাল বেয়ে মুক্তার দানার মতো অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ে। ডিস্টেম্পার-করা সাজানো নিজের রুমকে কবরের মতো মনে হয়। প্রাণের সীমানায় বোবা ব্যথা গুমরে ওঠে। শিউলি আর ভাবতে পারে না। বালিশে মুখ লুকিয়ে নীরবে অশ্রু বিসর্জন দিতে থাকে।

পাঁচ

ইদানীং একা থাকলেই পেছনের দিনগুলো পায়ে পায়ে হেঁটে এসে সামনে দাঁড়ায়। অতীতের সুখ-দুঃখভরা স্মৃতিরা মৌমাছির মতো রোমেলকে জাপটে ধরে। কিন্তু স্মৃতি সতত যাতনাময়, হোক না তা যতোই সুখময়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখা শেষ করে রোমেল এই তো সেদিন গ্রামে এলো। অথচ এরই মাঝে পাঁচ-পাঁচটা বছর কিভাবে যে কেটে গেছে টের পায় নি। অবশ্য কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে সময়ের গতি বোঝা যায় না।

শহরে দীর্ঘদিন থাকার পর গ্রামে এসে রোমেলের জীবনে স্থবিরতা ভর করেছিল। শহরের রুটিন মাফিক জীবন ছিল তার। পড়াশুনা, টিউশনি, আড্ডা ইত্যাদিতে একটা বৃত্ত ছিল বটে। কিন্তু সেই বৃত্তে তবু ছন্দ ছিল। গ্রামে ফেরার পর সেই ছন্দটা কোথায় যেন ছিটকে পড়েছিল। এক সময় সে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিল। মানিয়ে নেয়াটাই ছিল সঙ্গত। সে তো গ্রামেরই ছেলে। শৈশব-কৈশোর এবং যৌবনের শুরুটা গ্রামেই কেটেছে তার। জীবনের টানে, মানুষ হওয়ার বাসনায় শহরে এসেছিল সে। পদার্পণ

করেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল ভুবনে। ইচ্ছে ছিল এমএ শেষ করবে। এরপর শহরেই একটা চাকরির চেষ্টা চালাবে। পাশাপাশি বিসিএসের জন্যও প্রিপারেশন নেবে। কিন্তু এমএ পরীক্ষাটা শেষ হতে না হতেই তার জীবনটা সহসা এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল।

এখন অবশ্য রোমেল নিজেকে প্রবোধ দেয়, মানুষের জীবনের বেশিরভাগ স্বপ্নগুলোই হয়তো অপূর্ণ থেকে যায়। তেমনি তার স্বপ্নগুলোও পূর্ণতার মুখ দেখার আগেই বৃন্ত থেকে ঝরে গেছে।

রোমেল থমকে গিয়েছিল। শিউলির পদচিহ্ন সহসা বিলীন হওয়ায় জীবনের বাঁকে কালো মেঘ জমেছিল তার। কিন্তু বাস্তবতা তাকে ব্যর্থতার নদীতে নিক্ষেপ করে নি। বরং পথ দেখিয়েছে। রোমেল এখন সোনাপুর ডিগ্রি কলেজের সফল প্রভাষক। নিজস্ব মেধা ও প্রচেষ্টা আর ইকবাল স্যারের সহযোগিতায় শিক্ষকতার পদটা লাভ করেছিল সে। এটা অবশ্য বছর পাঁচেক আগের কথা। এখন সে কলেজের জনপ্রিয় একজন শিক্ষক। কলেজ ক্যাম্পাসটি বেশ মনোরম। মফস্বলের কলেজ হিসেবে বেশ নাম আছে। অনেক ছাত্র-ছাত্রীর সমাবেশ। রোমেলকে কেউ ভয় করে না, বরং শ্রদ্ধা করে। সম্মান দেখায়। সবার সাথে বন্ধুর মতো মেশে রোমেল, যে কারণে পারস্পরিক হৃদ্যতা তৈরি করেছে সুন্দর সমন্বয়।

কিন্তু সমস্যা একটাই। একা থাকলেই স্মৃতির ঢেউয়ে সে ভেসে যায়।

কলেজ শেষে বাড়ি গিয়েও সে বসে থাকে না। বাড়ির সাথে লাগোয়া সামান্য জমিতে নানা রকম ফল-ফলাদির চাষ করে। বছর দুয়েক হলো বোনটাকে ভালো একটা জায়গায় বিয়ে দিয়েছে। বাবা-মাকে সুযোগমতো সহযোগিতা করে। মোটামুটি একটা সচ্ছল সংসারের বাস্তব রূপ সে দাঁড় করিয়েছে। সংসারের সবার মুখেই হাসি ফোটাতে সে সচেষ্ট থাকে। এতে আর যাই হোক, আত্মতৃপ্তির মুগ্ধতা তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।

শেষ মুহূর্তে শিউলির মুখোমুখী হয়েছিল রোমেল। বিয়ের মাত্র কদিন বাকি। শিউলি নানা রকম দ্বন্দে ভুগছিল। এমন সময় রোমেল ওর সামনে দাঁড়িয়েছিল।

শিউলি বলেছিল, 'আমি অনেকবার ভেবেছি, সবকিছু অস্বীকার করে তোমার কাছে চলে আসবো। ভেঙ্গে ফেলবো ব্যবধানের দেয়ালকে। কিন্তু...।'

রোমেল বলেছিল, 'থামলে কেন, বলো কিন্তু কী?'

শিউলি কিছু বলে না। রোমেল বলেছিল, 'অনিশ্চয়তাকে ভয় পাও শিলু? ভয় পাও খোলা আকাশের নিচে ছায়াহীন পথ চলতে?'

শিউলি দ্বিধা নিয়ে বলেছিল, 'না মানে, কী যে করি! আমি আসলে ইয়ে...।' এরপর সে আর কিছু বলতে পারে না। চঞ্চলা মেয়েটি স্থির হয়ে হাত কচলাতে থাকে।

'একদিন তুমিই বলেছিলে, আমার জীবনে নাকি অনেক কিন্তু। সফল হতে গেলে কিন্তু-টিন্তুকে ঝেড়ে ফেলে পথ চলতে হয়। এখন দেখছি তোমার জীবনেই অনেক কিন্তু, শিলু!'

এরপর অনেকটা সময় ওরা বসেছিল শিশুপার্কে। শব্দহীন। সেদিন সোনালি বিকেল শেষ হয়ে গোধূলি নেমেছিল। পশ্চিম দিগন্তের সূর্যটায় সিঁদুরের রং ধরেছিল।

দেবদারু, নারিকেল গাছের পাতায় আর পুকুরের পানিতে সন্ধ্যা নেমেছিল। কিন্তু কথা আর খুব একটা এগোয় নি।

রোমেল বুঝে গিয়েছিল, শিউলিদের সমাজে রোমেলের কোনো মূল্য নেই। নেই শিলুর কাছেও।

এরপর সে আর পিছু ফেরে নি। প্রাণের সীমানায় একরাশ বেদনা নিয়ে সে মায়ের কোলে ফিরে এসেছিল।

থার্ড পিরিয়ডে ডিগ্রির ক্লাস নিচ্ছিল রোমেল। এমন সময় অফিসের পিয়ন সেলিম এলে জানালো—'স্যার, আপনার একজন গেস্ট এসেছেন।'

'আমার গেস্ট?' অবাক হয় রোমেল।

'জি, একজন সুন্দরী মহিলা। কোলে ফুটফুটে একটা বাচ্চাও আছে। ওয়েটিং রুমে বসিয়ে রেখেছি।'

রোমেল ভেবে পেলো না, তার কাছে কে আসতে পারে! এই মফস্বলে সুন্দরী মহিলা তার খোঁজে—অবাক হওয়ার মতোই ব্যাপার।

ওয়েটিং রুমে ঢুকে চমকে উঠলো রোমেল—'শিউলি তুমি!'

প্রথমে ঠিক চিনতে পারে নি রোমেল। ভালো করে খেয়াল করতেই অনেকদিন পরে হলেও ঠিক চিনে ফেলে। সেই শিলু—ইউনিভার্সিটি লাইফের সহযাত্রী। এক সময়ের মনের মানুষও।

'কেমন আছো রোমেল?'

রোমেল এড়িয়ে যায়, বলে, 'সত্যি শিলু, আমার কেন জানি মনে হতো, আসবে। একদিন তুমি আসবেই। বাচ্চাটা তোমার? খুব সুন্দর তো! এসো তো মা মণি!'

পিছুটান কিংবা কান্না ছাড়াই বাচ্চাটি রোমেলের কোলে এলো। শিউলি কিছু বলছে না দেখে রোমেল বললো, 'ও স্যরি! তোমাকে খালি মুখে বসিয়ে রেখেছি। এই সেলিম—।'

'আমি কিছু খেতে আসি নি রোমেল।' শুকনো মুখে শিউলি বলে, 'তুমি কি আমায় ক্ষমা করতে পেরেছো রোমেল?'

রোমেল বাচ্চাকে আদর করতে করতে বলে, 'কোনো কাজে এসেছিলে বুঝি! তোমার ঘর-সংসার কেমন চলছে শিলু? তোমার স্বামীর শরীর-স্বাস্থ্য ভালো তো? জানো, খুব ব্যস্ত থাকতে হয়। ইচ্ছে থাকলেও অনেক কিছুই করা হয়ে ওঠে না।' একনাগাড়ে বলে যায় রোমেল।

শিউলি কোনো প্রত্যুত্তর দেয় না। নিস্পলক চোখে, শব্দহীন মুখে রোমেলকে দেখে।

কলেজের পাশেই একটা প্রাইমারি স্কুল। স্কুল ছুটি হয়েছে হয়তো। ক্লাস ওয়ানে পড়ুয়া একটা শিশু ছলছল চোখে রোমেলের পাশে এসে দাঁড়ালো। রোমেল শিশুটিকে বুকে চেপে বললো, 'কী হয়েছে বাবা, কাঁদছো কেন?'

'আব্বু আমাকে নিতে আসে নি।'

রোমেল বললো, 'আমার বড় ভাইয়ের মেয়ে, ইসরাত।'

শিউলির খুব ইচ্ছে হলো জানার, রোমেল বিয়ে করেছে কিনা? কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হলো না। ভাবলো, অহেতুক কেঁচো খুড়তে সাপ বের করার মতো বুকের জমাট ব্যথাটা জাগিয়ে লাভ কী? শুধু ভাবলো, বলা হলো না। টোল পড়া গালে চোখের জলের নদী নামিয়ে বললো, 'আমি হেরে গেছি রোমেল। আমার জীবনটা শেষ হয়ে গেছে। তোমাকে ফিরিয়ে বাবার পছন্দের ছেলেকে বিয়ে করে সব এলোমেলো হয়ে গেছে আমার। স্বামী নামের নরপশু শয়তানটা আমাকে নিঃশেষ করে দিয়েছে।'

'ছিঃ শিলু, স্বামী সম্পর্কে এমনটি বলতে নেই।'

'স্বামী হিসেবে সে যে অযোগ্য রোমেল। তাকে স্বামী ভাবতেই আমার ঘৃণা হয়। প্রথম দিকে ঠিকই ছিল। বছর না যেতেই ওর চরিত্র প্রকাশ পায়। মদ আর পর-নারীতে আসক্ত নরপিশাচটাকে চিনতে আমার বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছিল। প্রতিবাদ করেও যখন কোনো কাজ হয় নি, তখন সিদ্ধান্ত নিই আর থাকবো না ওর কাছে। চলে আসি বাবা-মার সংসারে। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। নাজনীন তখন আমার পেটে।'

আর বলতে পারে না শিউলি। আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদে। কাঁদতেই থাকে। চোখের কোণে অশ্রুর বন্যা বয়ে চলে। রোমেল ওকে থামায় না। কাঁদতে দেয়।

রোমেল বলে, 'কিন্তু শুনেছিলাম ছেলেটা শিক্ষিত, বাবার সাথে ব্যবসা দেখাশুনা করে।'

শিউলি নিজেকে সামলে নিল। আঁচলে চোখ মুছে উদাস গলায় বললো, 'আমাদের সমাজ, সমাজের মানুষগুলোর নিয়মনীতি এমনই রোমেল। মেয়ের বাবা-মা খোঁজেন বড় লোকের ছেলে। মোটা বেতনের চাকরি করে অথবা ব্যাংক ব্যালেন্স আছে। ব্যস। কন্যা বিয়ে দেয়ার উপযুক্ত জায়গা সেটাই। ছেলে দেখতে কেমন, ছেলের স্বভাব-চরিত্র এসব কোনো ফ্যাক্টর না। বাবা-মা চান মেয়ের আড়ম্বরপূর্ণ জীবন হবে। কিন্তু তাঁরা মেয়ের জীবন, জীবনের সুখ-দুঃখের কথা একবারও ভাবেন না।'

শিউলি থামে। ধাতস্থ হয়ে বলে, 'আমি তোমাকে ঠকিয়েছি রোমেল। সারাজীবন এক সঙ্গে থাকবো বলে অঙ্গীকার করেছিলাম। কিন্তু তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। তাই ভুলের মাশুল দিয়ে চলেছি বাস্তবতার ঘানি টেনে।' এরপর শিউলির কণ্ঠ জড়িয়ে আসে।

'তুমি ঠিকই করেছিলে শিলু।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে রোমেল, 'তোমাকে জীবনের সাথে জড়াবার ইচ্ছে আমার ছিল, কিন্তু সঙ্গতি ছিল না। আর তাছাড়া শূন্য হাতে আমার অনিশ্চিত জীবনের সাথে বেঁধে রাখার ভরসাও পাই নি তোমার কাছে। তাই শত কষ্ট বুকে চেপে চলে এসেছিলাম। তুমি সুখী হবে, তোমার বাবার বন্ধুত্বের বন্ধন আরও দৃঢ় হবে, এই ভেবে মায়ের কোলে ফিরে এসেছিলাম। তোমাদের মতো বৃত্ত-বৈভব হয়তো নেই, তবু তো একটা নীড় আছে। সংসারে মা-বাবা আছেন। আছে ছোটবোন, বড় ভাইয়ের দুরন্ত দুটো ছেলেমেয়ে। সব মিলিয়ে দিন চলে যায় আমার।'

শিউলি কিছু বলে না, নিঃশব্দে ডুবে থাকে।

রিস্ট-ওয়াচে চোখ রেখে রোমেল বলে, 'আমার ক্লাস আছে শিলু। একটা ছাত্রীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপত্তি না থাকলে আমাদের গরীবালয়টা একবার দেখে যেও।'

শিউলি তবু শব্দহীন চোখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

শিউলির সামনে থেকে চলে আসে রোমেল। ক্লাসের উদ্দেশে পা বাড়ায়। কেন জানি খুব অস্থির লাগে তার। জীবনের বাঁকে অনেক দেখেছে সে। জীবন মানে জীবন। বাস্তবতার কঠিন শেকলে আটকে পড়া এক জীবন্ত কারাগার। আপন ভাবনার পূর্ণতা খোঁজে সবাই।

সহসা রোমেলের মনের ওপর বিষণ্নতা এসে ভর করে। কী ভেবে করিডোর থেকে টুক করে নেমে কলেজের পেছনের সরু রাস্তা ধরে সে। উদ্দেশ্যহীন হাঁটতে থাকে। দু পাশে দেবদারু আর ঝাউগাছ। মাঝ রাস্তায় রোমেল। নিঃসঙ্গ এবং একা।

• • •

দোয়েলী

এম এ আলীম

উৎসর্গ :

দিলারা আলোকে
লেখালেখির জগতে আসার পেছনে যার ভূমিকা মুখ্য,
তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ

লেখক-পরিচিতি

জন্ম ১ জানুয়ারি ১৯৮৪, কুমিল্লায়। পিতা মোহাম্মদ আলী, মাতা সুফিয়া খাতুন। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে এম এ আলীম চতুর্থ। কৈশোর ও যৌবনে অবস্থান করেন গ্রামের ক্ষেত-খামার, মেঠো পথ এবং সবুজের সমারোহে। বাংলাবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ায় হাতেখড়ি। সমাপ্তি কুমিল্লা মুরাদনগরের কাজী নোমান আহমেদ ডিগ্রি কলেজে। বর্তমানে ঢাকায় একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত। শত ব্যস্ততার মাঝেও নিরলস চালিয়ে যাচ্ছেন লেখালিখি। দৈনিক দিনকাল ও বাংলাবাজার পত্রিকায় নিয়মিত, অন্য কয়েকটি দৈনিকে খণ্ড কালীন এবং বিশেষ সংখ্যাগুলোতে গল্প, কবিতা ও কলাম লিখছেন। এ ছাড়া, পাক্ষিক এবং মাসিক বেশ কিছু সাহিত্য পত্রিকায় নিয়মিত লিখছেন। সম্মাননা পেয়েছেন **'কিশোর প্রতিভা সাহিত্য পুরস্কার ২০০২'** ও **'জিয়া সাংস্কৃতিক সংগঠন জিসাস পদক ২০০৩'**।

প্রকাশিত গ্রন্থ

হায়রে প্রেম
উপন্যাস, একুশে বইমেলা ২০০৩

জিহানদের বাড়িতে আজ বিয়ের অনুষ্ঠান। চারদিকে হৈ-হুল্লোড় আর আনন্দের জোয়ার বইছে। খানাপিনা নিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের দৌড়াদৌড়ির অন্ত নেই। কিন্তু জিহান নিজ গৃহের এক কোণে বসে অল্প সাউন্ডে ইংলিশ ব্র্যান্ডের গান শুনছে আর বঙ্কিমের কপাল কুণ্ডলা উপন্যাসে চোখ বুলাচ্ছে। একাকিত্ব আর নীরব-নিস্তব্ধ কক্ষে অবস্থান করা তার প্রিয় কাজের একটি। হঠাৎ তার একাকিত্বে ভাগ বসিয়ে দিল এক ডানাকাটা পরী। পরী হবে? কিন্তু দিন-দুপুরে শত মানুষের কলরবে গৃহে কোনো পরী প্রবেশ করবে কেন? পরীরা তো নেমে আসে জোছনা রাতে। এই ভেবে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পরীটার আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে নিল জিহান। নাহ্, এটা পরী নয়, মানুষই। তবুও তার ঘোর কাটে না, আরো কিছুক্ষণ দেখলো। এ ঘটনাটা যদি রাতে হতো, এতোক্ষণে জিহান চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারাতো নিশ্চিত। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পর নিশ্চিত হলো এটা মানুষ, তবে মেয়ে-মানুষ। পরী ভেবে অনেকেই ভুল করবে তার সাজগোজ দেখে। শারীরিক রূপ-লাবণ্য মেয়েদের আলাদা একটা প্লাস পয়েন্ট; তার ওপর যদি আকর্ষণীয় সাজগোজ হয়? একটি গাঢ় গোলাপি রংয়ের রেশমি শাড়ি, তার ওপর বিভিন্ন রংয়ের পুঁতি এবং মিহি জড়ির কাজ করা। ম্যাচিং করা মেকআপ, লিপস্টিক, ব্লাউজ হাতে শাড়ির সাথে ম্যাচ করা আট ইঞ্চি পরিমাণ বেলোয়ারি কাঁচের চুড়ি। রিনিঝিনি মনকাড়া শব্দ, মাঝে সিঁথি করে টিকলি পরেছে। নাহ্, জিহান আর চেয়ে থাকতে পারছে না, চোখ ধাঁধিয়ে আসছে। সে প্রকৃতিস্থ হয়ে মৃদু হেসে বললো, 'তুমি আমার রুমে! ভুল করে ঢুকলে না তো?'

'আপনি একটা আচ্ছা মানুষ তো! সব সময় গল্পের বই আর গানের ক্যাসেট নিয়েই পড়ে থাকেন দেখছি।'

'তাই বুঝি?'

'কোথায় একটু সবাই মিলে বাইরে বেড়াতে যাবো।'

'ইদানীং আমার ঘরে বসে সময় কাটাতেই ভালো লাগে।'

'ছ্যাকা-ট্যাকা খেয়েছেন নাকি?'

'তুমি যদি সত্যিই ছ্যাকা দিয়ে থাকো, তবে খেয়েছি।'

'আমি আপনাকে ছ্যাকা দিতে যাবো কেন?'

'তাহলে আমি ছ্যাকা খেতে যাবো কেন?'

দুজনেই মুচকি হাসে, দুজনই খানিক চুপ। দুজনের মনের মধ্যেই যেন হাতুড়ি পেটানো শুরু হয়েছে। বুকের ভেতর ধরাস ধরাস শব্দ হচ্ছে। জিহানের পায়ে কিঞ্চিৎ কাঁপুনিও ধরেছে। লিলি নিঃশব্দে জিহানের সামনে রাখা চেয়ারে এসে বসলো। জিহান যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। শরীরের টেম্পারেচার হাই হতে শুরু করেছে। চিকন

একটা ঘাম দিয়েছে তার সমস্ত অঙ্গে। পাশে রাখা টেবিল-ফ্যানের সুইচটা অন করতেই স্বস্তি। নীরবতা ভেঙ্গে জিহান বললো, 'তোমাকে আমি কী নামে ডাকবো?'

'কেন, লিলি বলে ডাকবেন।'

'লিলি তো সবাই ডাকে। তোমার নামে আলাদা একটা বৈচিত্র্য আনতে চাই।'

'কেমন?'

'তোমাকে আমি দোয়েলী বলে ডাকবো। নামটা আমিই আবিষ্কার করেছি। জানো, নামটা কেন যেন আমার কাছে খুবই প্রিয় মনে হয়।'

লিলি কিছুটা আওয়াজ করেই হেসে বললো, 'এটা তো পাখির নাম।'

'মিথ্যে কথা, এটা পাখির নাম নয়। পাখির নাম তো দোয়েল শুনেছো, দোয়েলী কি শুনেছো?'

'মাদি দোয়েলকে হয়তো দোয়েলীই বলে।'

জিহান মুচকি হেসে বললো, 'তাহলে বুঝতে পেরেছো?'

'কিছুটা।'

'আজ তোমাকে সাজিয়েছে কে? নিশ্চয়ই তুমি সাজো নি।'

'ভাবী সাজিয়েছে।'

'মানে, আমার আপু?'

'হুঁম। সাজটা কি আপনার পছন্দ হয়েছে?'

জিহান গোগ্রাসে তাকিয়েই আছে।

'কী হলো, বললেন না যে কেমন সেজেছি?'

'আমার চাহনিতে বোঝা যাচ্ছে না তুমি কেমন সেজেছো? আমার এ যাবত কালের প্রথম একটি দোয়েলী, যে কিনা আমাকে গল্পের বই আর সঙ্গীত-শ্রবণ থেকে নিজের দিকে পূর্ণরূপে আকৃষ্ট করতে পুরোপুরি সক্ষম হয়েছে। সে দোয়েলীটি কে, জানো? তুমি।'

'সাহিত্যিক ভাবসাব দিয়ে ওসব হবে না।'

'দোয়েলী, এ সাহিত্যিক ভাবসাব বলো আর যাই বলো, আমি ঘর থেকে বের হচ্ছি না কেন, আশা করি বুঝতে পেরেছো।' লিলি কোনো কথা না বলে চোখ দুটো জিহানের দিকে মেলে ধরে তাকালো। জিহান যেন ও দু চোখে জীবনের সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছে। চোখ, মুখশ্রী, নেশা ভরা ঠোঁট, কপোল যুগল দেখতে দেখতে এক পর্যায়ে তার সিরিয়াস যৌন নেশা জেগে উঠলো। নিজের ঠোঁট দুটো বাঁকা করে হালকা কামড়ের ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলো দোয়েলীর সদ্য ফুলে-ফেঁপে ওঠা সুডৌল, আকর্ষণীয় দু টুকরো মাংসপেশির ওপর। আর নিজেকে সামলাতে পারছে না, শেষমেষ স্পৃহা থামাতে নিজের বাঁ হাতের তর্জনী আঙ্গুলের ডগা দিয়ে দোয়েলীর একটি মাংসখণ্ডের অগ্রভাগে হালকা স্পর্শ করতেই দোয়েলীর শরীরটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলো। দ্রুত শ্বাস নিতে নিতে বিশাল গোখরার মতো ফুঁপাতে লাগলো, অগ্নিশর্মা হয়ে স্থান ত্যাগ করতে চাইলো। জিহান বুঝতে পারলো দোয়েলী খুব মাইন্ড করেছে। এটা তার ঠিক হয় নি, দোয়েলীর অনুমতি নেয়া প্রয়োজন ছিল। চটজলদি দোয়েলীর একটি হাত চেপে ধরে বললো, 'দোয়েলী, আই এ্যাম স্যরি, আই এ্যাম এক্সট্রেমলি স্যরি।' কিন্তু দোয়েলী

আরেক হাতে জিহানের হাত ছাড়াতে গেলে অন্য হাতের বেলোয়ারিগুলো খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ট্রিং ট্রিং শব্দে ফ্লোরে পড়তে লাগলো। দোয়েলীর হাত খানিক জায়গায় কেটেও গেলো।

শেষ দৃশ্যের অবসান হওয়ার আগে প্রবেশ করলো জিহানের বড় বোন। জিহান কিঞ্চিৎ লজ্জিত হয়ে দোয়েলীর হাতটা ছেড়ে দেয়ার আগেই দোয়েলী হেঁচকা টানে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে রুম থেকে চলে গেলো দ্রুত পায়ে। জিহান বিব্রতকর অবস্থায় পড়বে ভেবে বড় বোন বিষয়টা দেখেও না দেখার ভান করে চলে গেলো। কী-ই বা করার আছে তার? একদিকে আপন ছোট ভাই, অন্যদিকে আপন ননদিনী, উভয়-সংকটে অবস্থান করছে সে। জিহান বিছানায় শুয়ে বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে বললো, 'যাক বাবা, এ যাত্রা হয়তো বেঁচে গেলাম।' কিন্তু ধরা খেলো রাতে। বাড়ি ভরা মেহমান থাকায় তার বড় বোন ছোট মেয়েটা নিয়ে জিহানের ঘরে শুতে এলো। জিহান সাদরে গ্রহণ করলো। বড় বোন, মানা করার কোনো উপায় নেই। শুয়েই বড় বোন কালু গাজীর কিচ্ছা শুরু করে দিল।

'জিহান, তুমি আমার ছোট ভাই, সবেমাত্র কলেজে পা দিয়েছো, সামনে অনেক সময় আছে। অনেক মেয়ে জীবনে আসবে। আগে নিজেকে গড়ো। প্রতিষ্ঠিত হও। ভালোভাবে লেখাপড়ায় মন দাও। আজেবাজে চিন্তা এখনই মাথায় এনো না। এগুলো করার ঢের সময় পাবে।' কথাগুলো যে বড় বোন কেন বলছে জিহানের বুঝতে একটুও কষ্ট হলো না। তার ওপর দিয়ে মনে হয় একশ নব্বই কিলোমিটার বেগে টর্নেডো বয়ে যাচ্ছে। জিহানের মুখে কোনো কথা নেই। বড় আপু—কিছু বলতেও পারছে না। অবশ্য এ ব্যাপারে আপুর সাথে ফ্রি থাকলে কোনো সমস্যা ছিল না। দেধারছে টকিং করা যেতো। কিন্তু আপু তো শাসানির সুরেই বলে যাচ্ছে। জিহান মনে মনে বলে, 'আমি কি এখনো ছোট আছি নাকি? আমার কি এখনো যৌবন আসে নি? আমার কি মন চায় না কোনো মেয়ের সাথে কথা বলি? আমার কি মন নেই? আমি কি প্লাস্টিকের তৈরি?' ভাবছে—কথাগুলো যদি চেঁচিয়ে বলতে পারতাম, তবেই আপু টের পেতো আমি কী চাই। কিন্তু আপুকে তা কে বোঝাবে? আপুটা এতো স্বার্থপর! সে কী ভাবে নিজেকে? ওর ননদিনী ছাড়া আর কোনো দোয়েলী নেই? এসব ভাবতে ভাবতে এক সময় তন্দ্রা নামক রাক্ষসীটা এসে তাকে গ্রাস করে ফেললো।

সকাল হতেই জিহান দোয়েলীর কাছে আরেক দফা ভুল স্বীকার করে নিল। এতে কিছুটা পাপ হয়তো লাঘব হয়েছে। দোয়েলী মুচকি হেসে বললো, 'হয়েছে হয়েছে, আর ন্যাকা সাজতে হবে না। ভুল করে ক্ষমা চাওয়া হচ্ছে। ভুল না করলেই হয়।' জিহান কিছুটা আবেগাপ্লুত স্বরে বললো, 'আসলে, আমি মানে...।' সে শেষ করতে পারলো না। দোয়েলী বলতে লাগলো, 'থাক থাক, আর ভণিতা করতে হবে না। ছেলেরা যে মেয়েদের একা পেলে কী করে তা আমার ভালো করে জানা আছে।'

জিহান মুচকি হেসে বললো, 'তা পূর্বের কোনো অভিজ্ঞতা আছে নাকি?'

'খোঁচা মেরে কথা বলবেন না। আপনর মতো দুঃসাহস কেউ করার সাহস পায় নি।'

'তা ঠিক। আমিই যখন ফেল মেরেছি, তো আর কোন শালা কী করবে তা আমার বুঝতে বাকি নেই। অন্তত পক্ষে তোমাদের মতো মেয়েদের কিছু করা সম্ভব নয়।'

আসলে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়ে এক সাথে মেলামেশা করলে যৌন-শিকার হবে এটাই স্বাভাবিক। এটা প্রকৃতির নিয়ম। এমন মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে খুবই কম যারা নিজের কামরিপু নিয়ন্ত্রণ করে যুবা বয়স অতিক্রম করতে পেরেছে। তা ছেলে হোক বা মেয়ে হোক। কখনো ছেলেদের অগ্র-ভূমিকার জন্য, কখনো বা মেয়েদের অগ্র-ভূমিকার জন্য। তবে ছেলেরাই এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদর্শন করে থাকে বেশি। ছেলেরা স্ফুলিঙ্গ আর মেয়েরা ইন্ধন। ছেলেরা একবার আগুন জ্বেলে দিলে মেয়েরা অনবরত জ্বলতে সক্ষম, যেন চন্দন কাঠ পুড়ে শেষ হতে চায় না।

দোয়েলী ফেলে নিজ বাড়িতে চলে এসে জিহান নিদারুণ বিষণ্ণতায় দিনাতিপাত করতে লাগলো। তার দিন যেন কাটতে চায় না। এখন গান শোনা বিরক্তিকর মনে হয়, প্রিয় বইগুলোও হাতে নিতে ইচ্ছে করে না। বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়া বিষাক্ত মনে হয়। এই উপসর্গগুলো মানুষের জীবনে প্রবেশ করলে সহজ কাজগুলোও কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যায়। আর যখনই প্রিয় মুখের দর্শন মেলে মুহূর্তের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যায়। যদি তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক অটুট থাকে তবে তো অনেক অসম্ভবকেও সম্ভব করে ফেলে তাদের এই পবিত্র বন্ধনের ছোঁয়া।

জিহান বড়ই তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লো। এ তৃষ্ণা শুধু জল দিয়ে মিটবে না। চাই প্রিয় মুখের মুচকি হাসির অদৃশ্য জলের পেয়ালা। সেই পেয়ালা পান করেই তৃষ্ণা মেটাতে উদগ্রীব হয়ে বোনের বাড়িতে বেড়ানোর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করলো জিহান। এদিকে দোয়েলীর মনে সেদিন কৌশলে হোক আর ভালোবাসার ছলেই হোক, জিহান একটি পোকা ঢুকিয়ে দিয়েছে। সেই পোকাটা কিন্তু বসে নেই। পোকাটা দিনরাত জিহানের কথা দোয়েলীকে মনে করিয়ে দিচ্ছে—পোকাটার কাজই যেন এটা। পোকাটার যন্ত্রণায় দোয়েলীও দোয়েলের সান্নিধ্য লাভের আশায় ছটফট করতে লাগলো।

জিহানকে দেখে দোয়েলী উৎফুল্ল চিত্তে জিজ্ঞাসা করলো, 'কেমন আছেন? আমি জানতাম আপনি আসবেন।'

জিহানের সোজা-সাপটা উত্তর, 'তুমি না জানলেও আমি আসতাম। একবার নয়, একাধিক বার।'

'বোনের বাড়িতে তো ভাইয়েরা আসবেই।'

'বোনের বাড়ি না হলেও আসতাম।'

'তখন কেন আসতেন?'

'কেন আসতাম জানি না, তবে আসতাম।'

দোয়েলী মুচকি হেসে বললো, 'মানসিক ভারসাম্য ঠিক আছে তো?'

'এতোক্ষণ ঠিক ছিল না, তুমি যখন হাসলে, ঐ হাসিটা দেখা মাত্রই আমি ঠিক হয়ে গেছি।'

'পাগল! আপনি আসলে কথার তীর ছোটাতে পটু।'

'যেমন!'

'যেমন ঘোড়ার ডিম। ফ্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়া শেষ করুন, পরে বেড়াতে যাবো।'

জিহান আর কথা বাড়ালো না। বাধ্য ছেলের মতো দোয়েলীর সাথে ডাইনিং রুমে গিয়ে অল্প কিছু মুখে দিয়ে দুজনে সোজা নদীর পাড়ে। আহ্, কী মনোরম পরিবেশ! এক পাশে ছোট্ট বালুচর, অন্য পাশে চোখ ধাঁধানো সবুজালয়। বিকেলের মিষ্টি রোদ যেন এই প্রকৃতির সাথে গভীর প্রেমে মগ্ন।

সামনেই দৃশ্যমান আঁকা-বাঁকা হয়ে বয়ে যাওয়া শৈবালিনী। ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকা। আবার কিছু পাল-তোলা নৌকাও দেখা যায়। জেলেরা মহাসমারোহে মনের সুখে বিভিন্ন সুরে গান গাইছে আর মাছ ধরছে। এ যেন মনভোলানো এক অপূর্ব নিসর্গ, যার মধ্যে জিহান খানিকটা সময় হারিয়ে গিয়েছিল। দোয়েলীর কনুইয়ের খোঁচায় ফিরে এলো পৃথিবীতে। দুজন দুজনার চোখে তাকিয়ে একটি চোরাবালি হাসিতে মেতে উঠলো। অনেকক্ষণ চেয়েই কাটিয়ে দিল, এ যেন দেখাদেখির প্রতিযোগিতা চলছে। জিহান বাধ্য হলো দৃষ্টি ফেরাতে, না হলে আবারো পূর্বের সমস্যার পুনরাবৃত্তি হতে সময় লাগবে না। উভয়ে নিজেকে সামলে নিল। দোয়েলী বললো, 'ভালোই তো লাগছিল, চোখ ফেরালেন কেন?'

জিহান একটা আত্মতৃপ্তির ঢেকুর গিলে দোয়েলীর দিকে তাকালো। আর মনে মনে ভাবলো—দোয়েলী কি তবে...? এবার জিহান কিছুটা সাহস পেলো। অধিকারও বটে। দোয়েলীর মসৃণ কপোল যুগলে জিহান ওর হাত যুগল দিয়ে মায়াময়ী স্পর্শে চেপে ধরে। দোয়েলী বলে, 'কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো...।' আর কিছু বলতে পারলো না। দোয়েলীও যেন জিহানের মাঝে হারিয়ে যেতে চাইছে।

আজ আর কোনো বাধা নয়, বুকে টেনে নেয়ার পালা। আজ জিহানকে সব বিলিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে তার। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিশপিশ করছে যৌবনের তাড়নায়। কিন্তু সামাজিক বিড়ম্বনা বলে কথা। শেষে না আবার কুজনেরা পাড়া গেয়ে বেড়াবে, সেই ভয় ওদের ঐ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখলো।

জরুরি ফোন পেয়ে চট্টগ্রাম বড় বোনের বাসায় যেতে প্রস্তুত জিহান। দোয়েলী যেন তাকে ছাড়তে চাইছে না, মনে হচ্ছে সে তার জীবন থেকে একেবারে হারিয়ে যাচ্ছে।

'তাড়াতাড়ি ফিরবেন কিন্তু। ফিরেই আমাদের এখানে চলে আসবেন।'

'আহা, কী বোকা মেয়ের মতো কথা বলছো? আপু যেতে বলেছে তাই যাচ্ছি। হয়তো কোনো জরুরি কাজ আছে, তাড়াতাড়িই ফিরবো লক্ষ্মীটি। ভালো থেকো।'

চট্টগ্রাম আসতেই বড় বোনের আরেক দফা শাসানি।

'তুই ডাকাত হয়ে গেছিস। একটিবার তোর বোনের কথা মনে পড়ে না? তোকে ছাড়া একটি রাতও কি আমি ঘুমাতে পেরেছি? আর সেই তোর কিনা তিন-চার মাস কোনো খবর নেই। বাড়িতে কতোবার ফোন করেছি, তোকে পাই নি। ইদানীং নাকি

তুই আত্মীয়দের বাড়ি বাড়ি লম্বা সফরে বেড়াচ্ছিস? তোর ক্যাসেট-প্রেম আর বই—এগুলোর কী হলো?'

দম বন্ধ করে শুধু একটানা বলেই যাচ্ছে। জিহান ভেবেছিল, কোনো জরুরি কাজের জন্য তলব। স্রেফ দেখা করার জন্য যে তাকে ডাকা তা জানলে কি সহজে ধরা দিত? কারণ, এখন বোন-টোন দিয়ে আর চলে না। বোনের ভালোবাসা বোনের মতো, আর দোয়েলীর ভালোবাসো! সে তো এক প্রাণ-চাঞ্চল্যকর অধ্যায়, যা কিনা বলে-লিখে শেষ করা সম্ভব নয়।

বোনের শাসানি শেষ হলে জিহান বললো, 'এই তোমার জরুরি কাজ? তুমি জানো, কতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফেলে এসেছি?'

'কী এমন কাজ যে আমাকে দেখার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেলো?'

নিশ্চুপ জিহান। সে গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা কি সবার কাছে বলা যায়?

'কিরে, বললি না কী কাজ?'

'ঐ আছে একটা কাজ।'

'কাজ-টাজ যাই থাকুক, কিছুদিন বেড়িয়ে তারপর যাবি।'

জিহান বেড়াচ্ছে ঠিকই, কিন্তু পঞ্চমাত্মা পড়ে আছে দোয়েলীর কাছে। তা কি আর প্রকাশ করা যায়? হঠাৎ একদিন পাশের বিল্ডিংয়ের বোনের পরিচিত এক দোয়েলীর সাথে সাক্ষাৎ। সাক্ষাৎ থেকে কথোপকথন। আস্তে আস্তে এই দোয়েলীর প্রতি জিহান কিছুটা আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। আসলে দোয়েলীদের সংস্পর্শ যে কোনো দোয়েলকেই ঘায়েল করে ফেলতে পারে, যেমনি ভাবে আগুন মোমকে ঘায়েল করে। অবশ্য জিহানেরও দোষ কম নয়। ভাব-ভঙ্গিমা পরিবর্তন করে কথা বলাটাই তার অভ্যাস।

লিপি নামের এই দোয়েলীও দেখতে আগের দোয়েলীর চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। বরং এক ধাপ এগিয়ে। এই দোয়েলী জিহানকে পূর্ণরূপে অন্তর-আত্মায় বন্দি করে পুষতে শুরু করেছে। জিহান তো স্রেফ আলাপচারিতায় সময় কাটানোর জন্য কথা বলে। বোনের কাছ থেকে বিদায় পাচ্ছে না। নিজস্ব দোয়েলীর কোনো খবরও পাচ্ছে না। তার ভেতর ছটফটানি শুরু হয়ে গেলো। দিন দিন লিপি আরো কাছে আসতে লাগলো। তাদের বাসায় যাওয়া-আসা রীতিমতো চলছেই। লিপির মা-বাবাও বিষয়টা নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন। ছেলেটা মন্দ নয়। লিপির সাথে মানাবেও বেশ। তাঁদের চিন্তা-চেতনা মেয়ের সাথে মিশে একাকার। কিন্তু জিহান পোষে তার সেই পরী দোয়েলীকে। তারপরও লিপির সাথে তার অনেক কথা হয়েছে। নির্জনে অনেক সময় কাটিয়েছে। লিপি মানসিকভাবে প্রস্তুতও ছিল জিহান তাকে কিছু করুক। অনেকবার বাক্যালাপে, ইশারা-ইঙ্গিতে, অঙ্গভঙ্গিতে বোঝাতে চেয়েছে—তাকে জিহান তার মতো করে গ্রহণ করুক। জিহান তার সবকিছু লুট করে নিলেও সে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করবে না। তার আচরণে এটাই স্পষ্ট ফুটে উঠেছে বারবার। কিন্তু জিহান তার প্রথম দোয়েলীর কথা ভেবে লিপির কোনো ক্ষতি করতে পারে নি। সে বাড়িতে চলে যায়।

বাড়িতে পা রাখতেই জিহানের মাথায় পড়লো কোটি মন ওজনের বজ্র। যদিও চট্টগ্রামে বোনের বাসায় দিনকাল ভালোই কাটছিল, এক বিনোদিনী দোয়েলীর আকর্ষণীয় সংস্পর্শ—যে-কোনো মুহূর্তে নিজেকে বিলিয়ে দিতে যে সর্বদা প্রস্তুত

থাকতো, এমন সুযোগ ফেলে এসে দেখে—খাঁচার ভেতর বন্দি দোয়েলী খাঁচার কপাট ভেঙ্গে উড়াল দিয়েছে। সাথে সাথে যেন জিহানের একটি পাঁজর খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেলো। মনের ভেতর অকল্পনীয় একটা ব্যথার অনুভব প্রকাশ পেলো। কোনো কথা নেই তার মুখে। মনের অজান্তেই যেন চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো—সে ইচ্ছে করে উড়াল দেয় নি, খাঁচার কপাট ভেঙ্গে তাকে এক কাকের কাছে হস্তান্তর করেছে তার মা-বাবা। এখন ঐ বিশ্রী কাকটা দোয়েলীকে মজা করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। এমনটা ভাবতেই 'উহ্' শব্দ বেরিয়ে আসে জিহানের অন্তরাত্মা থেকে। ঐ গবেটটা কাকই তো বটে, ইয়া বড় ভুঁড়ি, কুচকুচে কালো, মাথায় টাক পড়ে গেছে, বয়সও হবে দোয়েলীর প্রায় দ্বিগুণ, বিশ্রী চেহারা, তেমন শিক্ষিতও নয়, তবে একটা গুণ আছে, তা হলো বর বিদেশ-ফেরত। বর্তমান যুগে কন্যার জনক-জননীরা এটাকে একটা বিরাট কিছু ভাবেন। মেয়ের জীবনটার একটু মূল্যায়নও করেন না। ছেলে পয়সাঅলা হলেই হলো।

জিহানের ভাবনার অন্ত নেই। তার একটাই দুঃখ, আমার সাথে তার মিলন নাই বা হলো, অন্তত একটা ভাত-শালিকের সাথেও তো হতে পারতো। উহ্ দোয়েলী, তুমি কি এজন্য জন্মেছিলে? কেন যে বেড়াতে গেলাম! এসব ভেবে কুঁকড়ে ওঠে জিহান। কিন্তু থাকলেই কি দোয়েলীকে আটকে রাখা যেতো? নানান জটিলতা ছিল। এর মাঝেও বড় দু ভাই এখনো বিয়ে করে নি। সামাজিক বৈষম্য বিরাজমান ছিল। তাই বলে কি বড়রা বিয়ে না করলে ছোটরা বসে বসে আঙ্গুল চুষবে? তা হয়তো দেখা যেতো, কিন্তু জিহানই তো উপস্থিত ছিল না। আবার ভাবনা—ও কেন একটি বারের জন্য আমার কথা ভাবলো না? নাহ্, আর ভাবতে পারছে না, চিন্তার মোড় ঘুরে গেলো। এমন একটা মেয়ে এমন স্বামীর ঘরে শুধু অর্থের কারণে। আমি না হয় কষ্ট পেয়েও একাকী রয়ে গেলাম, ও যে সারা জনম ঘোমটার নিচে ঘরের কোণে, পুকুর ঘাটে নিরিবিলি শুধু কেঁদেই যাবে। উহ্ দোয়েলী, আমি আর ভাবতে পারছি না। এসব ভেবে ভেবে জিহান রীতিমতো শুকিয়ে কাঠ। ব্যক্তিগত ভাবে নিজের শরীরে কেউ নির্যাতনের স্টিম রোলার চালালে স্বাস্থ্য তো খারাপ হবেই।

লোক মারফত দোয়েলীর গায়ে-হলুদের দিনের তোলা একটি ছবি সংগ্রহ করলো জিহান। ছবিতে বোঝা যাচ্ছে তার মন ভালো ছিল না। খুবই ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে তার চেহারা। স্মৃতি বলতে এই একটি ছবিই জিহানের মনকে সান্ত্বনা দেয়ার অবলম্বন।

প্রায়ই ছবিটা নিয়ে অপলক চেয়ে থাকে। যেন দেখা শেষ হয় না। 'দোয়েলী' বলেই চিৎকারের ভঙ্গিতে ছবিটা বুকের ওপর চেপে ধরে।

দোয়েলীর বিয়ে হয়েছে প্রায় সাত মাস। এ কদিন কী যে কষ্টে দিনাতিপাত করেছে তা শুধু জিহানই জানে। ছবি দেখে আর ভালো লাগছে না। দোয়েলীকে সশরীরে দেখার মনোবাসনা জেগে উঠলো। জিহান আজই যাবে তার দোয়েলীকে এক নজর দেখতে। দোয়েলী কি তাকে মনে রেখেছে? দেখতে পেলে সমাদর করবে তো? নানান ভাবনা মাথায় এসে জমাট বাঁধে। সবকিছু বাদ দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, এখনই রওনা দেবে দোয়েলীর স্বামীর গাঁয়ে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের বুকের ছাতি ফাটা দাবদাহ উপেক্ষা করে জিহান পথ চলছে। ঘামে এক প্রকার স্নান করা হয়ে গেছে তার। ভর দুপুর, দাবদাহ যেন ক্রমেই বাড়ছে। পানির পিপাসাও লেগেছে। গ্রাম্য এলাকা, হঠাৎ করে কার কাছে পানি চাইবে? নাহ্, পানি পান করা হলো না। পিপাসায় মরে গেলেও যদি একটু দোয়েলীর দর্শন মিলতো! হঠাৎ তার চোখ একদিকে অবতরণ করলো—থেমে গেলো সে, রাস্তার উত্তর পাশে বিরাট এক দিঘি, তাতে চারটি শান বাঁধানো ঘাট রয়েছে। উত্তর পাড়ে দোয়েলীর স্বামীর বাড়ি, ক্লু অনুযায়ী তাই মনে হচ্ছে। তিন পাড়ে অগণিত তালগাছ, নারকেল গাছ আর সুপারি বাগান। ছোট-খাটো একটা জঙ্গলও বলা চলে।

একটুও বাতাস নেই, তবুও গাছের পাতাগুলো ঝিরিঝিরি করে নড়াচড়া করছে। দিঘিতে মৃদু ছান্দিক ঢেউ বইছে। এমন সময় উত্তর ঘাটে একটি পরী নেমে জলকেলিতে নিমগ্ন। হাতে পানি নিয়ে কলকল ধ্বনিতে নাড়াচাড়া করছে। আবার মনের সুখে পানি সামনের দিকে ছিটিয়েও দিচ্ছে। জিহানের ভেতর আচানক মোচড় দিয়ে উঠলো—হেহ্, এটাই তো আমার দোয়েলী। কাছে গিয়ে বলবে—দোয়েলী, কেমন আছো? মনে সাহস পাচ্ছে না—যদি কথা না বলে, আবার হয়তো তাকে বাড়ি নিয়ে গেলো, এতে যদি ওর কোনো ক্ষতি হয়। না, তার কোনোটাই করলো না সে। আড়ালে দাঁড়িয়ে শুধু চোখের তৃষ্ণাটাই মেটাচ্ছে। নির্লজ্জের মতো গোগ্রাসে তাকিয়ে রইলো। বারবার তাকালো। দোয়েলী ফিরে যাওয়া পর্যন্ত শুধু ওর দিকে অপলক চেয়েই রইলো, কিছুই বললো না। অনেকদিন পর দোয়েলীকে দেখার সান্ত্বনা নিয়ে এই প্রচণ্ড দাবদাহ মাথার ওপর রেখে বাড়ি ফিরলো। কিন্তু একটুও দোয়েলীকে ভুলতে পারছে না। যদি কোনো বিকল্প দোয়েলী থাকতো তবে হয়তো এতো টেনশন হতো না। ঐ দোয়েলীর অভাবটা একটু হলেও পূর্ণ হতো। তাহলে কি আরেকটি দোলীর সন্ধানে যাবে সে? প্রয়োজনে তাকে বিকল্প রাস্তা খুঁজে নিতেই হবে। সময় ও কাল মানুষকে এটা জানিয়ে দেয়। তবে দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনার সুফল অনস্বীকার্য। পরিকল্পনা করেছিল বটে, বাস্তবায়নের সুযোগ পেলো কোথায়?

মানুষের জীবনের চাকা অচল করে দিতে এমন ছোটখাটো ঘটনাই যথেষ্ট। তবুও মানুষ বেঁচে থাকে, নতুন করে চাকা মেরামত করে নেয়। তাছাড়া কী-ই বা করার আছে? এভাবে চলছে পৃথিবীর কার্যপ্রণালী। তবুও প্রেম বলে একটা অনুভূত বস্তু বিরাজমান, যাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। মানুষ হলে মন থাকবে, মন থাকলে প্রেম হবে, প্রেম হলে দুঃখ আসবে, কেউ মেনে নেবে, কেউ মানবে না। আবার সুখও আসতে পারে। তা খুবই নগণ্য। এরপর কেউ দেবদাস সাজবে, কেউ রংবাজ বনে যাবে। কেউ বিনোদিনী, কেউ উদাসিনী, কেউবা রাজনটী। আবার কেউ যুগল প্রেমের সংসার-জীবনে সুখের নাগর-দোলায় দোল খেতে খেতে জীবন উপভোগ করবে। প্রেম-পরবর্তী সময়ে যুগল প্রেমের বিভক্তি ঘটলে অনেকেই বিকল্প পন্থা অবলম্বন করে বর্তমান যুগে। তা ছেলে হোক বা মেয়ে হোক। দোয়েলী যখন তার স্বামী নিয়ে সাংসারী হয়ে যেতে পারলো, যেভাবেই হোক সে মেনে নিয়েছে। জিহান কেন একা বসে কষ্ট পাবে? আল্ট্রা মডার্ন যুগে এটাও ভাবা যায়? যেখানে দোয়েল পাখির

মতো টিসা-টিসা রবে ডাকলে দোয়েলীর অভাব নেই, চারপাশ থেকে ছুটে আসে অগণিত দোয়েলী। তারপরও মনের মানুষ বলে কথা, যাকে প্রথমে নয়নে ধারণ করা হয়, যার নাম হৃদয়ে প্রথমেই অংকিত হয়, তাকে এতো সহজে কি ভোলা যায়? তবুও ভুলতে হয়।

মানসিক পরিবর্তন ঘটাতে জিহান কুমিল্লা শহরে বোনের বাড়িতে কিছুদিন থাকতে চলে গেলো। পরদিনই সাক্ষাৎ হলো বীণা নামের এক দোয়েলীর সাথে। পাশের বাসায় ভাড়া থাকে ওরা। বীণা এবার এসএসসি পরীক্ষা দেবে। বয়স তেমন হয় নি, কিন্তু রূপের অপরূপ মহিমা ওর সমস্ত অঙ্গে বিধাতা যেন উজাড় করে দিয়েছেন। বীণার কণ্ঠস্বর সত্যিই নজরুলের সেই গানকে মনে করিয়ে দেয়—'মোর বীণা উঠে কোন সুরে বেজে।' যদিও সে গান গায় না, কিন্তু তার কণ্ঠের যে কারুকার্য, সুখের যে মাধুর্য, কথার যে বাচনভঙ্গি, জিহানকে তার পেছনের সবকিছু ভুলিয়ে ঠিকই তার নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। পিচ্চি একটা মেয়ে এতো কিছু রপ্ত করলো কী করে? জিহান ভেবেই দিশেহারা। আবার ভাবে—যে এসএসসি পরীক্ষা দেবে সে আবার পিচ্চি কিসের? এখনো কি ওর কিছু বোঝার বাকি আছে? আকাশ-সংস্কৃতির যুগে যেখানে ফাইভ-সিক্স থেকেই শুরু হয়ে যায় প্রেমের লীলাখেলা, আর মেট্রিকুলেশনে পড়ুয়া মেয়ে এখনো বুঝি পিচ্চি রয়েছে—এটাও আমাকে মেনে নিতে হবে? এই ভেবে মনে মনে হাসে জিহান। বীণাকে দেখলেই তার কেমন যেন মনটা মোচড় দিয়ে ওঠে। জানালার ফাঁক দিয়ে শুরু হয় চোখে চোখে কথা। অঙ্গভঙ্গি, ইশারা-ইঙ্গিত, তারপর পত্রালাপ, শেষে জানালার ফাঁক দিয়ে হাতে হাত রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়া—এ যেন এক অভিনব প্রেম। আস্তে আস্তে আগের দোয়েলীর কথা কিছুটা ভুলতে থাকে জিহান। নতুন দোয়েলীর সংস্পর্শে তার মন্দ কাটছে না সময়।

আসলে মানুষের যে জিনিসের অভাব সেটাই চাহিদা থাকে, চাহিদা পূরণ হলে সময় তো ভালোই কাটবে। কিন্তু লিলি নামের দোয়েলী জিহানকে আজও মনে পুষে রেখেছে। কিন্তু মনে রাখলেই কি আর আগের মতো কাছে পাওয়া যাবে জিহানকে? সে এখন পরস্ত্রী, সামাজিক রীতি-নীতি তাকে মেনে চলতেই হবে। মা-বাবা কষ্ট পাবে, বা সামাজিক ভাবে লাঞ্ছিত হতে পারে; তা না হলে কবেই এই কাকের বাসা থেকে উড়ে চলে আসতো জিহানের কাছে। তাও কি আজ সম্ভব? জিহানেরও একই ভাবনা। তাই তো বিকল্প দোয়েলী খুঁজে পেয়েছে সে। কোচিংয়ের ছলে বের হয়ে বীণা জিহানকে খানিকটা সময় দিচ্ছে। ভালোই কাটছে দুজনের সময়। কিন্তু এই দোয়েলীটা কথা বলে কম। দশটা প্রশ্ন করলে একটার উত্তর মেলে। কিন্তু ঐ একটা কথাই জিহানকে পাগল করে তোলে, যেন ওর মনের সবকিছু উলট-পালট হয়ে যায় তখন।

দুজনের মনের আদান-প্রদান জমে উঠেছে বেশ। বিষয়টা কিছু আঁচ করেছে বীণার মা, কিন্তু নিশ্চিত না হওয়াতে তেমন গুরুত্ব দেয় নি বিষয়টা। বীণা যখন বোর্ড পরীক্ষায় ডাব্বু মারলো, তখন বিষয়টা সবার কাছেই পরিষ্কার হয়ে গেলো—পরীক্ষার আগে অতিরিক্ত ডেটিং, নতুন প্রেমের টেনশন, উদাসী-উদাসী ভাব, এই সবকিছুই পরীক্ষায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। জিহান ভাবলো, আমারও দোষ কম নয়। নিজের

একটু প্রফুল্লতার জন্য মেয়েটার প্রথম ধাপটা নষ্ট করে দিলাম। যা শালার, এখানে আর এক মুহূর্তও নয়। বলেই ঢাকা চলে এলো এক বন্ধুর বাসায় বেড়াতে।

জিহান বন্ধুকে বললো, 'একটা চাকরি-বাকরি যোগাড় করে দিন না।'

'আপনি চাকরি করবেন?'

'ঢাকা থাকতে হলে তো একটা কিছু করতে হবে।'

কয়েক মাস ভালোই চাকরি করছে। মাসে দু-বার বীণাকে না দেখলে তার অস্থিরতা বেড়ে যায়। এখন আর ডেটিং চলে না; বন্দি রাজকন্যার সাথে জানালার ফাঁক দিয়েই যা কথা আছে সেরে নেয়। হাতে হাত রাখে। মাঝে মাঝে দু ঠোঁটের আলতো পরশ বীণার হাতে লাগিয়ে কিছুটা সুখ অনুভব করে জিহান। নতুন চাকরি, ছুটি পাওয়া যায় না। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে যেটুকু সময় পায় সেটাই বীণাকে দিতে সচেষ্ট জিহান। তাদের এখন নিয়মিত সাক্ষাৎ না হওয়াতে টেনশনও কমে গেছে। কথায় আছে না, কাছে থাকলেই জ্বালা বেশি, দূরে থাকলে মনকে শাসানো যায়। হায়রে বোকা মন, যাকে চাই সে তো দূরে। এদিক থেকে বীণা তার ফ্যামিলিতে কিছুটা ফ্রি। আগে তাকে চোখে চোখে রাখতো তার মা। জানতে পেরেছে, ছেলেটা এখন ঢাকায় থাকে। তাই কিছুটা ছাড় দিয়েছে মেয়েকে।

একদিন বীণা বললো, 'আপনি এভাবে ঘন ঘন বাড়ি আসেন কেন? বেতনই বা কতো পান? সব তো গাড়িতেই দিয়ে দিচ্ছেন।'

জিহান কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, 'তোমাকে ছেড়ে গিয়ে ঢাকায় আমার একদম থাকতে ইচ্ছে করে না। বিশ্বাস করো বা না করো, আসলে তোমাকে দেখতেই আমি চলে আসি। তোমাকে একটু দেখেই যেন আমি শান্তি পাই।'

একথা বীণাকে আরো আবেগময়ী করে তোলে। করুণ কণ্ঠে বলে উঠলো, 'না, আপনি এভাবে আসবেন না।' বলেই জিহানের দুটো হাত চেপে ধরলো। দুজনের শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে লাগলো। দুজনই ছলছল নয়নে খানিকটা সময় তাকিয়ে রইলো দুজনের চোখের পানে। দুজনই প্রেম-বর্ষণ অনুভব করছে। কারো মুখে কথা নেই। কিসের যেন এক তৃপ্তির ঢেকুর গিলে পরে জিহান বিদায় নিল।

ঢাকা ফিরে এলো জিহান। আজ কেন যেন তার মনটা তেমন ভালো নেই। বীণাকে ছেড়ে আসতে তার খুব কষ্ট হয়েছে। সেই থেকেই খানাপিনার প্রতি অনীহা, এক বেলা খেলে আরেক বেলা খায় না। কী এক চিন্তায় বিভোর সে। ঠিকমতো ঘুমায়ও না। না খেয়ে রাত জেগে রীতিমতো হেপাটাইটিস বি জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে সোজা কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। বীণা খবর পেয়ে চরম ছটফটানিতে ভুগছে। কিন্তু ঘর থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় নেই। স্কুল বন্ধ। কোচিং নেই, বের হওয়ার জন্য কোনো অজুহাত দাঁড় করাতে পারছে না সে। ঘরে বসেই সহমর্মিতা প্রকাশ করে যাচ্ছে। জিহানের লিভার ফাংশন এতোটাই নড়বড়ে হয়েছে যে, ডাক্তাররাও তার হাল ছেড়ে দেয়ার উপক্রম। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে সে। নরমাল ওয়ার্ড থেকে তাকে একটা লো-কেয়ার ওয়ার্ডে রাখা হলো। কিন্তু এজন্য তাকে প্রতিদিন ১০০ টাকা গুনতে হয়। যদিও এটা সরকারি, তবে এখানে একটু এক্সট্রা কেয়ার আছে, এই আর কী।

ডাক্তারদের নিরলস প্রচেষ্টা আর গুণগ্রাহীদের দোয়ায় জিহান কিছুটা সেরে উঠলো। ডাক্তাররা বললেন, 'এমন রোগী এই প্রথম বাঁচতে দেখলাম।'

এখন হাসপাতালের বেডেই তাকে শুয়ে থাকতে হয়। ডাক্তার তাকে তিন মাসের বেড-রেস্ট দিয়েছেন। ঢাকার বন্ধু জিহানের অবস্থা খারাপ শুনে দ্রুত কুমিল্লা চলে এলো। জরুরি ওয়ার্ডে নানান রকম রোগী। কেমন বিশ্রী গন্ধ, বমি আসার উপক্রম। শেষে বন্ধুকে খুঁজে পেয়ে দুজনই আনন্দে হেসে উঠলো। বন্ধু বললো, 'আপনি একটা সিরিয়াস লোক তো। এমন অবস্থায় আছেন, একটু খবর দেবেন না?'

'আল্লাহ্‌র রহমত আছে, নয়তো কবরের পাশে গিয়ে দোয়া করা ছাড়া কোনো উপায় থাকতো না।'

'ধ্যাৎ, কী যা-তা বলছেন? তো আপনার বীণা দেখতে আসে নি?'

'আসলে ও খুব সমস্যায় আছে। তবে আপুর মোবাইলে ফোন করেছিল। নাম্বার দেখে আপু সরাসরি আমাকে দিয়ে দেয়। বেডে শুয়েই আমি রিসিভ করি। ও তো চমকে ওঠে। তারপর অনেক কথা হয়েছে, ওর প্রায় কেঁদে দেবে অবস্থা। আসলে ওর ভালোবাসার মূল্য হয়তো আমি দিতে পারবো না।' বন্ধুকে কাছে পেয়ে ডাক্তারের কথা অমান্য করে উঠে বসে জম্পেস আড্ডা জুড়ে দিল। হাসপাতাল জীবনের পুরো ইতিহাস। মাত্র পনর-বিশ দিন হলো, এরই মধ্যে আরো অনেক কিছু ঘটে গেছে তার জীবনে। কথা যেন শেষ হতে চায় না। বন্ধু বললো, 'একটু দম নিয়ে নিন, তারপর বলুন।' বন্ধুর বাধা উপেক্ষা করে বলতে লাগলো, 'আমি আপনাকে ছাড়া কার কাছে বলবো—হয়েছে কী, আমাদের বাসার দশ-বারটি বাড়ি পরে, মানে রাস্তার মাথায় আমার এক কাজিন থাকে। কাজিন বলতে খুবই দূর সম্পর্কের। তাদের সাথে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই। ও এই মেডিকেলেই নার্সে পড়ছে। প্রায়ই ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ওকে ডিউটি করতে হয়। তো একদিন আমার ফাইল পত্রগুলো দেখে। আমাকে আগেও নাকি অনেকবার দেখেছে বলে জানালো। আমাদের পরিচয় হলো, এক পর্যায়ে ভালো জানাশোনা হয়ে গেলো। আমি বুঝতে পারলাম, ও আমার প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট হয়েছে। ঘুরে-ফিরে শুধু আমার দেখাশোনাই করতে লাগলো। মনে হলো, ওকে আমার পার্সোনাল নার্স হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। যদি অন্য কোনো ওয়ার্ডে ডিউটি পড়ে, অন্তত চার-পাঁচ বার এসে দেখে যাবে। মেয়েটার কথাগুলো কেমন যেন মায়া-মায়া লাগে। আসলে ওর সেবাতেই হয়তো আজ আমি এতোটা সুস্থ। সত্যি কথা কী, মেয়েদের সংস্পর্শে এক অন্যরকম অনুভূতি। দেখবেন, একটু পরই হয়তো ও আসবে। আজ ওর চাইল্ড-কেয়ারে ডিউটি পড়েছে। সকালে একবার এসেছিল।' বন্ধু জিহানের কথাগুলো গালে হাত দিয়ে শুধু শুনেই যাচ্ছে, আর মুচকি-মুচকি হাসছে। পরক্ষণেই সেই নার্স এসে হাজির। মুচকি হেসে বললো, 'মনে হচ্ছে আপনি পুরোপুরি সুস্থ।'

'কী করে বুঝলেন?'

বন্ধু নার্সের মুখের দিকে চেয়ে অবাক। জিহান শালা তো ঠিক জায়গায়ই চোখ রেখেছে। নার্সের পোশাকেই ওকে এতো আকর্ষণীয় লাগছে, আর যদি সেলিব্রেটি পোশাক পরে? বন্ধু বসে এমন কল্পনা করছে। মেয়েটি খেয়াল করলো, জিহানের সাথের

ছেলেটি তাকে কেমন যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। জিহানকে জিজ্ঞাসা করার আগেই জিহান পরিচয় করিয়ে দিল।

অন্য বেডের রোগীরা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছে। আসলে নার্সেরা এমন সদালাপীই হয়ে থাকে। তা না হলে এই পেশায় নিজেদের টিকিয়ে রাখতে পারবে না। জিহানের বন্ধুর সাথেও খুব আড্ডা জুড়ে দিয়েছে মেয়েটি। কথায় খুব পটু। বন্ধুটি তো নার্সের দিকে চেয়ে থেকেই সময় পার করে দিচ্ছে। স্লিম বডির মেয়েটি ফরসা সুন্দর না হলেও চোখ দুটো যেন রোবটের চোখ। ওর দুটো চোখই যেন যে-কোনো ছেলেকে ঘায়েল করে দিতে যথেষ্ট। ঠোঁটের মধ্যে তো আলাদা একটা পুরুষ ঘায়েল করার ভঙ্গিমা লেগেই আছে। মনে হচ্ছে নার্সের সমস্ত ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে জিহানকে সেবা করে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, এর মধ্যে কোনো কিছু পাওয়ার আশা নেই। তবুও যেন জেসমিন নামের এই দোয়েলীটি জিহানের কাছে কিছু চাইছে। কী চাইছে কেউ না বুঝলেও জিহান ঠিকই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। মেয়েদের ভাবসাব কোনো ছেলের বুঝতে দেরি হলেও জিহান চট করে বুঝে নিতে পারে। তাছাড়া এক্সপেরিয়েন্স তো কম হয় নি। কম-বেশি তিন-চারটি দোয়েলীর কিছুটা হলেও সান্নিধ্য পেয়েছে। ভেতরগত না হোক, বাহিরগত তো বটেই। যদিও সে এতো দোয়েলীর সাথে সাক্ষাৎ হোক, সম্পর্ক হোক, এটা চায় নি, কিন্তু পরিবেশ-পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে যেয়ে তাকে এগুলো এভাবে বরণ করতে হয়েছে।

নার্সের সাথে জিহানের কথা যেন শেষ হতে চায় না। বন্ধুটি জিহানের বেডে বসে বোকার মতো তাকিয়ে তাদের আলাপচারিতা শুনছে। এক পর্যায়ে নার্স চাইল্ড-ওয়ার্ডের অজুহাত দিয়ে বিদায় নিল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অবাক। কী আশ্চর্য, নার্স এখানে চল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়েছিল। এ যেন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। আসলে যুবা বয়সের তরুণ-তরুণীদের প্রেমালাপ হোক, বা প্রেম-পূর্ব আলাপই হোক, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেও মনে হয় এ যেন চোখের পলকেই ফুরিয়ে গেলো।

জিহান রোগমুক্ত হয়ে গায়ে বাতাস লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চাকরির কপালে তো ঝাঁটার বাড়ি। প্রথমবার চাকরি করতে গিয়েই লিভার ফাংশন অকেজো হতে চলেছিল। আবার চাকরি? বাপের হোটেলে ভূরি-ভোজন করতে পারলে সহসা কেউ কাজ করতে চায়? গায়ে বাতাস লাগিয়ে বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো তার নিত্য দিনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

সব দোয়েলীর কথা না ভাবলেও প্রথম ভালোলাগা লিলি নামের দোয়েলীকে তার প্রায়ই মনে পড়ে। এ ব্যাপারে বন্ধুর কাছে পত্র লিখে জানতে চায় সে কী করবে। বন্ধু বলে—'ও নিয়ে টেনশন করে কী হবে? তার চেয়ে বীণাকে আপন করে নেয়ার চেষ্টা করুন। মেয়েটা আপনাকে যথেষ্ট ভালোবাসে। অল্প বয়সের মেয়েরা যাকে একবার মন দেয় তাকে সহজে ভুলতে পারে না। কুড়ির ওপরে গেলে তো পেকে যায়। তখন ওড়াধুড়া চলাফেরা করে। ছেলেরা টিজ করবে কী, উলটা ছেলেদেরকে টিজ করে বোকা

বানিয়ে বসে থাকে। তবে সব মেয়ে নয়। আর নার্সের কী অবস্থা? নার্স যদি আপনাকে ওভাবে পেতে চায় তবে এগুতে পারেন।'

জিহান হাসপাতাল ত্যাগের পরপরই বীণার মা-বাবা বাসা বদলে ফেলেছে। মনে প্রচণ্ড দুঃখ পেলেও কিছুই করার নেই তার। এখন আর আগের মতো দেখা হয় না বীণার সাথে। বীণাও খুব চাপের মুখে আছে। মা'টা প্রচণ্ড রাগী। মাকে খুব ভয় পায় বীণা, তাই তার অবাধ্য হতে পারে না। পরীক্ষায় ডাব্বু মেরেছে, এটা একটা নেগেটিভ দিক। তবুও প্রচণ্ড ভালোবাসে জিহানকে। জিহানদের বাসায় বারবার ফোন করেও তাকে পায় না। এদিকে জিহান বীণার সংস্পর্শ না পেয়ে বার কয়েক নার্সের সাথে দেখা করেছে। বেচারি আছে খুব কষ্টে। দিনরাত রোগী নিয়ে পড়ে থাকতে হয়। পনর দিন পর দুই ঘণ্টার জন্য ছুটি পায়। এ সময়ের মধ্যে সে কার সাথে দেখা করবে ভেবে পায় না। তবে জিহান এলে তাকেই পুরোটা সময় বিলিয়ে দেয়। এ নিয়ে বান্ধবীদের বেশ কথাও শুনেছে জেসমীন। পনর দিন পর সাক্ষাৎ—এ-ও কি প্রেমিক-হৃদয় মানে? পায় না বীণার সাক্ষাৎ, পায় না নার্সের সাক্ষাৎ, জীবন যেন তার বিষিয়ে উঠছে। বাধ্য হয়ে গ্রামের মেঠো পথের দু ধারে সবুজ অরণ্যে গা ভাসিয়ে দিল জিহান। এখন আর শহরে যেতে ইচ্ছে করে না। বন্দি রাজকন্যা বীণার সাথে সম্পর্ক শীতল পর্যায়ে। অবশ্য এটা হয়েছে জিহানের করণেই। ও ইচ্ছে করলেই সম্পর্ক অটুট রাখতে পারতো। বেচারি বীণা কী কষ্টটাই না পাচ্ছে। তার দুঃখটা না বুঝলো মা-বাবা, না বুঝলো জিহান। এমন পরিস্থিতিতে অনেকেই প্রাণ বিসর্জন দিয়ে থাকে। কিন্তু বীণা কষ্ট পেলেও এটা সামলে নিয়েছে। জিহান বাড়ি গিয়ে নার্সের কলেজের ঠিকানায় দুটো পত্র লিখেছে। উত্তরও পেয়েছে। পত্রালাপেই তাদের মনের ভাব আদান-প্রদান হচ্ছে। কিছুদিন পর তাও বন্ধ।

সর্বশেষ ঘটনায় আশ্চর্য না হয়ে থাকা খুব কঠিন। টুম্পা নামের আরেক নতুন দোয়েলী খুঁজে পেয়েছে জিহান। এসএসসি পড়ুয়া টুম্পাকে জিহান আগের সব দোয়েলী থেকে অনেক বেশি আপন করে নিয়েছে। টুম্পারা নয় বোন। টুম্পা সবার ছোট, বাকি আট জনের বিয়ে হয়ে গেছে। সিরিয়ালটাও ঠিকমতো পেয়েছে, টুম্পাকে সে গভীরভাবে মনে পুষতে শুরু করেছে। এটাই হয়তো তার শেষ দোয়েলী।

এর আগে জিহানকে কোনো মেয়েই 'তুমি' বলে ডাকার সাহস পায় নি। অধিকার তো নয়ই। কথার ভাবসাব, ঢলাঢলির ভঙ্গিমা, জিহানের ঠোঁটে চুমু খাওয়ার দুঃসাহস অর্জন করে ফেলেছে এই টুম্পা নামের দোয়েলী। আর এজন্যই জিহান ওর প্রতি এতো দুর্বল। একদিন না দেখলেই যেন তার সময় কাটতে চায় না। টুম্পা তো একদিন বলেই ফেললো, 'তুমি তো আমাকে বিয়ে করবে না!'

'কে বললো তোমাকে?'

'কই, এতোদিন চলছে, এ ব্যাপারে কিছুই তো বলছো না।'

'আরে বোকা, এই বয়সের বিয়ে কেউ মেনে নেবে নাকি? তোমার তো এখনো আঠার বছরই পূর্ণ হয় নি।'

'তাই বলে কি আমি কিছুই বুঝি না? আমার চেয়ে কতো ছোট ছোট মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে, ওরা কিভাবে ট্যাক্‌ল্ দিচ্ছে?'

জিহান যেন তার কথার কাছে বধ হয়ে গেলো। মনে মনে বললো, শালী তো সিরিয়াস!

'বিড়বিড় করে কী বলছো?'

জিহান দাঁত কেলিয়ে বললো, 'তোমার-আমার বিয়ের কথা।'

'বিড়বিড় করে বলছো কেন, জোরে বলতে পারো না?'

'মাইক লাগিয়ে বলতে হবে নাকি?'

টুম্পা দেখলো জিহান কিছুটা চটে আছে। জিহানকে পেছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরে বাম কানের মধ্যে হালকা ভাবে কামড় দিয়ে বললো, 'তোমাকে একটু পরীক্ষা করলাম। আমি লেখাপড়া শেষ না করে বিয়ে করবো এটা তুমি ভাবলে কী করে?'

এ ধরনের আচরণে জিহান নিজেকে যেন কোথায় হারিয়ে ফেলে। কাম-নদীর মোহনায় হারিয়ে যেতে চায়। কিন্তু টুম্পা ওদিক থেকে খুব কঠোর।

লিলি নামের প্রথম দোয়েলী বাপের বাড়ি এসে জিহানকে খবর দিল যে, তাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। একটি বারের জন্য হলেও যেন লিলির সাথে দেখা করে যায়। জিহানেরও তাকে দেখার খুব ইচ্ছে। এরই মধ্যে লিলির কোল জুড়ে এসেছে সোনার টুকরো একটি মেয়ে। জিহান গিয়ে দেখে মেয়েকে কোলে নিয়ে আদর করছে লিলি। সামনে যেতেই একে অপরের দিকে শুধু চেয়েই রইলো। কারো মুখে কথা নেই, যেন দুজনই অপরাধী। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর লিলির দু চোখ ভরে গেলো শাওনের মেঘের জলে। দু পাশের কপোল বেয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রুকণা বেয়ে পড়লো। জিহানের চোখও ঝাপসা হয়ে এলো। জিহানের যেন চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। লিলির চোখে জল দেখে তার ভেতর কিসের যেন এক আগুন জ্বলে উঠলো। চোখের জল বের হওয়ার আগেই চোখ দুটো কচলিয়ে নিল জিহান, যেন পানি বের হতে না পারে। জিহানও যে লিলিকে প্রচণ্ড ভালোবাসে তা চোখের জল দিয়ে বোঝাতে চায় না। কিন্তু লিলি ঠিকই বুঝিয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে আরেকটি বিষয় উপলব্ধি করেছে জিহান। তার দোয়েলী স্বামীর ঘরে খুব একটা সুখে নেই। টাকা-পয়সা হলেই মানুষের জীবনে সুখ আসে না। জিহান নিঃশব্দে লিলির কোল থেকে অবুঝ শিশুটিকে নিজের কোলে তুলে নিল। লিলিও কোনো বাধা দিল না। কোলে নিয়েই নিজের সন্তানের মতো প্রচণ্ড রকম আদর করতে লাগলো তার দোয়েলীর মেয়েকে। বুকের মধ্যে চেপে ধরে খানিক সময় চোখ দুটো বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

লিলি এতোক্ষণে আঁচল দিয়ে চোখের পানি মুছে বললো, 'কেমন আছেন?'

জিহান চোখ খুলে লিলির দিকে তাকিয়ে বললো, 'বুঝতে পারছো না কেমন আছি?'

লিলির মুখে কোনো কথা নেই। জিহান বললো, 'তুমি ভালো না থাকলেও বলবে ভালো আছো। কেন বলবে আমি জানি। এই কচি মুখের দিকে তাকিয়ে।' দুজনই খানিক সময় চুপ। নীরবতা ভেঙ্গে জিহান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'পেছনের

দিকে তাকিয়ে আমাদের কী-ই বা করার আছে? বিধাতা হয়তো আমাদের মিলন চান নি। তবে তোমাকে আমার হৃদয়ে আজো অংকন করে রেখেছি।'

'এতোই যদি হবে তবে একবারও দেখতে যান নি কেন?'

'তাতে কোনো লাভ হতো? বরং ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল। তারপরও আমি গিয়েছিলাম। তোমাকে দেখেওছিলাম। তুমি তোমাদের পুকুরের উত্তর ঘাটে গোসল করছিলে।'

'বাড়ি গেলেন না কেন?'

'তা তো আগেই বলেছি।'

'হুঁম, আমার মনে পড়ছে, দক্ষিণ পাড়ে তালগাছের আড়ালে ঠিক আপনার মতো একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল, আমার সন্দেহ হয়েছিল। ভাবলাম, আপনি কি আর যাবেন নাকি? অন্যলোক ভেবে তাড়াতাড়ি ভেজা কাপড় নিয়েই আমি চলে গিয়েছিলাম।'

'সেটা আমিই ছিলাম।'

লিলি কান্না বিজরিত কণ্ঠে বললো, 'আর বলে কী হবে, আমার কপালে যা আছে তাই হয়েছে। দুঃখের ভাগ কি সহসা কেউ নিতে চায়?'

'প্লিজ দোয়েলী, ওভাবে বলো না। ঐ গবেটটার ঘরে তুমি সুখী হবে না, তোমার বিয়ের পরই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমার কিছুই করার ছিল না।' অম্ল-মধুর আলাপচারিতায় দুজন ঘণ্টা খানেক সময় কাটিয়ে দিল। ততোক্ষণ জিহান লিলির মেয়েকে নিজের কোলে জড়িয়ে রেখেছে।

জিহান বললো, 'ভাগ্য, সবই ভাগ্য, এটা তো আমার মেয়েও হতে পারতো, তাই না?'

লিলি মুচকি হেসে বললো, 'পৃথিবীতে সবার সব আশাই কি পূর্ণ হয়?' জিহান একটা শ্বাস ফেলে বললো, 'ঠিকই বলেছো।' এতোক্ষণে লিলির মেয়ে জিহানের কোলে হিসু করে দিয়েছে। লিলি বিব্রত বোধ করলেও জিহান কিছুই মনে করে নি। লিলি মেয়েকে কোলে নিতে নিতে বললো, 'ওহ্ বাবু, এ তুমি কী করেছো? ইশ, আপনার দামি শার্টটা...।' আর বলতে পারলো না। জিহান বললো, 'আমার মেয়ে যদি করতো?'

লিলি আগের সেই সুরে বললো, 'হিঃ, খালি আমার মেয়ে আমার মেয়ে—দেখবো না কতোটুকু সহ্য করেন। তা বিয়ে-থা করেন না কেন?'

'সবার কপালে কি বিয়ে থাকে?'

'প্লিজ, আপনি নিজেকে এমনি ভাবে কষ্ট দেবন না। তাহলে আমিও যে কষ্ট পাবো।'

জিহান মাথা নেড়ে বোঝায়—আমার দ্বারা ওসব হবে না। কিন্তু যে ইতিমধ্যে হালি পূর্ণ করে বসে আছে, সে কথা কি লিলি জানে! জানলেও এখন তার কিছু করার নেই। অনেকদিন পরে হলেও দুজনে একটু আনন্দে সময় কাটালো। জিহানের চেয়ে লিলিই বেশি সান্ত্বনা পেয়েছে। অনেকদিন পর জিহানের সাথে তার কথা হলো।

• • •

অব্যক্ত মনোবাসনা

ফারজানা রোজ

উৎসর্গ :

মা, ভাইয়া আর আপুকে

লেখিকা-পরিচিতি

জন্ম ১৪ জুলাই ১৯৮৫, ঢাকায়। ঢাকা সিটি কলেজে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছেন। লেখালেখি বলতে এই অণু-উপন্যাসটুকুই।

এক

গ্রামের কাঁচা রাস্তা ছেড়ে পাকা রাস্তায় উঠতেই বুকটা ধক করে উঠলো নকুলের। আপনি আপনিই নিজেকে একটু বেশি সতর্ক করে নিল। লুঙ্গির কাছাটা শক্ত করে ধরে পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে থাকলো। সামনেই কাজলীদের বাড়ি। প্রতিদিন এই সময় নকুল গঞ্জে যায়, পথের পাশে পড়ে প্রায় অর্ধশত বছরের পুরনো কাজলীদের বাড়ি। গ্রামে এটাই একমাত্র রাজবাড়ি। গ্রামের অহংকারও বটে। দূর-দূরান্ত থেকে বহু মানুষ আসে এই বাড়ি দেখতে। এই বাড়িটি সত্যিই অতুলনীয়। তবে এ বাড়িটি আরেকটি কারণে খুব বিখ্যাত, তা হলো কাজলী। এই বাড়ির ছোট মেয়ে, এতো বাঁদর আর দুষ্টু মেয়ে সারা গ্রামে দ্বিতীয়টি নেই। সারাদিন টই-টই করে ঘুরে বেড়ায়। মানুষের বাড়ির গাছ খালি করে, চারাগাছ-বন-বাদাড় মাড়িয়ে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মেরে-মুরে তবেই তার ক্ষান্তি। আরে না, আরো আছে। কাজলীদের বাড়ির সামনে দিয়ে যে-ই যায়, তাকে সে তার শয়তানির নতুন কারুকার্য না দেখিয়ে ছাড়ে না, আর এখানেই নকুলের ভয়টা বেশি। কী জানি আজকে মেয়েটা কী করে! আরেকবার নিজেকে একটু সতর্ক করে নিল। কাজলীদের বাড়ির খুব কাছে এসে পড়েছে। দক্ষিণের বারান্দায় চোখ রাখলো নকুল। গত কয়েকদিন ধরে কাজলী এখান থেকেই তার ওপর থুথু, কাগজ, ঢিল, ইত্যাদি ছুঁড়ে তার কৃতিত্ব বজায় রাখছে। তাই রাস্তা পরিবর্তনের চিন্তা করলো নকুল। কিন্তু না, চিন্তা শেষ করবার আগেই কোথা থেকে দুটো কাঁচা পেয়ারা নকুলের গায়ে এসে পড়লো। তীক্ষ্ণ সই। রাগে সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠলো নকুলের। কিন্তু কী আশ্চর্য, আশেপাশে কাউকেই দেখতে পেলো না। বেশ কয়েকবার এদিক-সেদিক তাকিয়ে সোজা হাঁটা ধরলো। কিন্তু এর প্রতিশোধ নেবার একটা পণ করলো নকুল। আজকে চাচিমাকে কাজলীর ব্যাপারটা বলতেই হবে।

বিকেলে গঞ্জ থেকে ফিরে নকুল সোজা এসে পড়লো কাজলীদের বাড়ি। ওদের খুবই বনেদি পরিবার। সবার মধ্যে মার্জিত ভাব। শিক্ষার পরিমাণও বেশি। এই বাড়িতে ঢুকলেই নকুলের কেন যেন মনটা ভালো হয়ে যায়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে বাড়ি। সবাই খুব অমায়িক। নকুলকে এ বাড়ির সবাই পছন্দ করে। কেননা ওর মতো শিক্ষিত, মেধাবী ছেলে গ্রামে আর একটাও নেই। ওর আচার-ব্যবহারও খুবই ভালো।

বাড়িতে ঢুকেই নকুল প্রথমে কাজলী কোথায় জিজ্ঞাসা করলো। কাজলী বাড়িতে নেই শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হলো। আস্তে আস্তে চাচির ঘরে গিয়ে ঢুকলো। নকুলকে দেখেই চাচির চোখে-মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়লো।

'আরে বাবা নকুল, কেমন আছো? আসো বসো। তুমি তো এদিকে আসোই না।'

মৃদু হেসে নকুল বললো, 'না চাচি, আসলে এতো ব্যস্ত থাকি! সেই সকালে বের হই আর বিকেলে ফিরি। একটুও সময় পাই না।'

'ও আচ্ছা। তা বাবা এতোদিন পর এলে—কোনো দরকারে, নাকি এমনিই চাচির সাথে দেখা করতে?'

'জি চাচি, আসলে দুটোই। আপনার সাথে দেখাও করতে এসেছি, আর একটা কথাও বলতে এসেছি।' কথাটা শেষ করার আগেই হরিমন বুয়া পায়েস আর শরবত নিয়ে ঢুকলো। কথাটার মাঝে ব্যাঘাত পড়াতে কিছুটা বিরক্ত বোধ করলো নকুল। চাচি বললেন, 'তা বাবা, কী যেন দরকারের কথা বলছিলে?'

'জি চাচি। ইয়ে...কাজলীর ব্যাপারে...'

'ও!' বলে তিনি দীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। 'জানো বাবা, শুধু তুমিই বাকি ছিলে। প্রতিদিন কাজলী সম্পর্কে এতো বিচার আসে যে কী বলবো—সবাই বিচার দিয়ে গেছে শুধু তুমি ছাড়া। আজ তুমি এসে সবটুকু পূরণ করলে।' শুনে কেমন যেন সংকোচ হতে লাগলো নকুলের। ইশ, কেন যে এসেছিলাম! চাচি মনে হয় রাগ করেছেন—মনে মনে ভাবলো নকুল।

'জানো বাবা, মেয়েটাকে নিয়ে আর পারি না। সেই সকালে বেরোয়, আসে দুপুরে। খেয়ে আবার বেরোয়, ফিরে সন্ধ্যায়। কতো ঘরে দরজা দিয়ে বন্দি করে রেখে, মেরে পর্যন্ত আমি শাসনের চেষ্টা করেছি। কিন্তু যেই সেই, দুইদিন ভালো থাকে, আবার আগের মতো শুরু করে। আমি কী করবো বাবা?' বলতে বলতে চাচির গলাটা ধরে আসে।

'হায় হায় চাচি, কাঁদছেন কেন? চাচি কোনো চিন্তা করবেন না। আমরা থাকতে আপনার কিসের চিন্তা?' কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করার পর স্থির হলেন চাচি। ধীরে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। আঁচলে চোখটা মুছে বলতে লাগলেন, 'বাবা, ভাবছি রূপালীর বিয়ে দিয়ে সাথে সাথেই কাজলীকেও বিয়ে দিয়ে দিব। দেখি বিয়ের পর মেয়েটা শান্ত হয় কিনা। না হলে আমার করার কিছুই নেই।'

রূপালীর বিয়ের কথা শুনে নকুল আরেকটু কিছু শোনার আগ্রহ বোধ করলো। কিন্তু চাচি আর কথা বাড়ালেন না। নকুলও লজ্জায় কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারলো না। আরো বেশ কিছুক্ষণ একথা-সেকথা বলে নকুল বিদায় নিল।

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় হঠাৎ করেই পূর্বের বারান্দায় চোখ পড়লো নকুলের। রূপালী কাপড় শুকাতে দিচ্ছে। সবেমাত্র স্নান করে এসেছে। সূর্যের উজ্জ্বল আলো তার শরীরে, তখনো চুল তার শুকায় নি; লেপ্টে রয়েছে সমস্ত পিঠ জুড়ে। তার উত্তোলিত দুটো বাহুতে যেন কোমলতার ছড়াছড়ি। ওর পাতলা কোমর আর উন্নত বুকে হালকা হলুদ শাড়িটি যেন একাকার হয়ে গেছে। কী এক মায়াবী আবেশ মেয়েটির সমস্ত দেহ জুড়ে। কী এক দুর্বার আকর্ষণ! আচমকা নকুলকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে রূপালী আঁতকে উঠলো। ওর হাতে আরো কিছু কাপড় ছিল, সেগুলো না মেলেই দৌড়ে অন্দরমহলে ঢুকে গেলো। নকুল এইমাত্র সম্বিত ফিরে পেলো। নিজের বোকামিতে লজ্জায় ওর কান গরম হয়ে গেলো। জিভে কামড় দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যেতে চাইলো।

রাস্তায় নেমেও প্রচণ্ড অনুশোচনায় ভুগতে লাগলো নকুল। ইশ, রূপালী কী ভেবেছে কে জানে? আর অমন ভাবে তাকিয়ে থাকারই বা কী দরকার ছিল? কেনই বা তাকাতে

যাবে সোমত্ত মেয়ের দিকে? ছিঃ! ধিক নিজেকে। এ রকম আনমনা ভাবে যখন নকুল হাঁটছিল, তখনই কোথা থেকে একটি মেয়েলী হাসির শব্দ এসে ওর কানে বাজে। চিনতে অসুবিধা হয় না এটা কাজলীর হাসি। এদিক-সেদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলো না নকুল। ওপরের দিকে তাকাতেই চমকে উঠলো। কাজলীদের বাড়িতে ঢুকতে রাস্তার ধারে সুবিশাল এক দেবদারু গাছ আছে, সেই গাছের মগডালে আসন গড়ে দিব্যি বসে হেসে কুটিকুটি হচ্ছে কাজলী, নকুলকে ভয় দেখানোই তার একমাত্র উদ্দেশ্য বুঝতে বাকি থাকে না। কিছুটা সময়ের জন্য নকুলের মনে হলো—এটা কি মানুষ, নাকি বাঁদর? কাল-বিলম্ব না করে নকুল সে স্থান থেকে প্রস্থান করলো। কারণ, ভর সকালে যে মেয়ে পেয়ারা ছুঁড়তে পারে, সারাদিন যে সে তার সংগ্রহে আরো অনেক কিছু রাখবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়?

দুই

সকাল থেকেই মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। চারদিকে পানি জমতে শুরু করেছে। এমন দিনে নকুলের ঘর থেকে বেরোতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে করে সারাটা দিন জানালার পাশে বসে বৃষ্টি দেখতে। চেয়ারটা টেনে, একটা পিঁড়ি পায়ের নিচে দিয়ে আরাম করে বসেছে নকুল। আকাশটা যেন আরো কালো হয়ে এসেছে। গ্রামের পথে এখন আর খুব একটা মানুষ দেখা যায় না। হঠাৎ করে ছাতা মাথায় হুজুর আলাউদ্দিনকে দেখা গেলো। খুব সাবধানে পা ফেলছেন তিনি। রাস্তা একদম পানি আর কাদায় ভরা। পড়লে আর রক্ষা নেই। নকুল যে জানালার পাশে বসে তাঁকে লক্ষ করছে তা তিনি খেয়াল করেন নি। চোখ পড়তেই—'কী নকুল, কী খবর?'

'এই তো ভালো। তো এমন দিনে কোথা থেকে আসছেন?'

'ঐ কাজলীদের বাড়িতে গেছিলাম।'

কাজলীদের বাড়ির কথা শুনে একটু নড়েচড়ে বসলো। 'কেন, কাজলীর আবার কী হলো? হুজুর, ঘরে এসে বসেন, একদম ভিজে গেছেন তো।'

'না বাবা। তুমি তো জানো কাজলী কেমন। সকালবেলা মার সাথে রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়েছে, এখনো আসে নি।'

'তাই নাকি! কী সাংঘাতিক! ওর মা কী বলেন?'

'আর বলো না। কাঁদতে কাঁদতে জীবন শেষ করে দিচ্ছেন। তা বাবা, বৃষ্টি হচ্ছে তো, পরে কথা হবে। এখন তবে যাই।' বলেই হুজুর হাঁটা দিলেন। তাঁর চলার পথে তাকিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হলো নকুলকে। সত্যিই তাই। আসলে আর যাই হোক, কাজলী হতে পারে দুষ্টু, চঞ্চল, কিন্তু মেয়েটার কিছু অমঙ্গল হয় এটা কেউই চায় না। সবাই ওপরে-ওপরে বকাবকি করলেও মনে মনে ঠিকই সবাই ওকে ভালোবাসে। হঠাৎ করে এমন একটা মেয়ের উধাও হয়ে যাওয়াটা নকুল মেনে নিতে পারে না। কিন্তু পরক্ষণেই ওর প্রচণ্ড হাসি পেলো। আরে, যে মেয়ে দেবদারু গাছের মগডালে বসে থাকে, এক ডুবে রামসাগরের মতো দিঘি পাড়ি দেয়, বড় বড় ছেলেমেয়েদের পিটিয়ে

লাশ করে, তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করাটা তো হাস্যকর ব্যাপার। সমস্ত চিন্তা ঝেড়ে ফেলে এবার কবিতা লেখাই ভালো। খাতা-কলম নিয়ে নকুল মোটে শুরু করেছে, অমনি ঠিক যেন মাথার ওপর আমগাছটা ভেঙ্গে পড়লো। উঠে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলো—সত্যিই, ইয়া বড় একটা ডাল ভেঙ্গে পড়েছে। থাক, পরে বৃষ্টি কমলে ঠিক করবো। ঘরে ঢুকে দরজার হুড়কো টেনে বাতি জ্বেলে চেয়ারটা টেনে আরেকটু জাঁকালো হয়ে বসলো। একটা ভালো থিম মাথায় এসেছে। কবিতাটা দারুণ হবে মনে হচ্ছে।

নকুলের কবিতা লেখা যখন শেষ হলো তখন প্রায় বিকেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিজেই অবাক—মাত্র তিনটা কবিতা লিখেছে, তাতেই দুপুর শেষ। নকুলের পিঠটা কেমন শিরশির করে ওঠে। তখনই কোত্থেকে এক বিদঘুটে হাঁচির শব্দ। নকুলের সর্বাঙ্গে যেন কাঁটা দিয়ে উঠলো। লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে দরজার কাছে চলে গেলো। ভয়ে ভয়ে খাটের নিচে তাকিয়ে দেখে কাজলী। দেখে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলো নকুল।

'এই কাজলী, তুমি এখানে খাটের নিচে কী করছো?' কাজলী খানিকটা অপ্রস্তুত হয়, কিন্তু দ্রুত সামলে নিয়ে ঝাঁঝালো স্বরে বলে, 'কেন, কী হইছে? আমি খাটের নিচে থাকলে আপনার কী হে! আমি কি আপনার কোনো ক্ষতি করছি?'

ততোক্ষণে নকুলের ঘাম ছুটে গেছে। কী আশ্চর্য, এই মেয়ে কখন ঢুকলো ঘরে? কেউ যদি দেখে ফেলে!

'কাজলী, বাড়িতে গিয়েছিলে?'

'না, মা বকে।' খাটের নিচ থেকেই জবাব দিল।

'কিন্তু তোমার মা তো শুনলাম খুব কান্নাকাটি করছেন।'

মুখে ভেংচি কেটে কাজলী বলে, 'কাঁদুক, বেশি করে কাঁদুক।'

'ছিঃ কাজলী, এমন করে বলে না। বের হয়ে এসো। গায়ে ময়লা লাগবে তো।' শুনে খাটের নিচ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হলো। একটা জীর্ণ মলিন শাড়ি পরনে। কেউ দেখলে কি বলবে যে, এ কোনো বনেদি ঘরের মেয়ে? দেখে এখন মনে হচ্ছে ও একটা পথের এতিম।

কাজলী একেবারে বাচ্চা একটা মেয়ে। আসলে বাচ্চাও নয়, বাচ্চাদের মতোন। ছোটবেলায় বাবা মারা যাওয়াতে সবার বেশ প্রশ্রয় পেয়েই মানুষ হয়েছে। এখন সে এতোই দুরন্ত হয়েছে যে, ঘর পালাতে শুরু করেছে।

'কী কাজলী, সারাদিন কোথায় ছিলে? কিছু খেয়েছো?' বেশ আদুরে গলায় জিজ্ঞাসা করে নকুল।

'না...কোথায় খাবো? সকালে ঘর থেকে বের হয়েই তো বাঁশঝাড়ে বসেছিলাম। তারপর ভাবলাম আপনার সাথে দেখা করি।'

'কেন? এতো মানুষ থাকতে আমার সাথে কেন দেখা করতে এসেছো?' কথাটা কাজলী শুনলো কি শুনলো না, উঠে জানালাটা খুলে দিল। আর বৃষ্টির ঝাপটায় ঘর ভিজে যেতে লাগলো। কাজলী হাতটা এবার মেলে ধরলো বৃষ্টিতে।

'আহা কাজলী, ভেতরে এসো। ঘর ভিজে যাচ্ছে তো।'

কিন্তু কাজলী কোনো পাত্তাই দিল না। নিজের কাজ করে যেতে লাগলো। বৃষ্টি আরো প্রবল বেগে ঘরে ঢুকতে লাগলো ।

'কী ব্যাপার কাজলী, বলছি না জানালা বন্ধ করো?'

'আহা, দেখেন না কী সুন্দর বৃষ্টি। আপনিও আসেন।' শুনে নকুলের খুব হাসি পেলো। মনে মনে বললো, 'বাচ্চা মেয়ে।' বারবার বলা সত্ত্বেও কাজলী যখন কথা শুনছিল না নকুল বাধ্য হয়ে কাজলীর ডান হাতের কনুই ধরে ভেতরে টেনে আনলো। ফলে কাজলী নকুলের একেবারে কাছে এসে পড়লো। এতোটা কাছে যে নকুলের তপ্ত ঘন নিঃশ্বাস যেন কাজলীর মুখ থেকে সর্ব-শরীরে ছুঁয়ে গেলো। সাথে সাথে শিউরে উঠলো কাজলী। এই প্রথম যেন ওর মনে হলো ও একটি মেয়ে।

তারপর কাজলী একদমই জালাতন করে নি। বৃষ্টি কমলে নীরবে নকুলের সাথে বাড়ি চলে যায়। কিন্তু নকুল লক্ষ করে নি—যে-কাজলী এসেছিল তার ঘরে, ফিরে যাচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন একজন, চলতে চলতে যার সর্বাঙ্গ এক সুখ-অসুখের মতো অজানা শিহরণে কেবলই কেঁপে কেঁপে উঠছিল!

তিন

আজ একটু তাড়াতাড়ি গঞ্জে যাবার জন্য বের হলো নকুল। কিন্তু দূরে ভোদাই, কাজলীদের বাড়ির চাকরকে আসতে দেখে আবার ঘরে ঢুকে পড়লো। মনে মনে বললো, 'এতো সকালে যেহেতু ভোদাইকে চাচি পাঠিয়েছেন নিশ্চয় কোনো জরুরি সংবাদ আছে।' আসলেও তাই। কী একটা কারণে গঞ্জ থেকে ফিরে অবশ্যই যেন চাচির সাথে দেখা করে সেজন্য চাচি ভোদাইকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন। সারাটা পথ নকুল ভাবতে ভাবতে গেলো, কিন্তু কোনো কূল-কিনারা পেলো না। রাজবাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময়ও, একবার ভাবলো জিজ্ঞাসা করে আসি। কিন্তু এতো তাড়া যে আর অবকাশ পেলো না।

গঞ্জ থেকে ফিরেই নকুল ঢুকলো কাজলীদের বাড়ি। বৈঠকখানাতেই পেয়ে গেলো চাচিকে। সালাম দিয়ে কুশল বিনিময় করে ডেকে আনার কারণ জিজ্ঞাসা করলো। চাচি নকুলের ডান হাতটা ধরলেন। সংগে সংগে চমকে উঠলো নকুল। সাধারণত চাচি খুবই ভালো মানুষ। খুবই আপন। সব সময় নকুল আর উনি সুখ-দুঃখ, সমস্যাবলি ভাগাভাগি করেন। কিন্তু কখনোই উনি হাত তো দূরে থাক, পাশেও বসেন না। তাই এই ঘটনায় নকুল কিছুটা বিব্রত। চাচি বেশ অনুনয়ের সাথে বললেন, 'বাবা, আমি জানি না তুমি কাজলীকে কী বলেছো। যেদিন তুমি কাজলীকে বাড়ি পৌঁছে দিলে সেদিন থেকেই সে একদম পালটে গেছে বাবা। আগের মতো আর নেই। সারাক্ষণ ঘরেই পড়ে থাকে। আর সবার সাথে খুব ভালো ব্যবহারও করছে।'

'কী বলেন চাচি, তাই নাকি!' বিস্ময়ে নকুলের চোখ দুটি এতো বড় হয়ে গেলো।

'শুধু কী তাই, কাল রাতে তো মেয়ে আমাকে আরেক কথা শুনিয়েছে। বাবা, তোমার বোন তো পড়াশোনা শুরু করতে চাচ্ছে।' বলতে বলতে খুশিতে চাচির পবিত্র মুখখানি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। দেখে কেমন যেন মায়া লাগে নকুলের।

'বাবা জানো, আমি তো অবাক। বললাম, কিরে হঠাৎ করে যে পড়া শুরু করবি, তোর জন্য কি মাস্টার রাখবো? তো শুনে মেয়ে তোমার কাছে পড়তে চাইলো।' বলেই চাচি দু হাতে নকুলের হাত চেপে একেবারে যেন ছোটটি হয়ে বললেন, 'বাবা, তুমি নিষেধ করো না, মেয়ে আমার এই প্রথম নিজের ভালোমন্দ বুঝতে শিখেছে। তুমি ওকে হতাশ করো না বাবা। তুমি আমার শেষ অনুরোধটা রাখো।' চাচির কথায় কী ছিল কে জানে, নকুল মুখের ওপর 'না' করতে পারলো না।

'চাচি, আমি তো সারাদিন গঞ্জে থাকি। আসতে আসতে সেই বিকেল। রাত ছাড়া আমার তো সময় নেই।'

'বাবা, ওটা তো কোনো সমস্যাই না। তুমি যখন সময় পাবে পড়াবে, তবে তোমাকেই বাবা পড়াতে হবে।'

'আচ্ছা।' বলে নকুল সেদিনের মতো উঠলো এবং কথা দিল পরের শুক্রবার থেকে পড়াবে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কেন যেন নকুল অনেক কথাই ভাবতে লাগলো। ফলে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ষোড়শী কিশোরীকে ওর চোখে পড়ে নি। পড়লে সেই চোখে সে অনেক কিছুই দেখতে পেতো।

চার

দেখতে দেখতে শুক্রবার এসে পড়লো। এ কয়েকটা দিন নকুল খুব দ্বিধা-দ্বন্দ্বে কাটিয়েছে। কেন, কী কারণে সেটা সে নিজেও জানে না। তবে খুব চিন্তায় ছিল। কারণটা কাজলী। কাজলীর হঠাৎ পরিবর্তন, ওর কাছে পড়তে চাওয়া এসব কিছু চাচি বা অন্যদের কাছে স্বাভাবিক লাগলেও নকুলের কাছে লাগছে না। নকুলের বারবারই মনে হচ্ছে—না জানি কী নতুন ফন্দি এঁটে বসে আছে মেয়েটা, আর ওকে কী ধরাটাই না খাওয়ায় কে জানে? তারপরও সব চিন্তা ঝেড়ে সন্ধ্যাবেলা গেলো কাজলীকে পড়াতে। পড়ার জায়গা ঠিক হলো কাজলীর ঘর। কারণ, এটা বাড়ির একেবারে পাশে। ফলে কেউ পড়ার ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে না।

কাজলীর ঘরে ঢুকেই নকুল একবার পুরো ঘরটা দেখে নিল। ঘরটা বেশ পরিপাটি করে সাজানো। ঘরের এক কোণে মনে হয় সদ্য গাছ থেকে তুলে আনা এক গোছা ফুল। তারই গন্ধে পুরো ঘরটা মৌ মৌ করছে। টেবিলের ওপর একটা বেশ বড় আলো জ্বলছে।

কিছুক্ষণ পর দরজা ঠেলে কাজলী ঘরে ঢুকলো। কাজলীকে দেখে নকুলের তো ভিড়মি খাবার যোগাড়। আরে, চাচি তো সত্যিই বলেছেন। কাজলীর একি পরিবর্তন! হলুদ পাড়ের মাড় দেয়া শাড়ি। এক প্যাঁচে পরা শাড়ি যা রীতিমতো অবাস্তবই লাগছে। কয়েকদিন ঘরের ভিতর থাকাতে হয়তো আগের থেকে বেশ পরিষ্কারই লাগছে। নকুলের অবাক চোখ দেখে কাজলীও বুঝলো ওর পরিবর্তনটা নকুলের নজর এড়ায় নি।

ধীরে ধীরে চেয়ারটা টেনে বসলো কাজলী। খুব আস্তে করে বললো, 'সালাম। স্যার ভালো আছেন?'

সম্বোধনটা নকুলের কাছে ভালোই লাগলো। আর মনে যে আশংকাটা ছিল, তা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগলো।

পড়ানোর পর বেশ রাত করেই নকুল বাড়ি ফিরলো। কোনো পড়া একবার কি দু বারের বেশি বলতে হয় না, এভাবে চললে মেয়ে যে অনেক বড় হবে সে আশা করাই যায়।

এরপর থেকে প্রতি সন্ধ্যায় নকুল কাজলীকে পড়াতে যায়।

পাঁচ

আজ একটা বিশেষ ঘটনা ঘটেছে। সন্ধ্যায় নকুল যখন পড়াতে গেছে, গিয়ে দেখে কাজলী ঘরে নেই, কী একটা কাজে পাশের বাড়ি গেছে। এখন তো ও আর ঘর থেকে বেরই হয় না, যার কারণে চাচিও নিষেধ করেন নি যেতে। তো, বসে থাকতে থাকতে নকুলের একটু ঝিমুনি ভাব এলো, উঠে বারান্দায় দাঁড়াতেই দেখলো রূপালী ওর কোমর সমান চুলগুলোকে বাতাসে উড়িয়ে প্রকৃতিকে উপভোগ করছে। এই বাড়িতে পড়াতে আসার পর এই প্রথম রূপালীকে দেখলো নকুল। মেয়েটা পরমা সুন্দরী। কী এক মায়ার জাল যেন ছড়িয়ে আছে। ওর শান্ত ব্যবহার ওকে আরো মাধুর্য দিয়েছে। রূপালী এদিকে তাকাতেই নকুল একটা মিষ্টি হাসি উপহার দিল, প্রত্যুত্তরে রূপালীও। এবার আর রূপালী পালিয়ে গেলো না, দাঁড়িয়ে থেকে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলো। হঠাৎ কাজলী প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকলো। 'স্যার, আপনি কখন এসেছেন? আমি খুব দুঃখিত। কী করবো, মালতী যে ছাড়তে চায় না।'

'না না, বেশিক্ষণ হয় নি। তুমি পড়তে বসো।'

'আচ্ছা।'

অনেকক্ষণ পড়ানোর পর হঠাৎ কাজলী বললো, 'স্যার, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।' নকুল কাজলীর অংকের খাতার দিকে তাকিয়ে বললো, 'বলো, কী বলবে।'

'না, আপনি আমার দিকে তাকান।'

নকুলের খুব অবাক লাগলো। তাকালো সরাসরি কাজলীর চোখের দিকে। দেখলো চোখ দুটি খুব অস্থির হয়ে তাকিয়ে আছে ওর চোখের দিকে। বিন্দুমাত্র সংকোচ নেই সেখানে। বরং বহু অব্যক্ত কথা যেন লুকিয়ে আছে। এক সময় নকুলই লজ্জায় চোখ নামিয়ে ফেললো।

'কী হলো কাজলী, এভাবে তাকিয়ে আছো কেন? কিছু বলবে?'

'জি। আমি আপনার জন্য একটা জিনিস এনেছি।' বলে খাটের নিচ থেকে একটা প্যাকেট বের করলো। প্যাকেট খুলে বের করলো একটা ফতুয়া।

'এটাতে আমি কাজ করেছি।' বেশ উচ্ছ্বাসের সাথে বললো কাজলী।

'তাই নাকি? দেখি তো।' দেখলো লাল-নীল সুতায় খুব সুন্দর কারুকার্য।

'দারুণ হয়েছে। তুমি কি চাচিকে বলেছো এটার কথা?'

'না বলি নি, আর আশা করি আপনিও বলবেন না।'

নকুল তাকালো কাজলীর দিকে। কাজলী এক দৃষ্টিতে আলোর দিকে তাকিয়ে আছে। দেখে মনে হয় হঠাৎ করেই খুব যেন বড় হয়ে গেছে সে। আগের মতো সেই অস্থির চোখ জোড়া আর নেই। সেখানে ঠাঁই নিয়েছে এক পরিপূর্ণ নারীর প্রতিচ্ছবি।

'দেখো, এভাবে চুপি চুপি কাউকে কিছু দেয়াটা ঠিক নয়। আর তুমি আমাকে একটা ফতুয়ার কাজ করে দিয়েছো, এ তো খরাপ কিছু নয়। বরং তুমি কাজ করতে পারো শুনলে চাচি খুশিই হবেন।'

'না, আপনি কাউকে বলবেন না। যদি বলেন আমি আপনার সাথে আর কোনোদিনই কথা বলবো না। আশা করি আর কোনো প্রশ্ন করবেন না।' বেশ আত্মবিশ্বাসের সুরে কথাগুলো বললো কাজলী।

এ কথা শোনার পর নকুলেরও আর কোনো প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করলো না। ব্যাগটা নিয়ে সোজা বাড়ি রওনা হলো। কাজলীর এই পরিবর্তন ঠিক ভালো লাগছে না। কেমন যেন দুরন্ত, সাহসী। মনে হয় না ও কোনো কিছুকে পরোয়া করো। কে জানে ভাগ্যে কী আছে। এই মেয়েকে ওপর থেকে দেখলে যতোটা পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয়, নকুলের মনে হলো, ওর ভিতরে আসলে আরো বেশি পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তনটা কতোটা ভালো হবে ওদের জন্য সেটাই চিন্তার বিষয়। ভীষণ ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। সেই সাথে মাটির গন্ধ। বোঝাই যাচ্ছে একটা বেশ বৃষ্টি হবে। কিন্তু সেদিকে ফিরে নকুলের মনে হলো এই বৃষ্টির মতো যদি ও ঝরে যেতে পারতো, পারতো যদি মেঘ হতে কিংবা আকাশের মতো বিশাল হতে, তবে কতোই না ভালো হতো। আরো কী যেন হতে ইচ্ছে করছে নকুলের। কিন্তু কী হতে ইচ্ছে করছে, সেটা সে নিজেই জানে না। হয়তো কাজলীর পরিবর্তন ওর মধ্যেও কোনো পরিবর্তন এনেছে। এরপর খুব জোরে-শোরেই বৃষ্টি শুরু হলো। নকুল দ্রুত হাঁটতে লাগলো বাড়ির দিকে।

ছয়

নকুল আজ বেশ দ্বিধায় আছে কাজলীকে পড়াতে যাবে কিনা তা নিয়ে। কারণ, গত তিন দিনের জ্বরে একেবারে কাবু হয়ে গেছে সে। সেই যে কাজলীকে পড়িয়ে বাড়ি ফিরে আসার পথে বৃষ্টিতে ভিজলো, তার সাথে সাথেই জ্বর। আজ মোটে জ্বর ছাড়ছে। শরীরটা ভীষণ দুর্বল, তার ওপর মুখে রুচি নেই, যার কারণে মুখে কিছুই দিতে পারছে না। তারপরও অনেক ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিল পড়াতে যাবে। অন্ততপক্ষে দেখা করে বলে আসা উচিত। এক নাগাড়ে চারদিন শুয়ে থাকতে নকুলেরও ভালো লাগছে না। উঠে দাঁড়াতেই মাথায় চক্কর খেলো। ধপ্ করে বসে পড়লো। কিছুক্ষণ পর উঠে গায়ে একটা চাঁদর জড়িয়ে হাঁটার পথ ধরলো।

ঘরে ঢুকতেই কাজলীর সাথে দেখা। ঘর পরিষ্কার করছিল। নকুলকে দেখে সালাম দিল। কিন্তু চোখে-মুখে আগের সেই উচ্ছ্বসিত ভাবটা নেই। সেখানে যেন জমে আছে রাগের পাহাড়। আর কোনো কথা না বলে চলে গেলো নিজের পড়ার ঘরে। তখনই চাচি এসে হাজির। বললেন, 'কী বাবা! তুমি এতোদিন পরে যে? কোথাও গিয়েছিলে?'

'না চাচি। শরীর ভীষণ অসুস্থ।' খুবই দুর্বল গলায় বললো।

'ও। তাহলে কাউকে দিয়ে খবর দিলে না কেন? ওষুধপত্র খাচ্ছো?'

'জি চাচি, খাচ্ছি।' নকুল খুবই অসুস্থবোধ করছিল। কথা কেমন যেন আটকে আসছে। তারপরও উঠে চাচিকে সালাম দিয়ে কাজলীর ঘরের দিকে চললো।

ঘরে ঢুকে চেয়ারে কাজলীকে দেখলো না। ও জানালার কার্নিশ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। নকুল বললো, বেশ দুর্বল ভাবে, 'কাজলী পড়তে এসো।' গ্রিল ছেড়ে এসে বসলো চেয়ারে। তারপর খাতা টানতে টানতে বললো, 'আপনি এতো ভিতু কেন?'

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলো নকুল। 'কী, আমি ভিতু?'

'হ্যাঁ, ভীরু, ভীষণ ভীরু। ভিতুর ডিম।'

'ছিঃ ছিঃ কাজলী, এসব কী বলছো? আমি কী করেছি? তুমি আমায় ভিতু বলছো কেন?'

'বলবো না? ঐদিন আমি কিনা কী বলেছি, আপনি...' বলতেই গলাটা যেন বুজে আসতে চাইলো কাজলীর...'আপনি বাড়িতে আসাই বন্ধ করে দিলেন। আমি আপনাকে কী এমন বলেছি যে আপনি ভয় পেলেন?'

রাগের কারণটা বুঝতে পারলো নকুল। মুচকি হেসে বললো, 'ও, এই কথা? তুমি জানো না, আমার খুব অসুখ?'

একথা শুনে একেবারে আঁতকে উঠলো কাজলী, 'কী? কী হয়েছে আপনার?'

'না না, তেমন কিছু না। এই সামান্য জ্বর আর কী।'

'আমার কথা শুনে আপনি জ্বরই বাঁধিয়ে ফেলেছেন? আশ্চর্য তো।'

'আহা! কী অবাক কাণ্ড! তোমার কথা শুনে জ্বর আসবে কেন? এমনিতেই জ্বর এসেছে। বৃষ্টিতে ভিজেছিলাম তো, তাই।' খুব জোরে কাজলী হেসে উঠলো। 'আমি তো দুষ্টামি করেছি।' নকুলও হেসে ফেললো, 'ও আচ্ছা?' আর কথা না বাড়িয়ে ওরা পড়তে শুরু করলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই গা কাঁপিয়ে আবার জ্বর আসতে লাগলো নকুলের। মনে হচ্ছে পৃথিবীটা বুঝি এখনই ঘুরতে শুরু করবে। বমি বমি ভাব হতে লাগলো। তখনই কাজলী জিজ্ঞাসা করলো, 'স্যার, আপনার কি খারাপ লাগছে?' মিথ্যার আশ্রয় নিল না নকুল। বললো, 'হ্যাঁ। কাজলী, মনে হয় আবার জ্বর আসবে। আমি আজকে চলে যাই।' শুনে কাজলীর মনটা বিষণ্ন হয়ে গেলো। কিন্তু কিছুই বললো না, শুধু কবিকে বাঁকা করে সায় জানালো। উঠবে বললেও নকুল উঠতে পারলো না, অসম্ভব শীত লাগছে। মনে হচ্ছে দাঁড়ালেই ধপাস করে পড়ে যাবে। অবস্থা বেগতিক দেখে কাজলী ভিতরে গেলো মাকে ডাকতে।

মায়ের ঘরে ঢুকে দেখে মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁকে আর জাগাতে ইচ্ছে করলো না। আলমারির মধ্যে দাওয়াই ছিল, তা নিয়েই আস্তে করে বের হয়ে এলো। নিজের ঘরে এসে দেখলো নকুল তখনো বসে আছে। চোখ দুটো বন্ধ। দেখে ভীষণ মায়া লাগে

কাজলীর। আস্তে করে কাছে এসে দাঁড়ায়। খুব কাছে। কাজলীর ইচ্ছে করে নকুলকে একটু ছুঁয়ে দেখতে। কিন্তু সাহসে কুলায় না। ধীরে ধীরে ডাকে, 'স্যার।' নকুল চোখ মেলে তাকায়, চোখ দুটো ভীষণ লাল। কাজলী আবার বলে, 'স্যার, ওষুধটা খেয়ে নিন।' নকুল বললো, 'আহা, কী দরকার ছিল কাজলী? আমি এখনই চলে যাবো, ওষুধের দরকার নেই।' বলেই যখন উঠতে যাবে, কাজলী হাতটা বাড়িয়ে বাধা দিল। কপট রাগ দেখিয়ে বললো, 'উঁহু! তা তো হচ্ছে না। আপনাকে ওষুধ না খাইয়ে ছাড়ছি না।' অবশেষে বাধ্য হয়ে ওষুধ খেলো। চলে যাবার সময় হঠাৎ কাজলী বললো, 'স্যার শোনেন।'

'কী, কাজলী?' দরজায় দাঁড়িয়ে তখন নকুল।

'আমি কি একটা কথা বলতে পারি?' খুব সংকোচের সাথে বললো কাজলী।

'বলো, কী বলবে।'

'আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমি কি আপনার জ্বরটা একটু দেখতে পারি?' শুনে নকুল ভীষণ সংকোচ বোধ করতে লাগলো। কিন্তু কিভাবে নিষেধ করবে? নিষেধ করলে মেয়েটি লজ্জা পাবে ভেবে আর না করতে পারলো না।

'আচ্ছা ঠিক আছে, দেখো।'

কাজলী ধীরে ধীরে নকুলের কাছে এসে দাঁড়ালো। নকুলের হার্টবিট ধপ্ ধপ্ করে লাফাতে লাগলো। কাজলী ওর ডান হাতটা আলতো করে নকুলের বাম গালে রাখলো। কী ঠাণ্ডা! কী কোমল! নারীর হাত এতো কোমল হতে পারে! ধীরে ধীরে নকুলের সর্বাঙ্গে কেমন এটা সুখ ছুঁয়ে যেতে লাগলো। এর আগে কখনো ও নারী-স্পর্শ পায় নি। এই প্রথম স্পর্শ, মনে হচ্ছে যতোক্ষণ খুশি ছুঁয়ে থাকুক কাজলী। আমি কিচ্ছু বলবো না। হঠাৎ কার যেন পায়ের আওয়াজে নকুলের ধ্যানভঙ্গ হয়। হাতটা আলগোছে সরিয়ে দিয়ে ঘর থেকে দ্রুত বের হয়ে যায়। বের হয়েই কী কারণে যেন বারান্দায় তাকালো। দেখলো পূবের বারান্দায় আলো হাতে রূপালী। ওকে এখন ঠিক যেন দেবীর মতো লাগছে। অন্ধকারের মাঝে কাকে আলো দেখাতে দাঁড়িয়ে আছে সে? কেন এতো আকুলতা, কিসের চাওয়া-পাওয়া ওর চোখে-মুখে? নাহ্, এভাবে আর নয়। আর প্রশ্রয় নয়। সোজা বাড়ির পথে হাঁটা ধরলো নকুল।

সাত

ঘরের চাল ফুটো হয়ে গেছে। বৃষ্টি হলেই বিছানা-পত্র পানিতে ভরে যায়। তাই নকুল আজ বেশ সকাল সকাল উঠেই পুডিং হাতে চালে উঠে গেলো। ফুটো শুধু একটা-দুটো না, অনেকগুলো। আর ঘরটা বেশ নড়বড়ে হয়ে উঠেছে। ভাবছে, আজকালই মিস্ত্রি ডেকে ঠিক করাতে হবে। চালে উঠে ভালোই লাগছে নকুলের। বাতাস বেশ ফুরফুরে। আকাশও পরিষ্কার। তাই কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও বসে রইলো। খুব সুখ-সুখ অনুভূতি হচ্ছে।

'ও বাবু, ওপরে বসে কী ভাবছো? নিচে নেমে এসো, কথা আছে।' তাকিয়ে দেখে কাজলীদের বাড়ির মালি।

'কিরে, এতো সকালে যে?'

'জি বাবু। বেগম সাহেবা ঘরে বসে আছেন, আপনার সাথে কথা বলতে চাইছেন।'

শুনে নকুল আশ্চর্য হলো। 'বেগম সাহেবা, মানে চাচি, চাচি এসেছেন? কখন এসেছেন? আশ্চর্য, আমাকে বলিস নি কেন? কী অদ্ভুত, চাচি বসে আছেন, আর আমাকে বলিস নি কেন?' বলতে বলতে তাড়াহুড়ো করে চাল থেকে নেমে ঘরে ঢুকলো। সালাম দিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসলো। তারপর অত্যন্ত আদবের সাথে বললো, 'চাচি, এতো সকালে কষ্ট করে এলেন যে? আমাকে বললেই তো আপনার কাছে যাই।' চাচি ঘোমটা আরেকটু সরালেন। ঘরের চারপাশটা একবার দেখে নিলেন। তবে কিছুই দেখতে পেলেন না, টেবিল আর আলনা ছাড়া। তারপর সরাসরি প্রসঙ্গে এলেন, 'বাবা, তুমি এক সপ্তাহ ধরে কাজলীকে পড়াতে আসো না। কেন? কাজলী তোমার কথা বলতে বলতে আমার কান ঝালাপালা করে ফেলছে। তোমার জ্বর কি এখনো ভালো হয় নি?'

প্রশ্ন শুনে প্রথমত নকুল কিছুই বলতে পারলো না। বলতে পারলো না কাজলীর মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস সে হারিয়ে ফেলেছে। হারিয়ে ফেলেছে আত্মবিশ্বাস। গত সাতটা দিন কী অশান্ত অস্থিরতায় কেটেছে। কেমন করে বলবে চাচিকে, যে ছোঁয়া কাজলী তাকে দিয়েছে তা তার গাল ছুঁয়ে হৃদয়ও স্পর্শ করেছে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে নকুল বেশ বিনীত ভাবে বললো, 'চাচি, আমার আসলে মনটা বিশেষ ভালো নেই, আর দু তিনটা দিন পর পড়াতে আসি?' শুনে চাচি ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'কেন বাবা, কী হয়েছে বলো? আমাকে বলো, আমি তো তোমার মায়ের মতো, বলো বাবা, কোনো দুশ্চিন্তা বা কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে বলতে পারো।' শুনে নকুলের চোখ দিয়ে পানি চলে এলো। পৃথিবীতে এই একটা মানুষই আছেন যিনি ওর সাথে এতো আবেগ দিয়ে কথা বলেন।

'না চাচি, আমার তেমন কিছুই হয় নি, শুধু কেন যেন ভালো লাগছে না।'

'এক কাজ করো বাবা, পড়াতে চলে এসো, দেখবে মনটা আপনা আপনি ভালো হয়ে গেছে। তাহলে কি আজ সন্ধ্যা থেকেই আসছো?' ঘুরে ফিরে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। নকুলও ভাবলো, ঠিকই তো, পড়াতে তো যেতেই হবে, তাহলে আজ নয় কেন? আর এসব ঘটনা নিয়ে বাড়াবাড়ি না করাই ভালো।

'ঠিক আছে চাচি, আমি তাহলে আজ বিকেলেই আসি।'

শুনে চাচি অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, 'তাহলে তো বাবা খুবই ভালো হয়। কাজলী খুব খুশি হবে। তুমি তো জানো না বাবা, তুমি যে কাজলীর কী খারাপ বদ্-অভ্যাস করেছো, এখন ওর নাকি সন্ধ্যাবেলা তোমার কাছে না পড়লে ভালোই লাগে না। আর মেয়ে আমার পড়াশোনা করতে খুব পছন্দ করছে।' বলে চাচি হাসতে থাকলেন। সেই হাসিতে নকুলের কেন যেন ভীষণ ভালো লাগলো। মনে হলো সে অজান্তে হয়তো খুব ভালো একটা কাজ করে ফেলেছে। একজন মায়ের মনে মনের ভুলেই হয়তো শান্তির পরশ বুলিয়ে দিয়েছে।

সন্ধ্যা হতেই সেই সন্ধ্যার ঘটনা নকুলকে পেয়ে বসতে লাগলো, যে কারণে গত সাতটা দিন সে কাজলীর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে নি। নকুল নিজেকে প্রবোধ দিল এ বলে, 'না, এটা খারাপ কিছু না। ছাত্রী তার শিক্ষকের শরীরের জ্বর দেখেছে, এটা কোনো ব্যাপার না। এ রকম হতেই পারে। এটা স্বাভাবিক ঘটনা। আর ও তো একটা পুঁচকে মেয়ে।' ভাবছে ঠিকই, কিন্তু বারবার সেই স্পর্শের কথা মনে হতেই গায়ে কেমন সুখের কাঁটা দিতে লাগলো। কাজলীর সেই নিবিড় চোখ মনে ভেসে উঠতে থাকলো। অনেক ভেবে-চিন্তে অবশেষে নকুল নিজেকে শান্ত করলো।

নকুল কাজলীর ঘরে ঢুকে দেখলো সে কুপি জ্বেলে পড়ছে। বেশ কিছুক্ষণ হয়েছে বিদুৎ চলে গেছে। নকুলকে দেখে কাজলী উঠে দাঁড়ালো। অত্যন্ত খুশি দেখাচ্ছে তাকে। নকুল আজ কাজলীর চেয়ারে বসলো। কারণ, পাশেই জানালা। ঠাণ্ডা বাতাস আসে। এতোদিন পর আসাতেও কাজলী তেমন কিছু জিজ্ঞাসা করলো না। শুধু বললো, 'ভালো আছেন?' নকুলও ছোট করে জবাব দিল। এখন নিজেকে আর জড়তাগ্রস্ত মনে হচ্ছে না নকুলের। এজন্য অবশ্য সে মনে মনে কাজলীকেই ধন্যবাদ দিল। তার নিজের ওপরই রাগ হলো। খামোখাই সে চিন্তা করেছে। বেশ উৎফুল্লভাবেই আজকে কাজলীকে পড়ালো। কে জানে, এ কয়েকটা দিন হয়তো সে অযথাই বিবেকের দংশনে ভুগছিল।

কিছুক্ষণ পর দরজা ঠেলে একটা ট্রে হাতে রূপালী ঘরে ঢুকলো। এই প্রথম এভাবে রূপালী সামনে এলো। ট্রে-টা টেবিলে রেখেই যখন চলে যাবে একবারের জন্য নকুল আর রূপালী দৃষ্টি এবং এক চিলতে হাসি বিনিময় করলো, যা কাজলীর চোখ এড়িয়ে গেলো।

আট

কাজলীর যে কী হয়েছে, তা সে নিজেও বুঝতে পারে না। সারাক্ষণ শুধু নকুল ভাইয়ের কথা মনে পড়ে। যেখানে যায়, যা কিছু করে, মনে হয় নকুল ভাই থাকলে খুব ভালো হতো। অথচ এমন অনুভূতি ওর আগে কখনো হতো না। ছোটবেলা থেকেই সে নকুল ভাইকে দেখে আসছে, বলতে গেলে তার চোখের সামনে দিয়েই সে বড় হয়েছে। কতো শয়তানি, বাঁদরামি করেছে। অথচ এখন তাকে না দেখলে বুকের ভেতরটা কেমন হু হু করে। ইচ্ছে করে সারাটা ক্ষণ তার কথা ভাবতে। কেন যে এমন হয় বোঝে না কাজলী। শুধু বুঝতে পারে, ঐ মানুষটাকে ছাড়া ওর আর এক মুহূর্ত চলবে না। কিন্তু মনের কথা মনেই রয়ে যায়, আর বলা হয় না। মাঝে মাঝে ভাবে, আজ নকুল ভাই এলেই বলবে যতো কথা আছে। কিন্তু যেইমাত্র সে আসে অমনি সব এলোমেলো হয়ে যায়। লজ্জায়, সংকোচে আড়ষ্ট হয়ে যায়। তারপরও কাজলী অনেক সাহসী। এ কারণেই ও মাঝে মাঝে এটা-সেটা উপহার দেয়, চোখের ইশারায় কথা বলে, মাঝে মাঝে আলতো ছোঁয়া দিয়ে নকুলকে এলোমেলো করে দিতে চায়। কিন্তু মনে হয় না নকুল ভাইয়ের কোনো অনুভূতি আছে। ভাবতে একটু রাগ হয় কাজলীর। মানুষটা যেন

কেমন। ঠিক বুঝতে পারে না সে। কোনো কোনোদিন কাজলীর মনে হয় আজ বুঝি নকুল ভাই সব বুঝে ফেলেছে, কিন্তু পরের দিন তার কোনো অনুভূতিই নেই। মনে হয় কিছুই হয় নি গতকাল। আর নকুল ভাইয়ের একটা দিক ভীষণ খারাপ, তা হচ্ছে সে সব সময় কাজলীর সাথে এমন ব্যবহার করে যেন কাজলী এখনো ছোট্ট একটা মেয়ে, কিচ্ছু বোঝে না। মাঝে মাঝে এরূপ ব্যবহার কাজলীর ভালোও লাগে। তবে সব সময় না। কারণ, আর যাই হোক, কেউ ছোট মেয়ের সাথে প্রেম করতে চায় না। 'প্রেম' কথাটা ভাবতেই কাজলীর ঠোঁটে লাজুক হাসি ফুটে উঠলো—তবে কি ওর প্রেম হয়েছে নকুল ভাইয়ের সাথে? কাজলী হাত দুটো মেলে ধরে শূন্যে। দক্ষিণা বাতাসে উড়িয়ে দেয় শাড়ির আঁচল। চোখ দুটো বন্ধ করে জোরে নিঃশ্বাস নেয়। বুকটা বাতাসে ভরে যায়। চিৎকার করে গাইতে ইচ্ছে করে, আর বলতে ইচ্ছে করে—'নকুল...।' চোখ মেলে তাকায়, যেখানে নকুল ভাই বসে, আস্তে করে বসার চেয়ারের নিচে বসে পড়ে। চোখ বন্ধ করে হাত রাখে। মনে মনে প্রিয়-স্পর্শ নিতে চায়। মনে হয় তার উত্তাপ যেন এখনো চেয়ারে লেগে আছে। মুখটা নামিয়ে আলতো ভাবে আদর করে। কিন্তু পরক্ষণেই চোখ মেলে লজ্জা পেয়ে যায়। একি করছে ও! ছিঃ, লজ্জায় আঁচলে মুখ ঢাকে। মনে হয় নকুল ভাই যেন সামনে বসে আছে। ও যে আদর করছে, দেখে মিষ্টি মিটিমিটি হাসছে।

বিশাল এক বাগান ধরে হাঁটছে কাজলী। পরনে সাদা ধবধবে শাড়ি। চারদিক নিস্তব্ধ। একটা ছোট কুঁড়েঘর। কুঁড়েঘরে প্রবেশ করতেই আলোয় ভরে গেলো সারা ঘর। তার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে নকুল। মাথায় পাগড়ি, পরনে রুপালি পোশাক, যেন এক রাজকুমার। কাজলীকে দেখতেই এক ভুবন-ভোলানো হাসি উপহার দিল। তারপর রাজকুমার এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলো ওকে বুকের ভেতর। টেনে আরো গভীরে জড়ালো। সুখে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইলো কাজলীর। তারপর রাজকুমার একটা সাদা ঘোড়ায় কোথায় যেন ছুটে চললো। তখনই ঘুম ভেঙ্গে যায় কাজলীর। দেখে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে। একটু আড়মোড়া দিয়ে আবার পাশ ফিরে শোয় আরেকটু সুখ-স্বপ্নের জন্য।

আজ একটু দেরি করেই নকুল পড়াতে এলো। কাজলী এতোক্ষণ অপেক্ষা করছিল। নকুলকে আসতে দেখে নিজের চেয়ারে যেয়ে বসলো। ঢুকেই নকুল অপরাধীর মতো বললো, 'কী, বেশি দেরি করে ফেললাম? আসলে নতুন একটা কাজে বাইরে গিয়েছিলাম।' শুনে কাজলী হেসে ফেললো, 'না না, ঠিক আছে, বেশি দেরি হয় নি।'

'আচ্ছা কাজলী শোনো, এখন থেকে আমার হয়তো আসতে মাঝে মাঝে দেরি হতে পারে। দেরি দেখলে ভেবো না যে আমি আসবো না।' হাসতে হাসতে বললো নকুল।

'কেন? দেরি হবে কেন?' প্রায় অবুঝের মতো কাজলী কথাটা বললো।

'না, আসলে আমি আমার দোকানটা বড় করছি, আর একটা নতুন দোকান ভাড়া নিচ্ছি তো, তাই দৌড়াদৌড়ি করতে হবে।'

'ও তাই? এজন্যই মনে হয় আপনাকে আজ খুব খুশি খুশি লাগছে।' নকুল কথার কোনো উত্তর দিল না, শুধু মুচকি হাসলো।

এরপর প্রায়ই নকুল বেশ রাত করে পড়াতে আসতো। কিন্তু বেশি সময় দিতে পারতো না, ক্লান্ত হয়ে ফিরে যেতো। আর দিয়ে যেতো কাজলীকে একরাশ দুঃখের ডালা। আসলে নকুলের যে ব্যস্ততা এটা খুবই আশাব্যঞ্জক। ওর সততা, বিশ্বস্ততার জন্যই দ্রুত সুনাম ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। অল্প দিনেই সৎ ব্যবসায়ী হিসেবে সে বেশ নাম কামিয়ে ফেলেছে। ও যে উন্নতি করবে এটা সবারই জানা। নকুল অত্যন্ত পরিশ্রমী ছেলে। কোনো ব্যাপারেই, সেটা যতোই ছোট হোক, ওর অযত্ন আর উদাসীনতা নেই। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, আনুগত্য ওকে দ্রুত উন্নতির দিকে ধাবিত করছে। এ অবস্থায় সারাদিন পরিশ্রম করে রাতে পড়াতে আসাটা একটা যুদ্ধ মনে হয় নকুলের। তারপরও চাচির জন্য কাজলীকে পড়ানোর ব্যাপারে 'না' বলতে পারে না। অবশেষে নকুল যখন দেখলো ব্যস্ততা অত্যন্ত বেশি পরিমাণেই বেড়ে গেছে, তখন একদিন এলো চাচির কাছে। চাচি কাজলীর সাথে গল্প করছিলেন। এক সাথে দুজনকে পেয়ে নকুল ভাবলো—ভালোই হয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ একথা-সেকথা বলার পর বললো, 'চাচি, আমি মনে হয় আর কাজলীকে পড়াতে আসতে পারবো না।'

'কেন? কেন স্যার? পড়াতে আসতে পারবেন না কেন?' কাজলী এতো জোরে বলে উঠলো যে মায়ের দিকে একবার তাকিয়ে লজ্জায় মাথা নামিয়ে ফেললো। নকুলও চাচির সামনে অপ্রস্তুত হয়ে গেলো। আমতা আমতা করে বললো, 'না মানে, আমার এতো কাজ করতে হয় যে সন্ধ্যার পর পড়াতে আসাটা খুব কষ্টকর ব্যাপার। তো চাচি কী বলেন?' চাচির মতামতের জন্য নকুল তাঁর মুখের দিকে তাকালো। কিন্তু তাঁকে খুব একটা চিন্তিত মনে হলো না। বললেন, 'এটা তোমাদের ছাত্রী এবং শিক্ষকের ব্যপার। তোমরাই ঠিক করো কী করবে। আমি আর কী বলবো?' নকুল কাজলীর দিকে তাকালো, দেখলো কাজলী মাথা নিচু করে যে বসেছে আর কোনো কথা নেই। আসলে কী বলবে ও, নকুল ভাই আর আসবে না, এটা ভাবতেই ওর বুক ফেটে যাচ্ছে। ওর তো এখনো অনেক কথা বলার বাকি। কিছুই তো হয় নি বলা। নকুল আবার বললো, 'কাজলী, আমি আর না এলে কি তোমার কষ্ট হবে পড়াশোনায়?' কাজলী খুব কষ্টে উত্তর দিল, 'আর কয়েকটা দিন পড়ান স্যার। পরীক্ষা শেষ হলে আর লাগবে না।' শুনে নকুল কিছুক্ষণ চিন্তা করলো, তারপর বললো, 'আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি যা বলো।' একথায় কাজলী কিছুটা স্বস্তি পেলো। ভাবলো—থাক, আরো কয়েকটা দিন সুযোগ পাওয়া গেলো।

নয়

এখন নকুল পুরোদস্তুর একজন ব্যবসায়ী। ওর সুনাম এখন এই গ্রাম ছেড়ে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। খুব শীঘ্রই সে গ্রামের একজন মাতব্বর শ্রেণীর লোক হবে তাতে সন্দেহ নেই। ইদানীং নকুলের বাড়িতে গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকদের আনাগোনা বেড়েছে। আর বাড়বেই না কেন, এখন তো আর নকুল সেই আগের নকুল নেই। লোকে এখন ওকে শ্রদ্ধা করে কথা বলে। বড় বড় বিয়ের অনুষ্ঠানে দাওয়াত

করে। না গেলে বারবার খবর পাঠায়। এসব এখন খুব স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এতো যে শানশৌকত তা নকুলের ওপর কোনো প্রভাবই ফেলতে পারে নি। সে আগের মতোই ভদ্র, মার্জিত, শান্ত। এখনো সে সময় পেলেই কাজলীকে পড়াতে যায়। আর কাজলীকে বাচ্চা মেয়ে ভেবে তার চোখের ভাষাকে অবহেলা করে। আর বেচারি কাজলী—বারবার ব্যর্থ হয়ে চোখের জলে রাত ভাসায়। যতোবার নকুল আসে কাজলী ভাবে আজই বলে দেবে সব কথা, যতো কথা তার মনে বাসা বেঁধে আছে। যে কথাগুলো না বললে সে মরেও শান্তি পাবে না। কিন্তু এ ভাবাই সার, কাজের কাজ কিচ্ছু হয় না। অবশ্য কাজলী মাঝে মাঝে একথা-সেকথা জিজ্ঞাসা করে, আকারে ইঙ্গিতে বোঝায়, কিন্তু বেচারা নকুল ধরতেই পারে না তার মনের কথা। তখন কাজলীর মনে হয়, নকুলকে হয়তো কেনোদিন জানানোই যাবে না তার মনের কথা। সে হয়তো চিরজীবন অজ্ঞাতই থেকে যাবে এ নীরব প্রেমের।

অনেকদিন নকুল আসে না দেখে কাজলী গেলো নকুলের বাড়ি। গিয়ে তো চিনতেই পারলো না প্রথমে—ওর শানশৌকত কতো বেড়েছে! শেষবার যখন এসেছিল, তখন এক কামরার একটা টিনের ঘর ছিল, যেখানে নকুল একা থাকতো। আর সেখানে এখন চৌচালা টিনের ঘর। অবশ্য খুব শীঘ্রই এটা ভেঙ্গে পাকা বাড়ি তৈরি করা হবে। বাড়ির সামনে ইট-বালু স্তূপ করে রাখা হচ্ছে। নকুল এখন আর বাড়িতে একা থাকে না। যে মামা নকুলকে কোলে-পিঠে মানুষ করেছেন, সেই মামার পুরো পরিবার এখন ওর সাথে। বাড়িটা এখন লোকে ভরপুর।

কাজলীকে দেখে নকুলের মামি ভিতরে নিয়ে বসালেন। বিভিন্ন কথাবার্তায় কাজলী শুনলো নকলের জন্য সারা গ্রামের সেরা ধনী আর সুন্দরীদের বাবাদের আগ্রহের কথা। মেয়েকে যে করেই হোক নকুলের হাতে তুলে দিতে পারলেই নাকি সার্থক। অথচ নকুলের কোনো আগ্রহই নেই। মামি আরো অনেক কিছু বলতে লাগলেন। কিন্তু কাজলী ভাবছে অন্য কথা। কিভাবে বলবে নকুলকে তার মনের কথা? মামি অবশ্য আরেকটা কথা বললেন, যেটা শুনে কাজলী প্রায় মুষড়ে পড়লো, নকুল নাকি কোনো একটা মেয়েকে পছন্দ করে। খুব শীঘ্রই তার জন্য বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবে।

বাড়িতে ফিরেই কাজলী ভাবতে বসলো—নকুল ভাই মেয়ে পছন্দ করেছে এটা রীতিমতো অবিশ্বাস্য লাগছে। আর যদি পছন্দ করেই থাকে তবে কে সে? অনেক চিন্তা করেও শেষ পর্যন্ত বের করতে পারলো না কাজলী। তবে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছলো, যাই হোক, যাকেই পছন্দ করুক না কেন, কাজলীর বুক থেকে কেউ ওকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

দশ

কাজলী ইদানীং বেশ ঘন ঘন নকুলের বাড়িতে আসা-যাওয়া করছে। যখন থেকে শুনেছে নকুল বিয়ে করছে তখন থেকেই তার স্বস্তি নেই। কোন সে ভাগ্যবতী এটা

জানার জন্য সে উতলা হয়ে উঠেছে। কিন্তু তেমন কিছুই জানতে পারছে না মামির কাছ থেকে। নকুল তার পছন্দের মেয়ে সম্পর্কে কাউকে কিছুই বলে না। শুধু বলে, সে রূপসী। শুনে কাজলীর প্রথমে কান ঝালাপালা হয়, তারপর চোখ ছাপিয়ে শুধু কান্না আসতে থাকে, যে কান্না কেউ দেখে না।

নকুলের বাড়িতে আসা-যাওয়ার পথে প্রায়ই হঠাৎ করে নকুলের সাথে দেখা হয়ে যায় কাজলীর। কিন্তু বিশেষ কথা হয় না। সে যে এখন খুব ব্যস্ত মানুষ। নকুলকে দেখলেই কাজলীর বুকের ভেতরটা কেমন হাহাকার করে ওঠে। মানুষটিকে যে সে খুব ভালোবেসে ফেলেছে। এখন কেমন করে তাকে ছাড়া থাকবে এটাই ভাবতে পারে না। তাকে না হলে যে তার চলবে না। এখন একটাই সমস্যা—নকুলকে মনের কথাটা বলে ফেলা। কিন্তু সে সুযোগ নকুল আর দেয় না। এসব কথা ভাবতে ভাবতে কাজলী দিনকে দিন শুকিয়ে যেতে লাগলো। রাত জাগার কারণে চোখের নিচে কালিও পড়েছে। কে বলবে—এই মেয়ে এক সময় গাছে গাছে চড়ে বেড়াতো? আর এখন তার অবস্থা ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো, যে শুধু এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় সতত ছটফট করে।

একদিন বৈশাখ মাসের সকালে বাড়িতে তীব্র হৈ-চৈ শুনে কাজলী লাফিয়ে ওঠে ঘুম থেকে। দৌড়ে নিচে নেমে দেখে প্রচুর মানুষজন। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারে না। বাড়ির কাজের বুয়া ছকিনা বুবু যখন বললো রূপালী বুবুর জন্য বিয়ের প্রস্তাব এসেছে তখন ব্যপারটা পরিষ্কার হলো। দৌড়ে কাজলী নিজের ঘরে যেয়ে একটা ভালো শাড়ি পরে নিল। হালকা ভাবে সেজে নিচে নেমে এলো। ততোক্ষণে মানুষে পুরো বাড়ি ঠাসা। হঠাৎ করেই নকুলের মামা-মামিকে দেখে কাজলী আশ্চর্য হয়ে যায়। তাঁরা কাজলীকে দেখে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরেন। মামি বললেন, 'মা, আমরা তো প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।'

'প্রস্তাব? কিসের প্রস্তাব?' প্রথমে কাজলী বুঝতে পারে না।

'কিরে, তুই জানিস না? নকুলের জন্য রূপালীর বিয়ের প্রস্তাব।' শুনতেই কাজলীর পায়ের নিচ থেকে যেন মাটি সরে যেতে লাগলো। মনে হলো—এখনই মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। ওর আরো বেশি অবাক লাগলো শুনে যে, নকুল আর রূপালীর নাকি সম্পর্ক আছে। ওরা একজন আরেক জনকে পছন্দ করে। এরপর ওরা কিভাবে নীরবে প্রেম করতো তাই নিয়ে সবাই বেশ মজা করতে লাগলো। কাজলী ধীরে ধীরে নিজের ঘরে এসে দরজার কপাট আটকে দেয়। তারপর দাঁড়ায় জানালার ধারে। বুকের ভিতরটা ধীরে ধীরে ভারী হয়ে যাচ্ছে। কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল জানে না। হঠাৎ তাকিয়ে দেখে নকুল আরো কয়েকটা লোকের সাথে বাড়িতে ঢুকছে। পরনে রুপালি দামি পোশাক। ঠিক যেন স্বপ্নে দেখা রাজকুমার। কাজলীর রাজকুমার। কী অসম্ভব সুখী দেখাচ্ছে নকুলকে! দেখে খুব ভালো লাগে কাজলীর। অবশ্য নকুলের যে কোনো ভালো কিছুতেই সবচেয়ে খুশি হতো কাজলী। আজও সে খুশি হতে চাইছে। কিন্তু এতো বড় বিসর্জন দিয়ে নয়।

এগার

ধীরে ধীরে নকুল আর রূপালীর বিয়ের দিন ঘনিয়ে আসে। সারা বাড়ি জুড়ে সাজ সাজ রব। কাল বাদে পরশু বিয়ে। কাছের, দূরের সব আত্মীয়স্বজন এসে পড়েছে। সবাই কিছু না কিছু কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কাজলীও। বরং বলা যায়, একটু বেশিই ব্যস্ত। সবকিছু তদারকি করা থেকে আপ্যায়ন পর্যন্ত সব কাজলী করছে। চারদিকে আত্মীয়স্বজনরা তো অবাক ওর দক্ষতা দেখে। বেশ হাসি-খুশি সবখানে।

সারা বাড়ির কাজ শেষে সবাই ক্লান্ত হয়ে ঘুমায়। কিন্তু শুধু জেগে থাকে কাজলী। এখন সে যেন রাতজাগা পাখি। যন্ত্রণায় শুধু ছটফট করতে থাকে। কিন্তু কাউকে বলতে পারে না একথা। কাকে বলবে? কে শুনবে এই পাগলামির কথা? নিজের সাথে বহু বোঝা-পড়া চলতে থাকে কাজলীর। ভাবে, সব ভুলে যাবে। বোন স্বামীকে নিয়ে খুব সুখী হবে। কিন্তু পারে না কাজলী। প্রেমকে ভুলে থাকা যে কতো কষ্টের সেটা সে বুঝতে পারে। নিজের সাথেই চলে কাজলীর এক পরোক্ষ যুদ্ধ। কিন্তু বারবার কাজলীই হেরে যায়। বুক বেদনায় বেজে ওঠে। বারবার দুঃখের তিমির রঙে নীল হয়।

আজ বাদে কাল বিয়ে। কাজলী শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। নিজের সাথে যুদ্ধ করতে করতে কাজলী এবার পরিণতি চায়। ও জেনে গেছে নকুল নামের যে মরীচিকা আছে সে শুধু দুঃখই দিবে। হায়, যন্ত্রণা ছাড়া কিছুই দিতে পারে নি, পারবেও না। কাজলীর এখন নিজের জন্য নিজেরই মায়া লাগে। ভাবে পূর্বের কথা, যখন সে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী। সে জানতো না প্রেম-ভালোবাসা নামে কোনো শব্দ আছে। আছে এক অন্যরকম অনুভূতি। যখন জানলো তখন থেকেই তার যন্ত্রণা সে বহন করে চলেছে, কিন্তু ধারণ করতে পারছে না।

রাত গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। ভোর হতে বেশি দেরি নেই। ধীরে ধীরে একটা কুপি জ্বেলে কাজলী ঘর থেকে বের হয়ে আসে। গায়ে চাদর দিয়ে পুরোপুরি ঢেকে নেয়। রাস্তায় নেমে পড়ে। বাইরে ঠাণ্ডা বাতাস। কিন্তু কোনোদিকে লক্ষ নেই কাজলীর। সে হাঁটতে থাকে। এক সময় এসে দাঁড়ায় নকুলের বিশাল বাড়ির উঠানে। বাড়ির চতুর্দিকে একবার তাকিয়ে দাঁড়ায় নকুল যে ঘরে ঘুমায় সে ঘরের জানালা বরাবর। নকুলের ঘর দোতলায়। একটা বড় ঢিল ছুঁড়ে মারে জানালায়। প্রথমবার সফল না হলেও পরের বার নকুল জানালা খুলে দাঁড়ায়। জোরে চেঁচিয়ে ওঠে—'কে, কে?' কিন্তু কাকে বলছে, কেউই তো নেই। নকুল সঙ্গে সঙ্গে জানালা বন্ধ করে দেয়।

কাজলী আজ কেন এখানে এসেছে তা সে নিজেই জানে না। শুধু জানে একজন মানুষ আছে তাকে সে খুবই ভালোবাসে। তাকে এক নজর দেখার লোভ সংবরণ করতে পারে নি বলেই সে এখানে। বেশিক্ষণ কাজলী আর অপেক্ষা করে না। প্রিয় প্রেমিককে আবছা-একরত্তি দেখে সে আর একবার না-পাওয়ার বেদনা অনুভব করে। হাঁটতে থাকে রেল-লাইনের দিকে। কারণ, ট্রেন আসতে আর বেশি দেরি নেই।

• • •

বৃষ্টি-বিলাসী মেয়ে

এম. ফজলুল্লাহ্

উৎসর্গ :

শান্ত, তোর রাগ প্রকাশ করার ভঙ্গি আমাকে মুগ্ধ করেছে
তোর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল, অথচ আমাকে কিছুই না বলে
অন্য রুমে চলে গেলি, আমি কিছু বুঝতেই পারলাম না।

তুই কি বুঝতে পারছিস, কতোটা প্রিয় হলে কোনো লেখক
কাউকে তার বই উৎসর্গ করে, তা-ও আবার প্রথম বই?

এই বইটা তোর নামেই

লেখক-পরিচিতি

জন্ম ২০ ডিসেম্বর ১৯৮৫, লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর উপজেলার দক্ষিণ সোনাপুর গ্রামে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখছেন।

উপন্যাস লেখার নেশা চেপেছিল ১৯৯৯ সালে ক্লাস নাইনে পড়ার সময়ে। লিখেও ফেলেছিলেন 'একটা কিছু'। সেই 'একটা কিছু' অনেকদিন সংগ্রহেও ছিল। ছাপাবার জন্য অনেক 'লাফালাফি' করেছেন। সময়-সুযোগ-সামর্থ্য—এর কোনোটাই হয় নি। 'একটা কিছু'টা যে কতো বড় অখাদ্য ছিল, তা বুঝতে পারলেন ২০০৩ সালে। ফলস্বরূপ, 'একটা কিছু'র কপালে জুটলো 'অগ্নি-সমাধি'। 'অগ্নি-সমাধি' হলেও কিছুটা রেশ থেকে গেলো। সেই রেশ ধরেই একটু ভিন্ন আঙ্গিকে এবারের প্রয়াস।

লেখক এখনো ছাত্র, রাজশাহীর ইসলামী ব্যাংক মেডিক্যাল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে অধ্যয়নরত।

সকালে ঘুম থেকে জাগার পর রফিক সাহেব বিছানায় অনেকক্ষণ তাঁর চশমাটা হাতড়ালেন। হাতড়ানোর ব্যাপারটা আসার কথা না। হাতড়ানোর ব্যাপার আসে অন্ধ হলে। তিনি অন্ধ নন। তবে তাঁর এখনকার অবস্থা অন্ধের মতোই। তিনি চোখ মেলতে পারছেন না। ভোরের সূর্যের আলো চোখে পড়ায় চোখ খুলতে পারছেন না—তা নয়। এই ঘরে সূর্যের আলো চোখে পড়ার সুযোগ নেই। প্লেন টিন ফুটো করা জানালার মতো যে জিনিসটা ঘরের দেয়ালে আছে, তাতে বড় জোর দম নেয়ার জন্য অপরিহার্য বাতাসটা আসতে পারে। উঁকি দিয়ে পাশের চিপাগলি দিয়ে কে যায় তা দেখা যেতে পারে। কিন্তু সূর্যের আলো ঢোকার মতো অবস্থা নেই। বস্তির মতো গাদাগাদি করে বানানো কয়েকটা টিনশেড ঘরের একটা। তবে বস্তি না। ভদ্র মানুষদের একেবারে নিম্নশ্রেণীর ঘর।

রফিক সাহেব চোখ মেলতে পারছেন না অন্য কারণে। তাঁর চোখে আঠার মতো একটা কিছু লেগে আছে। হলুদ পুঁজের মতো। তিনি হাতের উলটো পিঠে চোখ মুছলেন। তাঁর চশমাটা পাওয়া গেছে। বিছানা থেকে পড়ি-পড়ি করছিল। চশমাটার একটা ডাঁট ভাঙ্গা। তবে চোখে দিতে সমস্যা হয় না। চশমাতে শক্ত সুতা জাতীয় দড়ি লাগানো হয়েছে। কাজটা করেছেন দোদুলের মা। দোদুলের মা হলেন রফিক সাহেবের স্ত্রী। রফিক সাহেব দোদুলের মার ওপর খুশি হলেন। খুশি-খুশি গলায় বললেন—'খুব ভালো কাজ করেছো। চোখে দিতে সমস্যা হচ্ছিল। অনেকদিন থেকে বলবো-বলবো ভাবছিলাম। তুমি নিজ থেকেই করলে, বাজারে নেয়ার কী দরকার? শুধু-শুধু টাকা খরচ। ডাঁট দিয়ে তো আর দেখবো না, দেখবো কাঁচ দিয়ে। কাঁচ তো ভালো আছে। কাঁচটা বেশ ভালো সার্ভিস দিচ্ছে। তেমন কোনো ঘষা-মাজার দাগও পড়ে নি।'

কথাগুলো বলে তিনি দোদুলের মার দিকে তাকালেন। ভাবছিলেন, দোদুলের মা সলজ্জ হয়ে তাঁর পান দরকার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করবেন। কিন্তু দোদুলের মা তাঁকে অবাক করে দিয়ে ঝামটা মেরে বললেন, 'এখন খুব হিসেব করে চলা হচ্ছে? আগে খেয়াল ছিল না? আগে এতো করে বললাম উলটা-পালটা খরচ করো না। একটু বুঝে-শুনে চলো। তখন শুনলে না। এখন চশমার ওপর লেকচার মারা হচ্ছে, না?'

রফিক সাহেব চুপসে গেলেন। মাথা নিচু করে ফেললেন। তিনি জানেন, এর পরে কথা বাড়ালে পরিবেশ আরো খারাপ হবে। আর এই পরিবেশ খারাপ হওয়ার পেছনের কারণটা যে তিনি নিজে, তা তিনি ভালো করেই জানেন। নিজের কৃতকর্মের জন্য তাঁর এখন আফসোস হয়। তাঁর এখন 'আফসোস-দশা' চলছে। তিনি দিনে কমপক্ষে চল্লিশ-পঞ্চাশবার 'আফসোস' শব্দটা উচ্চারণ করেন। সাথে একটা দীর্ঘশ্বাসও ছাড়েন। আফসোস শব্দটা এখন তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সব কথাতেই আফসোস বলেন। খুশির খবর হলেও। দোদুলের মা একদিন এসে খুশি-খুশি গলায় বলেন, 'এই শুনেছো, ফাতেমার ছেলে হয়েছে!'

রফিক সাহেব কিছু বুঝলেন কি বুঝলেন না, চোখ বড়-বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—আফসোস। দোদুলের মার মেজাজ গেলো খারাপ হয়ে। কিন্তু তিনি

মেজাজ ঠাণ্ডা রাখলেন। এই দিনে অন্তত মেজাজ খারাপ রাখা যায় না। তিনি খুব শান্ত ভাবে বললেন, 'তোমার মাথায় কোনো সমস্যা হচ্ছে মনে হয়। কিসের মধ্যে কী বলো?'

রফিক সাহেব বুঝলেন—কোথাও সমস্যা হয়েছে। কিছুক্ষণ কী যেন ভেবে বললেন, 'ও, ভালোই তো।'

'শুধু ভালোই তো? নাও, মিষ্টি খাও। জামাই এসে দিয়ে গেছে। তুমি রেডি হয়ে নাও। মেয়েকে দেখতে যাবো। তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।'

এই হলেন দোদুলের মা। হোসনে আরা বেগম। মুখ থুবড়ে পড়া সংসারটাকে কোনোরকম জোড়াতালি দিয়ে চালাচ্ছেন। সংসারের সব কাজেই তাঁর খোঁজখবর রাখতে হয়। রফিক সাহেব কেবল বাজারটুকুই করেন। ইদানীং এই কাজটুকুই ভালোমতো করতে পারছেন না। মাঝে মাঝে টাকা হারিয়ে শুকনো মুখে বাসায় ফিরে আসেন। সেদিন ঘরে চুলা জ্বলে না। ত্রাহি-ত্রাহি অবস্থা।

রফিক সাহেব চশমাটা পরে দোদুলের মাকে ডাকলেন। দোদুলের মা বিরক্ত মুখে চায়ের কাপ হাতে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে গজ গজ করে বললেন, 'ইদানীং দেখি তোমার সাহেবদের মতো ঘুম ভাঙ্গছে বেলা করে। তুমি আবার লাটসাহেব হলে কবে থেকে? রাতে লাটসাহব হওয়ার স্বপ্ন দেখছো মনে হচ্ছে। বুড়ো বয়স হলে মানুষ আল্লাবিল্লা বেশি করে। নামাজ-কালাম পড়ে। তুমি তো দেখি দিন দিন তা ছেড়েই দিচ্ছ। ব্যাপার কী? ভয়-ডর বলে কি কিছু নেই? এই দুনিয়ায় আমাকে অনেক ফাঁকি দিয়েছো। ঐ দুনিয়ায় উনারে ফাঁকি দিতে পারবা না।'

রফিক সাহেব শুনেই গেলেন, কিছু বললেন না। শুধু শেষে দাঁতমুখ খিঁচে বললেন, 'আফসোস।' তবে তিনি দোদুলের মার ওপর খুশিই হলেন। মহিলাটা কথা যা-ই বলে, তাঁর খাওয়া-দাওয়া সব ঠিকঠাকমতোই দেয়। ইদানীং নিয়ম করে সকালবেলায় চা দেয়া হচ্ছে, বড় লোকের বেডটি'র মতো। তিনি অবশ্য মুখ-টুখ ধুয়ে এসেই খান। তাঁর এই সংসারে চা খাওয়াটা বিলাসিতাই বলা চলে। এই বিলাসিতার ব্যবস্থা করেছে দোদুল। তার টিউশনির সংখ্যা আরেকটা বেড়েছে। ছেলেটা টিউশনি করতে করতে নিজের শরীরের দিকে নজর দিতে পারছে না। রফিক সাহেবের এমন অবস্থা হয়েছে—তিনি ছেলেমেয়েদের এখন আর উপদেশ দিতে পারছেন না। সবাই শোনার পর মুখ ঝামটা দিয়ে বলে—তাহলে তোমার এই অবস্থা কেন? রফিক সাহেব ভাবেন—তিনি এখন এই সংসারে বড়ই বোঝা হয়ে উঠেছেন। অপাঙ্‌ক্তেয়।

মৃদুল গড় গড় করে বমি করে দিল। এই কাজটা সে এখন নিয়মিত করছে। সকালবেলায় একগাদা বমি করা তার এখন দায়িত্ব হয়ে গেছে—ভাবটা এমন। সে বেকার মানুষ। হয়তো ধরেই নিয়েছে একেবারে বেকার থাকার চেয়ে কিছু একটা করা ভালো। সেই কিছু একটা হলো সকালবেলায় গড় গড় করে বমি করা। এই বমি করার প্রস্তুতি চলে সাঁঝরাত থেকে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরে রাত বারটা-একটায়। সারারাত নিজের বিছানায় বিড়বিড় করে কী যেন বলে। মাঝে মাঝে খুব অশ্লীল কথাবার্তাও বলে। পাশের বিছানায় যে ছোট ভাই দোদুল আছে

সেদিকে খেয়াল থাকে না। সারারাত বিড়বিড় করার পর সকালবেলায় বমি করে। বমিতে কিছু থাকে না, কেবল কালো কালো পানি।

দোদুলের হয়েছে উলটা। নেশা-টেশার ধার ধারে না। কেবল মাঝে মাঝে সিগারেটটা খায়। সংসারের প্রতি অসম্ভব টান। এই বয়সেই সংসারের অনেক দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে নিয়েছে। দোদুল ছোটবেলা থেকেই বাবা-মার কাছে খুব প্রিয়। হয়তো ছোট ছেলে বলেই তার এই বাড়তি পাওনা। অবশ্য সে এখন সেই পাওনা শোধ করার চেষ্টা করছে।

দোদুলের মা প্রথমে হোসনে আরাই ছিলেন। বড় ছেলে মৃদুল হওয়ার পরও হোসনে আরাই ছিলেন। মেয়ে ফাতেমা হওয়ার পরও হোসনে আরা, কেবল দোদুল হওয়ার পরই হোসনে আরা হয়ে গেলেন দোদুলের মা। অবশ্য তিনি তাঁর এই তিন ছেলেমেয়ের নামের মধ্যে মেয়ে ফাতেমার নাম নিয়েই বেশি সন্তুষ্ট। একেবারে নবীজির মেয়ের নামে নাম, যিনি হবেন বেহেশেতের মহিলাদের সর্দার। এমন একজন ভালো মানুষের নামে নাম রাখার নিশ্চয়ই ফজিলত আছে। তাঁর মেয়ে ফাতেমা সেই ফলও ভোগ করছে। ফাতেমার সংসারটা সুখের, মোটামুটি সচ্ছল। তার মতো একটা মেয়ে-মানুষের এর চেয়ে বেশি সুখ পাবার কথাও না। ফাতেমার স্বামী কাপড়ের ব্যবসায়ী। হোল-সেলার। ইসলামপুরে মস্ত বড় দোকান। সেই দোকানে সাতজন কর্মচারি। দোকানের কর্মচারির সংখ্যা গুনেই ব্যবসাপাতির অবস্থা বোঝা যায়। ফাতেমা প্রতিবারই আসার সময় একসেট নতুন গয়না পরে আসে। গয়নাগুলো খুঁটে খুঁটে মাকে দেখায়। বান্ধবীদের দেখায়। মেয়েদের এই একটা ব্যাপার। তারা জীবনে আর কিছু হোক বা না হোক, গয়না বিশেষজ্ঞ হয়ে যায়।

'এই দেখ্, এই বলটা খুব সুন্দর না? খুব সুন্দর কম্বিনেশন। বলটা না থাকলে খালি-খালি লাগতো, কী বলিস? কী ব্যাপার, তুই অতোদূর থেকে গলা টানা দিয়ে কী দেখছিস? কাছে এসে দেখ্। নে, হাতে নিয়ে ভালো করে দেখ্।' ফাতেমার বান্ধবী রোজি কিছুটা লজ্জা পেয়ে বলে, 'না না, কী বলছিস তুই! হাতে নিয়ে দেখতে হবে না। তুই বল্, আমি শুনছি। আচ্ছা, তোর স্বামী কি তোকে খুব ভালোবাসে?'

'তো আর বলছি কী? তুই বিশ্বাসই করতে পারবি না। সারারাত আমাকে জড়িয়ে ধরে না ঘুমালে ওর ঘুম আসে না। আমার অসহ্য লাগে। এমন পুতুপুতু ভাল্লাগে না। কী আর করা! শীতকালে যা-ও একটু ভালো লাগে, গরমের সময় একেবারে ঘেমেটেমে একাকার। তবুও ছাড়বে না। একটু হাতটা সরাতে গেলেই ঘুমের মধ্যে থেকে বলে উঠবে—উঁ। মনে হয় আমি হাত সরাবো সেজন্য অপেক্ষা করছে।'

এই হলো ফাতেমা। ফাতেমা জাহান। রফিক সাহেবের একমাত্র মেয়ে, নিজের সুখের সংসারের গল্প করতে করতেই যার দিন কেটে যায়। ফাতেমা মেঝো। বড় হলো ছেলে। মৃদুল। মইনুল হোসেন মৃদুল। ঢাকা ভার্সিটি থেকে মাস্টার্স পাশ করে এখন বিখ্যাত মদখোর। চাকরি-বাকরি কিছু করছে না। প্রথম দিকে চেষ্টা-টেষ্টা করেছিল। এখন তা-ও করে না। সারাক্ষণ কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যাবেলায় বখাটে বন্ধুদের সাথে আড্ডা মেরে হুইস্কি-টুইস্কি খেয়ে আসে। সারারাত বিছানায় গড়াগড়ি খায় আর বিড়বিড় করে। সকালবেলায় বমি করে। রুটিন ওয়ার্ক।

দোদুল জাহাঙ্গীরনগর ভার্সিটি থেকে এ বছরই মাস্টার্স পাশ করলো। এখনো চাকরি-বাকরি কিছু পায় নি। চার-পাঁচটা টিউশনি করে। তাতে মোটামুটি হাজার পাঁচেক টাকা হয়।

দোদুল বিছানা থেকে উঠে মৃদুলের মাথা চেপে ধরে বললো, 'ভাইয়া, তোমার কী হয়েছে? রোজ রোজ এই অব্যস্থা! কী সব ছাইপাশ খাও। নাও, কুলি করো।' মৃদুল বমির ওপর কুলি করলো। বমি আর পানি সারা ঘরে লেপটে যাচ্ছে। মৃদুল সেই গড়িয়ে যাওয়া পানি মুগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দেখার পর আবার বালিশে মাথা দিল। মৃদুলের এই নেশার কথা সবাই জানে। ইদানীং ও ঘরে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। সবাই যেন ধরে নিয়েছে ও ডায়েট চেঞ্জ করেছে। ভাত না খেয়ে মদ খাচ্ছে। একটা কিছু খেয়ে তো বেঁচে থাকতে হবে।

মৃদুলের এই অবস্থার পেছনে রফিক সাহেবের কিছুটা অবদান আছে। রফিক সাহেব সারাজীবনই বেহিসেবি ছিলেন। অল্প বেতনে চাকরি করেও তিনি হিসেব করে চলতেন না। মাঝে মাঝেই বাজার থেকে বড় কোনো ইলিশ বা কাতল মাছ কিনে আনতেন। এসে বলতেন, 'দোদুলের মা দেখে যাও, সস্তায় একটা মাছ নিয়ে এলাম। মাত্র আড়াই শ টাকা। টাকার হিসেবে মাছটা বড়, না? এতো কম দামে দিত না। আমি হলাম পারমানেন্ট কাস্টমার। পারমানেন্ট কাস্টমারদের একটু কম দিতে হয়। না হলে নিজেরই লস। কাস্টমার ছুটে গেলে দশদিনের ব্যবসা নষ্ট হবে। একদিনের ব্যবসার চেয়ে দশদিন একটু-একটু করে ব্যবসা করাই ভালো। এটাই ব্যবসার কৌশল।' বলেই হোসনে আরার দিকে তাকাতেন, যেন জগৎ-সংসারের কঠিন মারপ্যাঁচ তিনি বুঝে ফেলেছেন, যদিও এরকম প্রতিটি মাছেই তিনি পঞ্চাশ-ষাট টাকা ঠকে আসেন। হোসনে আরার এসব সহ্য হয় না। একদিন তেলে-জলে খাবে আর দশদিন চুলায় আগুন জ্বলবে না—তা তাঁর পছন্দ নয়। তিনি হয়তো চোখমুখ কুঁচকে বলতেন, 'মাছ এনেছো। অথচ ঘরে এক ফোঁটা তেল নাই। মাছ কি পোড়া দিয়া খাইবা নাকি?'

'তেল নাই তো বললেই হয়। তেল নাই তেল আনবো। এটা তো সহজ কথা।' বলেই তিনি উঠে যেতেন। বাজার থেকে দামি সয়াবিন তেলের পাঁচ কেজি পরিমাণের একটা কন্টেইনার নিয়ে আসতেন। সাথে দুই কেজি গরুর দুধ। এনেই খুশি-খুশি মুখে বলতেন, 'বুঝলে হোসনে আরা, একটা বাচ্চা ছেলে জগে নিয়ে দুধ বিক্রি করছে। দুই কেজির মতো ছিল। আমি তো কোনো জগ-টগ নিই নি। তাই ঠিকা দরে জগসহ নিয়ে আসলাম। কী বলো, ভালো করেছি না?'

প্রতি মাসের প্রথমেই তিনি এরকম করতেন। পনর-ষোল তারিখের দিকে তাঁর টাকা ফুরিয়ে আসতো। তখন দেখা যেতো ঘরে চাল নেই। রফিক সাহেবকে ঠেলে ঠেলেও বাজারে পাঠানো যাচ্ছে না। তিনি গাঁইগুঁই করতেন। এই পনর-ষোল দিনের দুর্বিষহ স্মৃতি তিনি ভুলে যেতেন। পরের মাসের প্রথম দিকে আবার হয়তো দুই কেজি মাংস নিয়ে আসতেন। সাথে ঘিয়ের একটা কৌটা।

এইভাবে টানাটানি করতে করতে তিনি একদিন অবসর গ্রহণ করলেন।

হোসনে আরা বেগম দোদুলের জন্য চা নিয়ে এসে দেখলেন দোদুল শার্ট-প্যান্ট, জুতা পরে বাইরে যাওয়ার জন্য রেডি।

'কিরে, কোথায় যাচ্ছিস?'

'একটা চাকরির খোঁজে।'

'শরীরের দিকে যত্ন নিস। যেভাবে খাটাখাটুনি করছিস, শরীর তো ভেঙ্গে পড়বে।' বলেই হোসনে আরা চায়ের কাপ রেখে চলে গেলেন। মৃদুলের বমির দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপও করলেন না।

গতকাল পত্রিকায় একটা ব্যতিক্রমধর্মী বিজ্ঞাপন দেখা গেলো।

আবশ্যক

ঠিক চাকরি নয়, তবে চাকরির মতো।
বেতন বেশি নয়, তবে চাকরিটা রোমাঞ্চকর।

যোগাযোগ :

অ্যাড রূপসী বাংলা।
৩৫-৩৮, কাটাবন, বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট।

এগারটার সময় দোদুল অ্যাড রূপসী বাংলায় পৌঁছলো। এখানে এসে জানা গেলো, যিনি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তাঁর আসার দেরি আছে। এটা তাঁর একটা শাখা অফিস। মূল অফিস গুলশানে। বোঝাই যাচ্ছে, বিজ্ঞাপনদাতা রোমাঞ্চকর চাকরির বিষয়ে মূল অফিসে কথা বলতে চাচ্ছেন না, এ ব্যাপারে শাখা অফিসই তাঁর পছন্দ। কিংবা চাকরিটা এ অফিস সংক্রান্তই। এ অফিসে অনেকগুলো কম্পিউটার। প্রত্যেকটাই ব্যস্ত। অপারেটররা একমনে কাজ করে যাচ্ছে। কারো দিকে তাকাচ্ছে না। পিয়ন গোছের একজন এসে দোদুলকে ওয়েটিং রুম মতো একটা রুমে নিয়ে গেলো। ঠিক একটা রুম নয়, অর্ধেকটা রুম। বড় রুমের মাঝখানে পার্টিশন দিয়ে আলাদা করা হয়েছে। বাকি অর্ধেকেও তিনটা কম্পিউটার। রুমের কোনো অংশই অকাজে পড়ে থাকার পরিকল্পনা নেই। মালিকটা যে খুব কিপটে টাইপ হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এরকম মালিকের চাকরি করাটা কোনো সুখকর ব্যাপার নয়। তবুও রোমাঞ্চকর চাকরির শেষটা না দেখে যেতে মন চাইছে না।

দোদুল চেয়ারে বসে পা নাচাচ্ছে। একটা সিগারেট খেতে পারলে ভালো হতো। এই রুমটা স্মোক-ফ্রি রুম কিনা বোঝা যাচ্ছে না। 'নো স্মোকিং' জাতীয় কোনো লিফলেটও দেখা যাচ্ছে না। এক কোনায় একটা অ্যাশ-ট্রে দেখা যাচ্ছে। তার মানে সিগারেট খাওয়ার অনুমতি পাওয়া গেলো।

প্রথম সিগারেট খাওয়া নিয়ে একটা কাহিনী মনে পড়লো দোদুলের। প্রথম যেদিন সিগারেট খাওয়ার 'হাতেখড়ি'র মতো 'মুখে সিগারেট' টাইপ ঘটনা ঘটলো, সেদিনের অনুভূতি। প্রথম ঘটনাটাই ছিল দীর্ঘ টান। সেই দীর্ঘ টানের ধোঁয়া সে পুরোটাই গিলে ফেললো। তারপর সে কী হেঁচকি। তার বন্ধুরা মিলে পানি-টানি খাইয়ে হেঁচকি বন্ধ

করালো বটে, কিন্তু এই ফাঁকে কাশি আর হেঁচকি বাবাজি তাকে একেবারে কাবু করে ফেললো। সেই দিনই দোদুল জানলো, প্রথম প্রথম সিগারেট খেতে ধোঁয়া গিলে ফেলতে নেই। মুখে ভরে আবার ছেড়ে দিতে হবে। তার এক বন্ধু রাশেদ বললো, 'আমার এক পরিচিত আছে যে প্রথম সিগারেটের ধোঁয়া গেলার জন্য এক বছর সময় নিয়েছিল।'

দোদুল একটা বেনসন ধরালো। শুধু সিগারেট খেয়ে সময় নষ্ট করার মানে হয় না। সময়ও পুড়ছে, সিগারেটও পুড়ছে। কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। অলস সময় কাটিয়ে লাভ কী? অন্য একটা কাজ করতে হবে। চিন্তা করতে হবে। আচ্ছা, কী চিন্তা করা যায়? হ্যাঁ, জেসির কথা ভাবা যেতে পারে। ও এখন কী করছে? বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। ও নিশ্চয়ই জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টি ছোঁয়ার চেষ্টা করছে।

মেয়েটা বৃষ্টি খুব পছন্দ করে। এমন বৃষ্টিকাতর মেয়ে জীবনে দেখে নি দোদুল। বৃষ্টি শুরু হলে দুনিয়ার অন্য কোনো কথা তার মনে থাকে না। একবার তারা বাইরে বেড়াবে বলে ঠিক করলো। যাওয়া হবে মিরপুরের দিকে। চিড়িয়াখানায় যাবে। জেসির খুব পছন্দ চিড়িয়াখানা। তাছাড়া, মিরপুর এলাকাটাই তার কাছে ভালো লাগে। মেইন ঢাকা শহরের মতো এতো কোলাহল নেই। দোদুলের আবার এসব ভালো লাগে না। তবুও জেসির আবদার তো রাখতেই হবে। আরো একটা দেখবে। সেটা হলো মিল্কভিটার কারখানা। ওদের কোনো পরিচিত লোক নেই। ঢুকতে দিবে কিনা সেটা একটা সমস্যা। তবে কিঞ্চিৎ আশা আছে, দারোয়ান টাইপ কারো হাতে পঞ্চাশ-একশ টাকা ধরিয়ে দিলে ঢোকা যেতে পারে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো দেশে এমন আশা করা যেতেই পারে। কেউ কিছু বললে, 'স্যরি, একটু দেখার কৌতূহল ছিল' বলে বেরিয়ে আসা যাবে। কিংবা আন্দাজে একজনের নাম দিয়ে তাকে খুঁজতে আসার কথা বলা যাবে।

কথা ছিল দোদুল এসে জেসিকে বাসা থেকে নিয়ে যাবে। ঠিক নটার সময় দোদুল আসবে। এই ফাঁকে জেসিও রেডি হয়ে থাকবে। দোদুল সেদিন গিয়েছিল সাড়ে নটায়। গিয়ে দেখে জেসি হেভ্‌ভি করে সেজে বসে আছে। গোলাপি কালারের শিফন শাড়ি পরা। যেন একটা পরী। তবে একটা সমস্যা আছে। পরীর মুখটা পাতিলের তলার মতো কালো করা। দোদুল গিয়ে বললো, 'স্যরি ম্যাডাম, আসতে একটু দেরি হলো।' বলেই একটা গোলাপ ফুল দিল।

'এই তোমার একটু? আধঘণ্টা লেট! ত্রিশ মিনিট একটু হলে পাঁচ-দশ মিনিট কী হবে? পাঁচ-দশ মিনিট দেরি হলে তো হাসি-হাসি মুখ করে বলবে—ম্যাডাম, আজ জাস্ট টাইমের একটু আগেই এসেছি।'

জেসির কথায় দোদুলের হাসি পেয়ে গেলো। কিন্তু জেসি হাসছে না। তার মুখটা এখন যেন আরেকটু মলিন দেখাচ্ছে। ও এখন ইচ্ছে করেই মুখ মলিন রাখার চেষ্টা করছে। মেয়েদের এই আরেকটা ব্যাপার। মনের কথা আর মুখের প্রকাশ দুই রকম হয়। মনে থাকবে একটা, চেহারায় প্রকাশ পাবে আরেকটা। তার এখন মোটেই মুখ হাঁড়ি করে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না। ইচ্ছে করছে দোদুলের হাতটা ধরে এক্ষুণি ঘর থেকে বেরিয়ে একটা রিকশায় উঠতে। কিন্তু তা করা যাবে না। করলে দোদুল লাই পেয়ে যাবে। আরেকদিন আড়াই ঘণ্টা লেট করে এসে বলবে—'তাড়াতাড়ি করো।

তোমরা মেয়েরা এতো লেজি কেন? সামান্য একটা সাজে এতো টাইম লাগে? কোনো কাজই ডিউ টাইমে করতে পারো না। বিরক্তিকর!'

জেসি একটা ক্ষীণ আশায় আছে। দোদুল একটু পরেই কোনো না কোনো ছুতোয় তার গালটা ছুঁয়ে দিবে। এটা সে ইচ্ছে করেই করবে। কিন্তু ভাবটা এমন করবে যেন কাজটা সে নিজের ইচ্ছেতে করে নি, বরং জেসির প্রয়োজনেই করেছে। জেসির ভাবনাকে সত্যি করে দিয়ে দোদুল বললো, 'আচ্ছা ঘাট হয়েছে। ইহজনমে আর দেরি হবে না। এবার মুখ থেকে কালো পর্দাটা সরান। ওটার জন্য আপনার চন্দ্রবদনখানি দেখা যাচ্ছে না।' বলতে বলতে ও জেসির বাঁ গালটা ছুঁয়ে দিল। যেন সত্যি সত্যি কোনো অদৃশ্য পর্দা সরানোর জন্য ও হাত দিয়েছে। আনন্দে জেসির চোখে জল এসে গেলো। এতো আনন্দ যে তা আর গড়িয়ে না পড়ে উপায় খুঁজে পেলো না। কিন্তু এই জল দোদুলকে দেখানো যাবে না। কোনোমতে বললো, 'তুমি বসো, আমি নাস্তা নিয়ে আসি।' বলেই উঠে গেলো।

জেসি ভিতরে যাওয়ার পরে তার বাবা ইব্রাহীম সাহেব এলেন। পাশের সোফায় বসতে বসতে বললেন, 'বাবা কখন এসেছো?'

'এই তো আঙ্কেল, এক্ষুণি।' বলেই দোদুলের মনে পড়লো সালামটা দেয়া হয় নি। এখন কি দেবে? এখন দিলে রিস্ক হয়ে যায়। ইব্রাহীম সাহেব হয়তো খেয়ালই করেন নি। এখন দিলে মনে পড়ে যাবে আগে সালাম দেয়া হয় নি।

ইব্রাহীম সাহেব বললেন, 'তোমরা কি বাবা কোথাও বেরুচ্ছো?'

'জি আঙ্কেল।'

'কোথায় যাবে?'

'এই একটু মিরপুরের দিকে যাবো।'

'তোমরা কি ঘন ঘন মিরপুর যাও? গত মাসে শুনলাম মিরপুর যাবে।'

'আসলে আঙ্কেল, মিরপুরের দিকে জেসির ভালো লাগে। তাছাড়া ও চিড়িয়াখানা দেখতে বেশি আগ্রহী।'

'এক জিনিস বারবার দেখার মধ্যে কী আছে? তার চেয়ে বরং গুলশানের দিকে যাও। ওখানে নাকি নতুন পার্কটার্ক হয়েছে।'

'জি আচ্ছা। অন্য একদিন যাবো।'

'তোমার আব্বা-আম্মা কেমন আছেন?'

দোদুল ভাবলো—এই সেরেছে। সংসারের আলাপ মানেই একটু পরেই তার চাকরির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন। বারবার একই উত্তর দিতে হচ্ছে। লজ্জা লাগে। তাকে বলতে হবে, 'এখনো হয় নি। তবে খুব শিগগিরই একটা কিছু হয়ে যাবে। জোর চেষ্টা চালাচ্ছি।

'খুব শিগগিরই করতে করতে তো এক বছর হয়ে গেলো। আসলে তোমাকে কী বলবো? দেশটারই ঠিক নাই। তোমার মতো ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র পাশ করে এক বছর বসে থাকবে, ভাবা যায়? ফিজিক্সে ফার্স্ট ক্লাস একটা ছেলে বেকার, টিউশনি করছে। আর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। এটা একমাত্র এই দেশেই সম্ভব।'

এই একটা ভালো দিক—ইব্রাহীম সাহেব কোনোদিন সরাসরি দোদুলকে আঘাত করে কথা বলেন না। তার চাকরি না পাওয়ার ব্যর্থতা কোনো না কোনোভাবে দেশের

ওপর চাপিয়ে দেন। হয়তো হবু জামাইয়ের মন বিগড়ে দিতে চান না। কিংবা দেশের চলমান অবস্থার প্রতি জমানো ক্ষোভগুলো ঝেড়ে ফেলার সুযোগ পেয়ে কাজে লাগান। আজ আবার কথা ওই দিকে এগুচ্ছে।

দোদুল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, 'জি, আব্বা-আম্মা ভালোই আছেন।'

'তোমার বড় ভাইটার কী খবর? শুনলাম ও নাকি বখাটে হয়ে যাচ্ছে। একদিন কী কাজে যেন তোমাদের বাসার ওদিকে গেলাম। দেখলাম বাজে ধরনের কয়েকটা ছেলের সাথে আড্ডা দিচ্ছে। মাস্টার্স পাশ করা একটা ছেলে বখাটেদের সাথে ঘুরবে কেন?'

দোদুল লজ্জায় পড়ে গেলো। ইব্রাহীম সাহেব এখনো জানেন না—মৃদুল শুধু বখাটেদের সাথে আড্ডাই দেয় না, তাদের সাথে রীতিমতো 'ডাইল'ও খায়। এতো ব্রিলিয়ান্ট ছেলে ডাইল-মদ খেয়ে শেষ হয়ে যাবে, ভাবা যায়? সরকার কতো কিছুর ওপর কর বসায়। কিন্তু দিনকে দিন মদকে সহজলভ্য করে দিচ্ছে। একদিন দেখা যাবে দেশটা হয়ে গেছে মেধাশূন্য মদখোরের দেশ। সাথে গাঁজার কলকি। আহ্, কী কম্বিনেশন!

এরকমও হতে পারে—গৃহকর্ত্রী সকালবেলায় গৃহকর্তাকে বলবেন, 'এই শোনো, ছেলেটা কিছু মুখে নিচ্ছে না। যাও, বাজার থেকে এক বোতল ডাইল নিয়ে এসো। আর তোমার গলার অবস্থা এখন কেমন? ডাক্তার এতো করে বললো নিয়ম করে গাঁজা খেতে। এই সহজ কাজটাও পারো না? বাজার থেকে একটা গাঁজার কলকিও নিয়ে এসো। ব্যথাটা বাড়লে পরে বুঝবে।'

দোদুল বসে বসে উলটা-পালটা ভাবছে। এমন সময় ইব্রাহীম সাহেব বললেন, 'বাবা, চাকরি-বাকরির কিছু হয়েছে?'

'এখনো হয় নি আঙ্কেল।'

'সময় তো কম হলো না। মেয়েটা বড় হয়ে গেছে। লোকে কানাঘুষা করে। ঐদিন তার মামি একটা ছেলের খবর আনলেন। ছেলে আমেরিকায় থাকে। তার কোনো ডিমান্ড নেই। মেয়ে পছন্দ হলেই বিয়ে করে আমেরিকায় নিয়ে যাবে। আগামী মাসে দেশে আসবে এক মাসের জন্য। আমি জেসির মামিকে বললাম—জেসি একটা ছেলেকে পছন্দ করে। আজকালকার মেয়ে। অমতে বিয়ে দেয়া কি ঠিক হবে? জেসির মামি বললেন—পছন্দ আছে ভালো কথা। এই বয়সে এরকম থাকবেই। আমেরিকার ছেলেকে দেখলেও পছন্দ হয়ে যাবে। তাছাড়া ঐ ছেলের কী আছে? শুনলাম নাকি টিউশনি করে? টিউশনিতে কয় পয়সা আয় হয়? তাছাড়া, দেখাদেখি হলেই তো বিয়ে হয়ে যাচ্ছে না। ছেলেটা আসুক। জেসিকে দেখুক। এই ফাঁকে তোমরাও ছেলেটার ছবি দেখো।'

দোদুলের বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো। ইব্রাহীম সাহেব এই গল্প শুনিয়ে কী বোঝাতে চাচ্ছেন? সত্যি সত্যিই কি জেসিকে দেখতে আসছে? নাকি তাকে চাপে রাখার জন্য বলা হচ্ছে? যদি সত্যি হয়, তাহলে আসলেই বিপদ।

এমন সময় জেসি ভেতর থেকে ট্রে হাতে বসার রুমে ঢুকলো। এখন তার মুখ হাসি-হাসি। হাসির কারণ বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি জেসির খুব প্রিয়। নাশতা খাওয়া শেষে জেসি দোদুলকে অবাক করে দিয়ে বললো, 'চলো।'

'কোথায়?'

'কোথায় আবার? যেখানে যাওয়ার কথা ছিল।'

'এই বৃষ্টির ভিতর?'

'হ্যাঁ, আজ বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে রিকশায় চড়ে যাবো।'

জেসির চাপাচাপিতে দোদুলকে যেতে হলো। বৃষ্টিতে ভিজে রিকশায় চড়েই যেতে হলো।

এই হলো জেসি। বৃষ্টিকাতর জেসি। যে মেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টায় করা কষ্টকর সাজ নষ্ট করে বৃষ্টিতে ভিজতে পারে, তার বৃষ্টি-প্রীতি অবশ্যই আকাশচুম্বী। বৃষ্টিতে ভিজার ক্ষেত্রে কোনো অ্যাওয়ার্ড থাকলে নির্দ্বিধায় জেসিকে দেয়া যেতো।

অ্যাড রূপসী বাংলার অফিসে দোদুল জেসিকে নিয়ে ভেবে সোয়া এক ঘণ্টা পার করে দিল। এর পাঁচ মিনিট পরে পিয়ন গোছের লোকটা এসে বললো, 'আসেন। স্যার আপনাকে ডাকছে।'

দোদুল বসে আছে এহসান সাহেবের সামনে। এহসান সাহেবের চোখে চশমা। চুলগুলো কাঁচাপাকা। মজার ব্যাপার হলো, চশমার জন্য তাঁকে বুড়া-বুড়া লাগার কথা থাকলেও তা লাগছে না। বরং বয়সটা একটু কম মনে হচ্ছে। দোদুল যেমন তাঁকে দেখছে, তিনিও তেমনি দোদুলকে দেখছেন। কিছুক্ষণ পর তিনিই মুখ খুললেন।

'কী নাম তোমার?'

'দোদুল। দেলোয়ার হোসেন দোদুল।'

'তুমি করে বললাম। কিছু মনে করো নি তো? তুমি আমার মেয়ের মতো। মেয়ের মতো বললাম, কারণ আমার ছেলে নেই।'

'না, আমি কিছু মনে করি নি।'

'কী করো তুমি?'

'জি, আমি ফিজিক্সে মাস্টার্স কমপ্লিট করেছি এ বছর। জাহাঙ্গীরনগর ভার্সিটি থেকে।'

'চাকরি-বাকরি করছো না?'

'খুঁজছি।'

'তুমি কি ধারণা করতে পারো, এই চাকরিটা কোন ধরনের হবে?'

'না।'

'চাকরিটা হবে অবজারভেশন। অনেকটা গোয়েন্দাগিরি। বুঝতে পারছো?'

'জি না। এখনো ক্লিয়ার হচ্ছে না।'

'আচ্ছা, তার আগে তোমার অবজারভেশন ক্ষমতার ছোট একটা পরীক্ষা হয়ে যাক। বিজ্ঞাপনের ভাষা থেকে তোমার কী কী ধারণা হয়েছে?'

'আমার কাছে মনে হয়েছে—আপনি চাকরিটা এমন একজনকে দিতে চান যার সত্যি সত্যিই একটা চাকরি দরকার। লোকটাকে রোমাঞ্চ-প্রিয় হতে হবে। যার কাছে জীবনটা চ্যালেঞ্জিং, পানসে নয়।'

'গুড। তুমি কি মনে করো, তোমার ওপরের দুটো যোগ্যতাই আছে?'

'অন্তত প্রথমটা আছে।'

'একটা থাকলে হবে না। দুটোই থাকতে হবে। তোমার কাছে কি জীবন পানসে মনে হয়?'

'না। তবে চাকরি না পেয়ে পেয়ে এখন কিছুটা পানসে লাগছে।'

'তার মানে, আর্থিক সমস্যার কারণে পানসে লাগছে। এটা না থাকলে জীবনকে রোমাঞ্চকর করতে আগ্রহী?'

'জি।'

'আচ্ছা, এবার বলো তো কতো টাকা বেতন হলে তোমার চলবে?'

'জি? এখনো কাজই তো বুঝলাম না। ডিউরেশন কী তা-ও জানলাম না।'

'জানার দরকার নেই। তোমার দরকার টাকা। টাকার সমস্যা মিটলে তুমি জীবনকে রোমাঞ্চকর করতে আগ্রহী। ডিউরেশন যাই হোক দিনে চব্বিশ ঘণ্টার বেশি তো হবে না। তাড়াতাড়ি ভেবে বলো কতো টাকা হলে তোমার চলবে। এক চান্সে বলবে। পরে আর বাড়ানোর সুযোগ পাবে না।' দোদুল কিছুক্ষণ ভেবে বললো, 'মাসে পনর হাজার টাকা হলে চলবে।'

'গুড। তোমার চাকরি ওকে। আমি এক কথার মানুষ। কাজে যেন তোমার মন থাকে এই কারণে আর কোনো দরাদরিতে গেলাম না। কিন্তু মনে রেখো, আমি তোমাকে চব্বিশ ঘণ্টার জন্যই কিনে নিলাম। এখন থেকে তোমার আর নিজের সময় বলে কিছু থাকবে না। যেদিন দেখবে তোমার নিজের সময় কিছু দরকার, সেদিন চাকরি ছেড়ে চলে যাবে। বুঝতে পারছো?'

'পারছি।'

'যাও, যাবার সময় ম্যানেজারের কাছ থেকে তিন মাসের অগ্রিম পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে যেও। ক্যাশই নিও। তোমার তো মনে হয় একাউন্ট নাম্বার নেই।'

দোদুলের নিজের কানকেই বিশ্বাস হচ্ছে না। এতো সহজে এতো বেতনের একটা চাকরি পাওয়া যাবে সে ভাবতেই পারে নি। এহসান সাহেব বললেন, 'একটু দাঁড়াও। তোমার বায়োডাটাটা দেখা হয় নি। ও, কাজটা কী তাতো বলা হলো না। কাজটা হলো—তুমি আমার মেয়েকে ফলো করবে। আমার মেয়ের নাম বীথি। চব্বিশ ঘণ্টা চোখে চোখে রাখবে। ও কোথায় যায়, কী করে, কার সাথে মিশে—এসব। এজন্য তোমাকে একটা গাড়ি এবং মোবাইল সেট দেয়া হবে। ড্রাইভারের কাছেও মোবাইল ফোন থাকবে। তুমি তোমার প্রয়োজনমতো এ দুটো ইউজ করবে। আর শোনো, আমি জানি তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। ছ্যাঁচড়া চোরদের মতো টাকা নিয়ে পালিয়ে যেও না। বায়োডাটায় যদি তোমার ঠিকানা ভুলও থাকে তবুও তোমাকে খুঁজে পেতে আমার কোনো সমস্যা হবে না। তুমি হয়তো জানো না আমার হাত কতো লম্বা। তুমি যতোদূরই যাও, দেখবে তোমার মাথা ছাড়িয়ে আমার হাত আরো পাঁচ কিলোমিটার সামনে আছে। বুঝতে পারছো, আমি কী বলছি ?'

'পারছি।'

'তুমি কি চাকরিটা করবে?'

'হ্যাঁ, করবো।'

'কাল থেকেই কাজে নেমে পড়ো। ম্যানেজারের কাছ থেকে কাল গাড়ি ও মোবাইল বুঝে নিবে। ড্রাইভার যে কোনো সময় দূর থেকে তোমাকে আমার মেয়ের দেখা পাইয়ে দিবে। এরপর থেকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখবে। আচ্ছা এখন যাও।'

পাশের বাসার জাকিয়া ভাবী খুব ভোরে এসে হোসনে আরাকে বললেন, 'খবর কিছু শুনছেন ভাবী?'

জাকিয়া ভাবী সবসময়ই রহস্য করে কথা বলেন। মজার ব্যাপার হলো, প্রত্যেকবারই প্রথম প্রশ্ন করেন, 'খবর কিছু শুনছেন ভাবী?' মনে হয় যেন গত রাতে তাজমহলটা ঝড়ে পড়ে গেছে, এই ভয়াবহ খবরটা নিয়ে তিনি এসেছেন। প্রায় সময়ই দেখা যায় খবরের বিষয়বস্তু হালকা এবং নিম্নমানের। তাঁর আরেকটা অভ্যাস হলো তিনি আঞ্চলিক টানে কথা বলেন।

হোসনে আরা বললেন, 'কী খবর?'

'সে কী, আপনি শোনেন নাই? সারা পাড়া ছাইয়া গেলো আর আপনি ঘরের কাছে থাইকা কিছু শুনলেন না?'

'আসলেই আমি শুনি নি। আপনি বলেন তো।'

'মিতুকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'কোন মিতু?'

'ওই যে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের মাইয়্যাটা। ঢলাইন্যা মাগি।'

'ছিঃ ছিঃ, আপনি খারাপ কথা বলছেন কেন? ঘরে আমার ছেলে আছে। মৃদুলের বাপ আছে।'

'আরে, খারাপ মাইয়্যারে নিয়া তো খারাপ কথাই বলবো। আপনি ওরে দেখেন নাই কেমন টাইট গেঞ্জি পইর‍্যা হাঁটা-চলা করতো? ঐ রকম করলে জোয়ান পোলাগো নজর তো পড়বোই। পুরুষ মাইনষের চোখ বলে কথা। আইজ পোলাপানরা খায়েশ মিটাইয়া ওর কোমর দুলানি বাইর কইর‍্যা ছাড়বো।'

'ছিঃ ছিঃ, আপনি চুপ করেন তো। আপনি কিভাবে জানলেন ওকে গুণ্ডারা তুলে নিয়ে গেছে? কোনো আত্মীয়ের বাসায়ও তো যেতে পারে।'

'আরে না। রাইত সাড়ে বারটার দিকে মাগি ঢলানি খাইয়া বাসায় ফিরছিল। ট্যাক্সি থেকে নামামাত্রই মুখে কাপড় বাঁধা কয়েকটা ছেলে হাতমুখ বেঁধে একটা মাইক্রোতে তুলে নিয়ে গেছে। আচ্ছা ভাবী, মৃদুল কি বাসায় আছে?'

'না, ওর কোনো বন্ধুর বাসায় থাকবে।'

'তাইলে তো মনে হয় ঘটনা সত্য।'

হোসনে আরার বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো। তাঁর কেন যেন মনে হলো, জাকিয়া ভাবীর অন্য দিনের খবরে তাজমহল ভাঙ্গার ভয়াবহতা না থাকলেও আজকের খবরটাতে ভয়ানক কিছু আছে। তিনি বললেন, 'কী সত্য?'

'যারা দেখছে তারা বলছে মৃদুলের মতো একজন নাকি ছিল। ইঞ্জিনিয়ারের বেটা থানায় গেছে কেইস করতে। তাতে নাকি মৃদুলের নামও থাকবে।'

হোসনে আরা চোখে অন্ধকার দেখলেন। তাঁর মাথা ঘুরছে। তাঁর ছেলে মৃদুল—বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা ছেলে মৃদুল শেষ পর্যন্ত এই কাজ করেছে! লজ্জায় অপমানে তাঁর চোখে পানি এসে গেছে। জাকিয়া ভাবী যাওয়ার সময় কিছু অপমানজনক কথা বলে গেলেন।

'বুঝলেন ভাবী, পোলা-মাইয়্যাগো কন্ট্রোলে রাখতে হয়। মা-বাপ জাতের হইলে পোলাপানও জাতের হইবো। মা-বাপ কু-জাতের হইলে পোলাপানও কু-জাতের হইবো। এটা আমার কথা না, শাস্ত্রের কথা। আমার এক পোলা এক মাইয়্যা কলেজে পড়ে। কেউ বলতে পারবে না পোলাটা কোনোদিন কোনো মাইয়্যার দিকে চোখ তুলে তাকাইছে। আর মাইয়্যার কথা কী বলবো? আপনার চোখের সামনেই তো। রাস্তা দিয়া হাঁটার সময় তো চোখই তোলে না। বুঝলেন ভাবী, সবই হইলো মা-বাপের ওপর নির্ভর। ভাবী, আপনি আবার মনে করবেন না আপনাকে অপমান করার জন্য কথাগুলো বলছি। মৃদুল নষ্ট হইছে বন্ধুগো পাল্লায় পইড়া। আমি এখন যাই ভাবী। দেখি ওই দিকের কী খবর।'

হোসনে আরার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। এই পানি দুঃখের, অপমানের, দরিদ্রতার গ্লানি-বোধের। অর্থবিত্ত থাকলে জাকিয়া ভাবী নিশ্চয়ই মুখের ওপর এতোটা বলে যেতে পারতেন না। হোসনে আরা ভেবে কোনো কূল-কিনারা পাচ্ছেন না। তিনি দেখছেন—তাঁর সংসারটা কেবলই তলিয়ে যাচ্ছে, তিনি একদিকে আগলে রাখতে গেলে আরেক দিক ভেঙ্গে পড়ছে। ওই দিক আগলে রাখতে গেলে এই দিকও ভেঙ্গে পড়ছে। একদিন এই সংসার নিশ্চয়ই তলিয়ে যাবে। সেটা কি খুব নিকটে?

দোদুল এলোমেলো ভাবে রাস্তায় হাঁটছে। হাঁটার দরকার ছিল না। চাকরির গাড়িটা ব্যবহার করা যেতো। হঠাৎ মনে হলো অনেকদিন রাস্তায় হাঁটা হয় না। আজ প্রাণ ভরে হাঁটবে। আচ্ছা, কোথায় যাওয়া যায়? রাশেদের বাসায় যাওয়া যেতে পারে। রাশেদের বাসা গুলিস্তান। রাশেদকে একটা ভালো কিছু উপহার দেয়া দরকার, যাতে ও চমকে যায়। রাশেদের অবস্থাও তেমন ভালো নয়, তবে মনটা ভালো। দোদুলের হাত প্রায়ই খালি থাকে। রাশেদের কাছে গেলেই হয়। মুখে কিছু বলতে হয় না। রাশেদ পঞ্চাশ-একশ টাকা হাতে ধরিয়ে দিতে দিতে বলে—সংকোচ করিস না। একদিন তো বড় চাকরি করবি। তখন এক টাকায় দশ টাকা শোধ দিস। লজ্জা লাগলেও টাকা ফিরিয়ে দেয়ার উপায় থাকে না। আজ তো সে বড় চাকরিই করছে। রাশেদের বউকেও একটা কিছু দিতে হবে। শাড়ি দিলেই ভালো হয়। দামি শাড়ি, একবার রাশেদ ওর বউকে শাড়ি কিনে দিতে না পারার কথা বলেছিল।

'বুঝলি দোস্ত, ঝরনাকে নিয়ে গিয়েছিলাম নিউমার্কেটে। অনেকদিন শাড়ি-টাড়ি কিনে দেয়া হয় নি। মেয়েটা এতোই ভালো, কোনোদিন মুখ ফুটে কিছু চায় না। আর আমার ব্যবসার কথা তো জানিসই। ইলেকট্রিকের মালে লাভ বেশি হলেও এখন প্রতিযোগিতা বেড়ে গেছে। যার দুইটা ছেলে আছে সে একটাকে ইলেকট্রিকের দোকান দিয়ে বসিয়ে দেয়। আর পাবলিকও এখন আগের চেয়ে চালাক। দুই টাকার মাল কিনতেও দশ দোকান ঘোরে। আমার বাজেট ছিল সাত-আট শ টাকা। অনেক

দেখাদেখির পর একটা শাড়ি পছন্দ হলো ঝরনার। আমারও মনে হলো ওকে খুব মানাবে। দোকানদারকে দাম জিজ্ঞাসা করতেই বললো—আটাশ শ টাকা। আমার মাথা ঘুরে গেলো। লজ্জায় ঝরনার মুখের দিকেও তাকাতে পারছি না, দোকানদারের দিকেও তাকাতে পারছি না। এভাবে কিছুক্ষণ থাকলে আমার চোখে পানি এসে যাবে। ঝরনা সেটা বুঝতে পেরে বললো—কী বলেন, এই শাড়ির দাম আটাশ শ টাকা? টাকা গাছে ধরে নাকি? দোকানদার বললো—ম্যাডাম, আপনি রেগে যাচ্ছেন কেন? আমি দাম বললাম, আপনি একদাম বলুন।—না, আমরা কোনো দাম বলবো না। সাধারণ একটা শাড়ি, তার আবার এতো দাম? আপনি মনে করেছেন আমরা দাম জানি না? তাই ইচ্ছেমতো দাম চাইছেন? রাশেদ, চলো তো, এই দোকান থেকে কিনবোই না। জোচ্চুর আর কী! এরপর আরো দু-এক দোকান ঘুরলাম। আর কোনো শাড়ি পছন্দ হলো না। ওইদিন শাড়ি কেনা হলো না। বাসায় ফিরে আমি ঘটনাটা ভুলতে পারছিলাম না। চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছি। ঝরনার কী ব্যস্ততা—এই, শরবত খাও। উফ্, আজকে কী গরম পড়েছে! তুমি এরকম চুপচাপ শুয়ে আছো কেন? চোখ মেলো। তুমি মনে কোনো সংকোচ রেখো না। শাড়ি তো শাড়িই। তার আবার এতো দাম হবে কেন? ওই শাড়ি আমি কোনোদিনই পরবো না। বুঝলি দোস্ত, অনেকদিন ঘটনাটা আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। শাড়ির ব্যাপারে ঝরনা জোরাজুরি করলে হয়তো এতোটা খারাপ লাগতো না। সিদ্ধান্ত নিলাম, পরের মাসে ওই শাড়িটাই আমি ওকে কিনে দেবো। কয়েকদিন নিউমার্কেটে গিয়ে দেখে এলাম, ওটা বিক্রি হয়েছে কিনা। কিন্তু সেই শাড়ি আমার আর কেনা হয় নি।'

রাশেদের বউকে একটা ভালো শাড়ি দিতে হবে। সম্ভব হলে ওই শাড়িটাই। এতোগুলো টাকা হাতে পেয়ে কিভাবে খরচ করবে দোদুল ভেবে পাচ্ছে না। টাকাগুলোর সদ্ব্যবহার করা দরকার। বাবার জন্য একটা ভালো চশমা কিনতে হবে। মার জন্যও একটা শাড়ি কিনতে হবে—না, মাকে আরো ভালো কিছু দিতে হবে। সবচেয়ে ভালো হয় মার কাছে জিজ্ঞাসা করলেই—তিনি কী চান। এই বয়সে মানুষের মনে কোনো বিশেষ চাওয়া আছে কিনা তা তো তার জানা নেই। মৃদুল ভাইকে জামিনে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য নামি-দামি উকিল ধরতে হবে। অনেক টাকা লাগবে নিশ্চয়ই। তারপর মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করাতে হবে। মাদক যে কতোটা নৈতিক অবক্ষয় করে তা তো মৃদুল ভাইকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে শেষ পর্যন্ত নারী অপহরণ। মামলাটা জটিল। জামিন হবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

আচ্ছা, জেসিদের বাসায় গেলে কেমন হয়? জেসির বাবা চাকরির কথা শুনলে নিশ্চয়ই খুশি হবেন। ওই আমেরিকাঅলার খবরটাও জানা যাবে। জেসিদের বাসায় যাওয়ার আগে ফুল কিনতে হবে। অনেকগুলো ফুল। প্রতিবার একটা করে ফুল দেয়া হয়। এবার একটা দেয়া যাবে না। এবার একটা সুখবর নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চাকরি পাওয়ার সুখবর। শুধু ফুল-টুল নিলে হবে না। মিষ্টি-টিষ্টি নিতে হবে। সুখবরের সাথে মিষ্টির একটা নাড়ির টান আছে। এমন কোনো সুখবর নেই যে-সুখবরে এক বৈয়াম তেঁতুলের আচার দেয়া যায়। সব সুখবরই মিষ্টিকাতর। কথাটা কি ঠিক হলো? তেঁতুল দেয়া যায় এমন একটা সুখবর নিশ্চয়ই আছে। স্ত্রী যখন স্বামীকে প্রথম প্রেগনেন্সির কথা

শোনায়, সেই সুখবরে স্ত্রীকে এক বৈয়াম তেঁতুলের আচার দেয়াই যায়। সেখানে বরং আলাউদ্দিনের মিষ্টিটাই বেমানান।

সন্ধ্যার পরে এহসান সাহেবের সাথে দেখা করতে হবে। চাকরি শুরুর আজ পনরতম দিন। প্রতি পাঁচদিন পরপর রিপোর্ট করার কথা। সেই হিসেবে ইতোমধ্যে দুটো রিপোর্ট করা হয়ে গেছে। সেগুলো অ্যাড রূপসী বাংলার ম্যানেজারের কাছে জমা দেয়া হয়েছে। নিয়ম হলো, প্রতি তৃতীয় রিপোর্ট পনর দিনের সামষ্টিক রিপোর্ট। এই রিপোর্টটা হবে মন্তব্য এবং প্রতিকারমূলক রিপোর্ট। রিপোর্টটা জেসিদের বাসায় যাওয়ার আগে আগেই মাথায় তৈরি করে ফেললে ভালো হয়, তাহলে লিখতে সহজ হবে।

পাক্ষিক প্রতিবেদন-১

বীথি। কোটিপতি বাবার একমাত্র মেয়ে। শিক্ষিতা। বুদ্ধিমতী। তবে একরোখা, জেদী। এই জেদ একদিনে তৈরি হয় নি। দীর্ঘদিনের জমানো ক্ষোভ-অভিমান পুঞ্জীভূত হয়ে জেদে পরিণত হয়েছে। কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল। তার এই ক্ষোভ বাবা-মার প্রতি। একজন আছেন তাঁর বিশাল ব্যবসা নিয়ে। আরেকজন আছেন নারীবাদী আন্দোলন নিয়ে। কিন্তু কাছ থেকে একটা নারী দিনে দিনে বিপথগামী হচ্ছে সেদিকে খেয়াল নেই। বীথি বন্ধুদের সাথে তুমুল আড্ডায় ব্যস্ত। কিছুদিন ধরে রাতের বেলায় বিভিন্ন ক্লাবে যায়। বন্ধুদের সাথে নেশা করে। এখনো কোনো ছেলের সাথে বিছানায় যাওয়ার নৈতিক অধঃপতন হয় নি বলে মনে হচ্ছে। তবে এভাবে চলতে থাকলে যে কোনোদিন এমনটা ঘটলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। ওর কিছু বন্ধু আছে। বিরাট বড়লোক। প্রচণ্ড নারী-লোভী, কিন্তু ধুরন্ধর। তারা চাচ্ছে বীথি যেন নিজ থেকেই তাদের কাছে ধরা দেয়। তাহলে আইনি কোনো ঝামেলা থাকবে না। এই মুহূর্তে দরকার হচ্ছে তার প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়া। তার চাওয়া-পাওয়া, পছন্দ-অপছন্দের কথা জানা এবং সে অনুসারে তার সাথে ব্যবহার করা। —দোদুল

দোদুল জেসিদের বাসায় পৌঁছলো বিকেলবেলায়। জেসির ভাই আরমানের সঙ্গে দেখা। সে দোদুলের দিকে যে-দৃষ্টিতে তাকালো তাতে মনে হলো জেসির সাথে দোদুলের সম্পর্কটা সে ভালো চোখে দেখছে না। দোদুল বললো—আসসালামু আলাইকুম।

আরমান শুধু বললো—হুঁ।

'ভাইয়া, জেসি কি বাসায় আছে?'

'আছে হয়তোবা।' বলেই সে বসার ঘর থেকে ভিতর-ঘরে গেলো। দোদুলের সাথে আর কোনো সৌজন্য দেখালো না।

জেসির আসতে দেরি হচ্ছে। দোদুল একা বসে আছে। তাকে খুব অসহায় লাগছে। সে কি চলে যাবে? আল্লাহ্ মাঝে মাঝে মানুষকে অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলেন। এরকম করে তিনি কী মজা পান, কী তাঁর রহস্য, দোদুল কিছুই জানে না। সে শুধু ভাবছে—দুনিয়ার কোনো মানুষই যেন তার মতো বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে না পড়ে।

জেসি এলো প্রায় বিশ মিনিট পর। তার সাজ দেখে দোদুলের মাথা ঘুরে পড়ে যাবার মতো অবস্থা। পৃথিবীর সব রূপ কি আল্লাহ্ মেয়েদের মধ্যেই দিয়েছেন? বিশেষ করে জেসির মধ্যে? দোদুল ভাবছে—এই সাজ সাজতে গিয়েই তার আসতে এতো দেরি হয়েছে। এমন একটা রূপসী মেয়েকে দেখার জন্য বিশ মিনিট কেন, বিশ দিন বসে থাকলেও তেমন কষ্ট হবে না। জেসি বললো, 'সাহেবের তাহলে আসা হলো?' আমি তো ভাবলাম এই পেত্নীটাকে ভুলে কোনো এক রাজকন্যা নিয়ে ঘুরছেন।'

'পেত্নী, তবে রূপবতী পেত্নী। আর সেই পেত্নীর জন্য আমার এই ছোট্ট উপহার।'

'এতো গোলাপ! উফ্! এই, শুধু শুধু টাকা নষ্ট করতে গেলে কেন?'

'আমার টাকা আমি নষ্ট করবো না তো কে করবে? আমি আমার বউয়ের জন্য ফুল কিনেছি, তাতে তোমার কী?'

'ইশ রে, শখ কতো! এখনো একটা চাকরি যোগাড় করতে পারলে না, তার ওপর আবার বউ। এই, হাত ছাড়ো। ভাইয়া এসে পড়বে।'

'পড়ুক। আমি তো উনার হাত ধরি নি। ধরেছি তোমার হাত, তোমার কোনো আপত্তি আছে? নেই। তাহলে অন্যে কী ভাবলো না-ভাবলো সেদিকে তাকানোর সময়ও আমার নেই।'

'কে বললো আপত্তি নেই? অবশ্যই আপত্তি আছে। আমি এখন অন্যর বউ হতে যাচ্ছি। পরের স্ত্রীর হাত ধরা নিশ্চয় তোমার জন্য উচিত হবে না। তাই না?'

'মানে?'

'মানে, আমেরিকাঅলা আমাকে পছন্দ করেছে। বাবা তোমাকে আমেরিকাঅলার কথা বলেন নি? পনর দিন আগে দেশে ফিরেছে। গত পরশু দেখে গেলো। বলেছে এই মাসেই ডেট দিবে। অতএব, তোমার সাথে আমার এই শেষ দেখা। আমাকে ক্ষমা করো দোদুল।'

দোদুল জেসির কথায় একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলো। এ কী বলছে জেসি! ওর মনটা বিষিয়ে উঠছে। এতোদিন তার চাকরি ছিল না। তখন এই কথা শুনলেও হয়তো এতোটা কষ্ট লাগতো না। এখন তার চাকরি আছে। তারপরও তাকে এমন খবর শুনতে হচ্ছে। বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। চোখে পানি এসে যাবে। মেয়ে-মানুষের সামনে চোখে পানি আসাটা কাজের কথা না। সে কোনোমতে বললো, 'আমি এখন যাই জেসি, আমার একটা কাজ আছে।' বলেই উঠে দাঁড়ালো। জেসি ফিক করে হেসে বললো, 'বাব্বাহ্, বাবুর অভিমান দেখো। আমি বাসায় বলে দিয়েছি, তোমাকে ছাড়া আমি কাউকেই বিয়ে করবো না। কখনোই না। মরে গেলেও না। তোমার হাত ছাড়া অন্য কারো হাত আমি জীবনেও ধরতে পারবো না।' বলেই দোদুলের হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিল। 'এখন চুপ করে বসে আমার হাত ধরে একটানা আধঘণ্টা বসে থাকো। কী ব্যাপার, এরকম চুপ করে গেলে কেন? কথা বলো। কিছু খাবে? একটা চুমু?'

জেসি দোদুলের মনটাকে ভালো করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। দোদুল কিছু বললো না। শুধু মুখ তুলে একবার জেসির মুখের দিকে তাকালো। একটা নির্মল পবিত্র মুখ।

দোদুল শুধু ভাবে—এতো সহজ-সরল মেয়ে হয় কী করে? নারী নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে জটিল বস্তুর একটি। অথচ জেসি? জেসিকে দেখলে যে কেউই বলবে—নারীর মতো সহজ-সরল আর কিছু হয় না।

দোদুলের মন থেকে শংকা যাচ্ছে না। এই মুখটা, এই মানুষটাকে সে কি আপন করে পাবে? তার অনেক দিনের ইচ্ছে জেসির সাথে কোনো এক পূর্ণিমা দেখে দেখে রাত ভোর করে দেবে। সত্যিই কি তারা দুজন একসাথে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে পারবে?

দোদুল বললো, 'জেসি, আমি আজ যাই। আমার আজ কাজ আছে।'

'আমি তোমার মনটা খারাপ করে দিয়েছি। তুমি চলে গেলে আমার সত্যিই খারাপ লাগবে। আর কিছুক্ষণ বসো, প্লিজ, আরো কিছুক্ষণ।' বলতে বলতে সে কেঁদে ফেললো। কান্না লুকানোর জন্য সে তেপায়ার ওপর মাথা উপুড় করলো। এই ফাঁকে দোদুল রুম থেকে বের হয়ে এলো।

রাস্তায় নেমে দেখলো সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এহসান সাহেবের অফিসে গিয়ে খুব দ্রুত কম্পিউটারে টাইপ করে রিপোর্টটা জমা দিয়ে বাসায় এলো।

বীথি সিডিতে গান শুনছে। এহসান সাহেব তাঁর রুমের দরজায় টোকা মারলেন।

'বীথি। বীথি মা।'

কোনো সাড়া নেই। তিনি আবার ডাকলেন, সাথে দরজায় ধাক্কা দিলেন।

'বীথি মা।'

'কে?'

'আমি। তোমার বাবা। এহসান মল্লিক।'

বীথি দরজা খুলে বিরক্ত গলায় বললো, 'আহ্লাদ করো না তো বাবা। তুমি আমার বাবা হলে নামটা যে এহসান মল্লিক হবে সেটা কি আমি জানি না?'

'হ্যাঁ, তা তো জানোই মা।'

'এখন বলো, তুমি কি কিছু বলতে এসেছো?'

'হ্যাঁ। তুমি কি এখন ব্যস্ত মা?'

'মোটামুটি। তবে তোমার কথা শুনতে পারবো। আর প্রতি কথার শেষে মা, মা করবে না। ছাগলের মতো ম্যাঁ-ম্যাঁ ডাক শুনতে ভালো লাগছে না।'

এহসান সাহেব একটু চুপসে গেলেন। ঢোক গিলে বললেন, 'তোমার পড়ালেখার কী খবর?'

'চলছে তো ভালোই।'

'কী রকম ভালো? ইতেমধ্যে ফার্স্ট পার্ট-এর রেজাল্ট হয়ে যাওয়ার কথা। রেজাল্ট হয়েছে না?'

'হয়েছে।'

'তোমার রেজাল্ট কী?'

'আমি ফার্স্ট হয়েছি।'

'কী! আবার বলো।'

'আমি ফার্স্ট হয়েছি।'

'তুমি ফার্স্ট হয়েছো এই কথা আমি আজ শুনলাম? আমাকে আগে জানাও নি কেন? রেজাল্ট হয়েছে কতোদিন হলো?'

'দুই মাস হয়ে গেলো। যেদিন রেজাল্ট বেরুলো আমার যে কী খুশি লাগছিল। প্রথমে খবরটা তোমাকে দিতে চেয়েছিলাম। তুমি তোমার অফিসের কাজে বাইরে ছিলে। তোমাকে ফোন করেও পাওয়া গেলো না। যেদিন তুমি বাড়িতে এলে সেদিন রাতে তোমাদের রুমের সামনে গিয়ে দেখি রুমের দরজা আটকানো। ভিতরে তোমার আর মার মধ্যে কথা কাটাকাটি চলছে। তোমাদের ঝগড়ার মধ্যে আমি আর বাধা দিতে চাই নি।'

'আমি না হয় রেজাল্টের কথা না জানলাম, তোমার মাকে তো জানাতে পারতে।'

'মাকে আমি জানাই নি। জানাতে ইচ্ছে হয় নি। যে মহিলা সারাক্ষণ বাইরের মানুষের চিন্তায় ব্যস্ত, ঘরের মানুষের খবর যার কাছে মূল্যহীন, তাকে জানিয়ে কী লাভ? তবে মা আমার ফার্স্ট হওয়ার খবর জানে। তবুও আমাকে কোনোদিন কিছু বলেন নি।'

'সে যে জানে একথা তোমাকে কে বললো?'

'আমার এক ফ্রেন্ড একদিন তাকে জানিয়েছিল।'

'আশ্চর্য, সে-ও তো কোনোদিন আমাকে জানায় নি।'

'তোমার সাথে মার মাসে কয়দিন দেখা হয় বলো তো? কটা রাত তুমি বাড়ি ফিরো? আর কটা রাত মা-ই বা বাড়ি ফিরে? যে দু-একদিন দেখা হয়, সে দু-একদিন তোমরা তো ঝগড়া করে বাড়িটাকে নরকপুরী বানিয়ে রাখো।'

এহসান সাহেব চুপ করে গেলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'মা বীথি, একটা কথা বলবো?'

'বলো।'

'তুমি ফার্স্ট পার্ট-এ ফার্স্ট হলেও এখন মনে হয় বেশি পড়ালেখা করছো না।'

'কিভাবে জানলে?'

'কিভাবে জানলাম সেটা বড় কথা না। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তোমার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়া আমার দায়িত্ব।'

'তা এই মহান দায়িত্বের কথা তোমার এতোদিনে মনে পড়লো?'

এহসান সাহেব একটু উত্তেজিত হতে গিয়েও হলেন না। তাঁর মেয়েটা এক কঠিন গোলক ধাঁধার দিকে এগুচ্ছে। এই পথ থেকে তাকে ফিরাতেই হবে। এই গোলক ধাঁধায় যারা পড়েছে তাদের কেউই আর ফিরে আসে নি। বীথিও আসতে পারবে না। যে করেই হোক, ওর এই পতন ঠেকাতেই হবে। তিনি খুব নরম স্বরে বললেন, 'বীথি মা।'

'বলো।'

'ইদানীং নাকি তোমার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা বেড়ে গেছে। ঘটনা কি সত্য?'

'ঘটনার কী আছে? বন্ধু-বান্ধব থাকা তো দোষের কিছু না।'

'না, বন্ধু-বান্ধব থাকা দোষের হবে কেন? কিন্তু কোনোদিন তো তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে না। তুমি যেমন আমার মেয়ে, তোমার বন্ধু-বান্ধবরাও তো আমার সন্তানের মতোই হবে। তাদের সাথে একদিন পরিচয় করিয়ে দিবে।'

'আচ্ছা দিব।'

'তুমি নাকি ইদানীং খুব বেশি রাত করে বাড়ি ফিরছো?'

বীথি একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো। 'বাবা, বোঝাই যাচ্ছে তুমি আজ আমার সাথে খুব আন্তরিক হতে এসেছো। কিন্তু দীর্ঘ দিনের অনভ্যস্ততায় সেই অভিনয়টা ভালোমতো ফুটিয়ে তুলতে পারছো না। তোমার অসংলগ্ন কথাবার্তায় সেটা ঠিকই বোঝা যাচ্ছে। তুমি কি লক্ষ করেছো, তোমার বেশিরভাগ প্রশ্নেই 'নাকি' থাকে? তার মানে, তুমি কোনো তথ্যই নিজ থেকে পাও নি। কেউ তোমাকে আমার সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে। সেই তথ্য থেকে তুমি প্রশ্ন করতে এসেছো। শোনো বাবা, আমার পেছনে গোয়েন্দা লাগালে তার পরিণাম ভালো হবে না। মাই লাইফ ইজ জাস্ট মাই লাইফ। আমার পারসোনাল লাইফে কেউ ইন্টারফেয়ার করুক তা আমি চাই না। এখন তুমি যাও বাবা। আমার মাথা ধরেছে। আমি এখন গান শুনবো। তারপর ঘুমোতে যাবো।'

মৃদুলের জেলে যাওয়ার ঘটনায় দোদুলের পরিবারটা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। রফিক সাহেব একেবারে চুপসে গেছেন। আগে 'আফসোস' করতেন। এখন আর তা-ও করেন না। যে যাই বলুক, চুপ করে শুনে থাকেন। ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব থানায় কেইস দিয়েই ক্ষান্ত হোন নি, নিজের একটা বাহিনীও তৈরি করেছেন। ওই বাহিনীর সদস্যরা প্রায়ই বাসার সামনে এসে রফিক সাহেবের নাম ধরে গালাগালি করে। শুধু তাঁর নামে না, তাঁর মেয়ে ফাতেমার নাম নিয়েও অশ্লীল-অশ্লীল মন্তব্য করে।

'হালার রফিক্যার বাচ্চা, জাউরা পোলা জন্ম দিয়া এখন ভালো মানুষ সাজছো, না?'

'তর ভালো মানুষিরে ইয়ে করি।'

'শুধু তরে না, তর মাইয়্যারেও করি। এই, তরা করবি না? আয় এক সাথেই করি।'

অশ্রাব্য সব গালাগালি। অপহরণের তিন দিন পর মিতুকে অপহরণকারীরা ফিরিয়ে দেয়। অপহরণকারীদের মধ্য থেকে মৃদুলসহ তিনজন ধরা পড়েছে। মামলা চলছে। মৃদুলের জামিন পাওয়ার সম্ভাবনা কম। যতোই দিন যাচ্ছে ততোই মৃদুলের ভূমিকাটা প্রকট হচ্ছে। মৃদুলের নেতৃত্বেই ঘটনাটা ঘটেছে। মৃদুল মেয়েটাকে পছন্দ করতো অনেক আগে থেকেই। প্রথমে ভদ্র ছেলের মতো তাকিয়ে থাকতো। বখাটে বন্ধুদের সাথে মিশে মিশে বিবেক শূন্যের কোঠায় পৌঁছেছে। একদিন মাতলামি করতে করতে আসার পথে মিতুর সাথে দেখা। ওর গায়ে নাকি হাত দিয়েছে। ওড়না নিয়ে টানাটানিও করেছে। মিতু কষে একটা চড়ও দিয়েছে। অনেক লোক এই দৃশ্য দেখেছে। তার প্রতিশোধ নিতেই এই অপহরণ।

দোদুল একটা ভালো বেতনের চাকরি পেয়েছে, এমন খুশির খবর এখন এই পরিবারের কারো মুখে হাসি ফোটায় না। সবার চোখ নির্লিপ্ত, প্রতিবেশীরা সবাই নাক সিটকায়। অপমানজনক কথা বলে। হোসনে আরা সারাক্ষণ কাঁদেন। তিনি কোনোদিন কল্পনাও করেন নি তাঁর প্রিয় সংসারটা এতোখানি লজ্জার ভিতর পড়ে যাবে। এখন নিজের ওপর দোষ দেয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই। আরো আগে নজর দিলে হয়তো মৃদুলের এতোখানি পতন ঠেকানো যেতো।

দোদুল একা তাদের সংসারটাকে টেনে তোলার চেষ্টা করছে। সে ভাবছে, অন্যের মেয়ের পতন ঠেকানের জন্য সে গোয়েন্দাগিরি করে, নিজের ভাইয়ের পেছনে কি কিছু

সময় ব্যয় করা যেতো না? তাহলে হয়তো এই পরিস্থিতিতে পড়তে হতো না। বাবার জন্য একটা চশমা এনেছিল। বাবা সেই চশমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছেন যেন তিনি অন্ধ, কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। মাকে বলেছিল, 'মা, আমি একটা চাকরি পেয়েছি।'

হোসনে আরা বললেন, 'ও।'

'অনেক বেতন মা। মাসে পনর হাজার টাকা।'

হোসনে আরা বললেন, 'বাবা, তুই ভাত খেয়েছিস? তুই কোথায় কোথায় ঘুরিস? মাঝে মাঝে রাত্রে বাড়িতেও ফিরিস না। বাবা, তুইও মৃদুলের মতো হইস না।' বলেই তিনি হাঁউমাঁউ করে কেঁদে উঠে দোদুলকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

দোদুল বললো, 'মা, তুমি চিন্তা করো না। আমি কখনো তোমার অবাধ্য হবো না।'

'বাবা, তুই রাতে কোথায় থাকিস?'

'মা, আমি যে চাকরি করি তাতে রাতে বাইরে থাকতে হয়।'

'জেসি মেয়েটা তো এখন আর আসে না। ওর সাথে কি ঝগড়া-টগড়া হয়েছে?'

'না মা, ও ভালোই আছে।'

'তোর চাকরির খবর জানিয়েছিস?'

দোদুলের মনে পড়লো—ওইদিন জেসির বাসায় কথা বলার সময় চাকরির খবরটা দেয়া হয় নি। তেপায়ার পার্শ্বে মিষ্টির প্যাকেটটা ছিল। জেসি কি মিষ্টির প্যাকেট দেখে বুঝবে যে, সে একটা সুখবর নিয়ে এসেছিল? ওর বিয়ের কথা শুনে যে খবরটা দেয়া হয় নি। সেদিন তেপায়ার ওপর থেকে মাথা তুলে যখন জেসি তাকে দেখে নি, তখন নিশ্চয়ই কেঁদে-কেটে একাকার করেছে।

দোদুল বললো, 'না মা, ওকে জানানো হয় নি।'

'কেন জানাস নি? চাকরির খবরটা শুনলে ও খুশি হবে। একদিন গিয়ে জানিয়ে আসিস। মৃদুল এই দুর্ঘটনা না ঘটালে আমি তোদের দুই ভাইকে এক সাথে বিয়ে দিতাম। আচ্ছা, জেসির বাবা কি এখন বিয়ে দিতে রাজি হবেন?'

'জানি না। না হওয়ারই কথা।'

'কেন হবেন না? আমরা তো কোনো দোষ করি নি। তুই তো কোনো দোষ করিস নি।'

হোসনে আরা দেখলেন, তাঁর ছেলেটার মুখ কী মলিন দেখাচ্ছে।

বীথি একটা জিনিস লক্ষ করছে—তার বাবা ইদানীং নিয়ম করে বাড়ি ফিরেন। মা-ও সন্ধ্যার পরে বাইরে থাকেন না। টিভিতে সাধারণ একটা ছবি হলেও এহসান সাহেব হইচই করে মেয়েকে ডাকেন।

'বীথি, বীথি মা আমার, এই দিকে এসো। দারুণ ছবি হচ্ছে। সারাক্ষণ ঘরে বসে কী করো? গান শুনবে। শুনবে না কেন? অবশ্যই শুনবে। তাই বলে সারাক্ষণ শুনতে হবে? এসো, এক সাথে ছবি দেখি।' বলতে বলতে উঠে এসে বীথি এবং ওর মাকে নিয়ে ছবি দেখেন। তারপর একসাথে ডিনার করে শুতে যান।

ইদানীং এহসান সাহেবের সাথে স্ত্রীর ঝগড়া-ঝাটিও হয় না। সবকিছুই যেন আশ্চর্য জাদুতে পরিবতির্ত হয়ে যাচ্ছে। বীথি বুঝতে পারছে না এসবের রহস্য কী। তবে কেউ একজন যে কলকাঠি নাড়াচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। কে সে মহামানব, যাঁর কথায় তার বাবা-মার এই আমূল পরিবর্তন? তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে। করতেই হবে।

এহসান সাহেব টিভি দেখছেন। পাশে বসে স্ত্রী জাহানারাও দেখছেন। মাঝে মাঝে দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠছেন। মাঝে মাঝে পিনপতন নীবরতা। হঠাৎ জাহানারা বলে উঠলেন, 'এই, হাত ছাড়ো, বীথি চলে আসবে।'

'ছাড়বো না। আসলে আসুক। মেয়ের সামনে বাবা, মার হাত ধরে আছে এটা তেমন দোষের কিছু না।'

'দোষের না হলেও ছাড়ো। আমি পারবো না এই বয়সে আহ্লাদ করতে।'

'তোমার আর কী এমন বয়স! এই সেদিন মাত্র বীথি হলো। তখন তোমার উনিশ বছর।' বয়স কম শোনার কথা যে কোনো মেয়ের জন্যই সুখকর। তবুও জাহানারা স্বামীর এই কথায় লজ্জা পেলেন। একটু বেশি রকম লজ্জাই পেলেন। তিনি উঠে গিয়ে পাশের সোফায় বসলেন। এহসান সাহেব উঠে সেই সোফায় বসতে গেলেন। জাহানারা কুশন দিয়ে তা প্রতিরোধ করার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলেন। বীথি জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে এই মধুর দৃশ্য দেখতে লাগলো। কতোদিন এমন মধুর দৃশ্য দেখা হয় না। আহা!

বীথি আস্তে আস্তে বাবা-মার রুমের দিকে এগুলো। বাবার অফিসের কিছু ফাইল পড়ে আছে। কয়েকটা ফাইলের কাগজ খুলে দেখলো। বেশিরভাগই অফিশিয়াল। ইংরেজিতে লেখা। বাংলায় লেখা একটা কাগজও পাওয়া গেলো।

পাক্ষিক প্রতিবেদন-২

মানুষের মনের মধ্যে দুইটা অংশ থাকে। একটা ভালো দিক, আরেকটা খারাপ দিক। ভালো দিকটা সবসময়ই চায় ভালোভাবে চলতে। ভালো কাজ করতে। সে আরো চায়, তার আশেপাশের জগৎ তার চাওয়া-পাওয়ার সাথে মিল রেখে চলুক। আর খারাপ দিকটা চায়—মানুষ বিপথগামী হোক। উচ্ছৃঙ্খল হোক। অশ্লীলতায় ছেয়ে যাক সমাজ। ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা শুরু হোক। তার এই চাওয়া সহজে পূরণ হয় না। বেশিরভাগ সময়ই মনের ভালো দিকটা প্রকট থাকে। কিন্তু যখনই মানুষ দেখে তার আশেপাশের জগৎ অনিয়মে ভরে গেছে, নানারকম অসংগতি ঘটছে, তখন খারাপ দিকটা ভালো দিকটাকে তিরস্কার করে—দেখ্, তোর ভালোমানুষির কী প্রতিদান পেলি? পারলি সমাজটাকে তোর মতো করতে? পারলি না। এখনো সময় আছে—আমার কথা মতো চল্। তখনই খারাপ দিকটা ভালো দিকটার ওপর কর্তৃত্ব শুরু করে।

আমার ধারণা—বীথির ব্যাপারেও এরকমটা ঘটেছে। বাবা-মার ঔদাসীন্য তার মনের ভালো দিকটাকে বিষিয়ে তুলেছে। খারাপ দিকটা বলছে—তুমিও উচ্ছৃঙ্খল হও। তোমার কোনো অধিকার নেই রাত করে বাড়ি ফেরার।—কেন অধিকার থাকবে না বন্ধুদের সাথে ড্রিংকস্ করার? যে বাবা-মা তোমার মনমতো চলবেন না, তুমি কেন তাঁদের অবাধ্য হবে না? কেন তুমি তোমার জীবনটাকে তাঁদের হাতে বন্দি করে রাখবে?

প্রথম দিকে এই মনোভাব খুবই কম জোরালো হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অসফল। কিন্তু ধীরে ধীরে টেন্ডেন্সিটা মনে গেঁথে যায়। ফলে, তখন ফেরা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। আমার ধারণা—বীথির সংশোধনের জন্য বীথির মা-বাবারই আগে সংশোধন হওয়া উচিত। —দোদুল

বীথি ভাবলো—ও, এই তাহলে রহস্য? বাবার ভাড়া করা স্পাই, যে খুব কাছ থেকে তাকে ফলো করছে। যাঁর রিপোর্টের ওপর তার বাবা-মা পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। কে এই দোদুল? তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে। প্রয়োজনে স্পাইয়ের পেছনে স্পাই লাগানো হবে। তবুও খুঁজে বের করা চাই।

দোদুল রাশেদের বাসার উদ্দেশে রাস্তায় বের হওয়ার কিছুক্ষণ পর একটা সাদা প্রাইভেট-কার তার পাশে থামলো। গাড়িটা দেখেই দোদুল বুঝতে পারলো এটা কার গাড়ি। গাড়ির কাঁচ নামিয়ে একটা মেয়ে বললো, 'এই যে মিস্টার দোদুল, গাড়িতে উঠে আসুন।'

দোদুল মেয়েটিকে চিনলো। তবুও না চেনার ভান করে বললো, 'আমাকে বলছেন?'

'হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি। অযথা নাটক করবেন না। তাড়াতাড়ি উঠে আসুন।'

ইতস্তত করতে করতে দোদুল উঠলো। মেয়েটি ড্রাইভারকে বললো—'স্টার্ট দিন।'

গাড়িতে বীথি দোদুলকে বললো, 'অনেকদিন ধরে আপনাকে ধরার চেষ্টা করছি। কিন্তু সুযোগমতো পাচ্ছিলাম না। অবশেষে পাওয়া গেলো। আপনিই তাহলে আমার বাবা-মাকে বদলে দিয়েছেন? আপনি এরকম ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন কেন? আমাকে তো অনেক দেখেছেন। এমন না যে আজই প্রথম দেখলেন। আমি আপনার সম্পর্কে অনেক খোঁজ নিয়েছি। আপনি বাবা-মার ছোট ছেলে। ফিজিক্সে মাস্টার্স। আপনার বড় এক বোন, এক ভাই। ভাইটা রিসেন্টলি একটা দুর্ঘটনায় জেলে। ঠিক দুর্ঘটনা না, অপকর্ম। মামলা চলছে। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। আপনার সাথে বাবার চুক্তি ছিল চব্বিশ ঘণ্টা আমাকে ফলো করার। কিন্তু আপনি প্রায়ই চুক্তি ভঙ্গ করতেন। চুক্তি ভঙ্গ করে আপনি মাঝে মাঝে কাঁঠাল বাগানের এক বাসায় যেতেন। ওই বাসায় অষ্টাদশী এক মেয়ে আছে। খুবই সুন্দুরী। নাম জেসি। আপনি তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন। যতোদূর জানি, মেয়েটিও আপনাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো।'

বীথি দোদুলের মুখের দিকে তাকালো, কোনো পরিবর্তন দেখা যায় কিনা তা লক্ষ করতে। দোদুলও বীথির মুখের দিকে তাকালো। এই মেয়ে কী চায়? এই মুহূর্তে তার সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছে চাকরি নিয়ে। তার গোয়েন্দাগিরি এক মাসেই ফাঁস। চাকরি তো থাকার কথা না। এই মুহূর্তে চাকরি চলে যাওয়ার মতো ভয়াবহ খবর আর নেই। শুধু চাকরি চলে যাওয়াই নয়, এহসান সাহেব যদি বাকি দুই মাসের টাকা ফেরত চান তাহলে আরো ঝামেলা হবে। তবে এখন সম্ভাবনা খুবই কম। দোদুল ঘুণাক্ষরেও ভাবে নি এর চেয়ে ভয়াবহ কোনো খবর তার জন্য অপেক্ষা করছে।

বীথি বললো, 'দোদুল সাহেব, আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন। আমার মা-বাবার মধ্যে পরিবর্তন এনেছেন। আমার পরিবারে শান্তি ফিরিয়ে এনেছেন। তাই আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

বীথি গলার স্বর আরেকটু নরম করে বললো, 'আপনার জন্য একটা দুঃসংবাদ আছে। কিভাবে যে বলি, বুঝতে পারছি না। আপনি ব্যাপারটাকে কিভাবে নেবেন? আমি কি বলবো?'

'বলুন।'

'যখন জানলাম আপনি জেসি নামের কোনো এক মেয়েকে ভালোবাসেন, তখন মেয়েটিকে আমার খুব হিংসে হয়। সেদিনই প্রথম জানলাম কৃতজ্ঞতা বোধ থেকে আপনার প্রতি আমার মনে সামান্য হলেও ভালোবাসা জন্মেছে। যাক, হিংসের বশবর্তী হয়ে কিংবা কৌতূহলে একদিন আমি গেলাম কাঁঠাল বাগানে জেসিদের বাসায়। গিয়ে শুনি আমেরিকা প্রবাসী এক ছেলের সাথে জেসির বিয়ে পরদিনই। আমার পরিচয় পেয়ে সে কী কান্নাকাটি! ও বারবার বলেছে আপনাকে যেন খবরটি দিই। আপনি অনেকদিন ধরে ওই বাসায় যান নি, ওর কোনো খোঁজ নেন নি—এই নিয়ে আপনার প্রতি ওর অনেক ক্ষোভ। অভিমান। ও আমার কাছে গোপনে আপনাকে একটা চিঠিও দিয়েছে। ওই চিঠি নিয়ে আমি আপনাকে অনেক খুঁজেছি। আপনি তখন আপনার চাকরি ফাঁকি দিয়ে আপনার ভাইকে ছাড়ানোর জন্য উকিলের কাছে ছোটাছুটি করছিলেন শুনলাম। কিন্তু কোনো জায়গায়ই খুঁজে পেলাম না। পরদিন খোঁজ নিয়ে জানলাম—সত্যি সত্যিই জেসির বিয়ে হয়ে গেছে। এর তিন-চার দিন পর স্বামীকে নিয়ে আমেরিকায় চলে গেছে। এই নিন চিঠিটা।'

দোদুল চিঠিটা হাতে নিয়ে বললো, 'আমাকে গুলিস্তানের দিকে নামিয়ে দিবেন প্লিজ।'

দোদুল গুলিস্তান নেমে হেঁটে হেঁটে রাশেদের বাসায় উপস্থিত হলো। রাশেদের বউ ঝরনা তো তাকে দেখে খুশিতে আটখানা। রাশেদের ছেলেটা বিছানা থেকে তার দিকে পিট পিট করে তাকাচ্ছে। ঝরনা কেবলই বলছে, 'দোদুল ভাই, আপনি এতোদিন পরে এলেন? এতোদিন কোথায় ছিলেন? আমি তো ভেবেছি আপনি এই বোনটাকে সত্যি সত্যিই ভুলে গেছেন। যান, আমি আপনার সাথে কথাই বলবো না।' ঝরনা কপট রাগ দেখাতে গিয়ে ফিক করে হেসে ফেললো। মেয়েটা দোদুলকে এতোদিন পর দেখে সত্যিই খুশি হয়েছে। সে তার খুশি হওয়াটা লুকানোর চেষ্টা করতে গিয়ে আরো বেশি প্রকাশ করে ফেলছে।

'রাশেদ প্রায়ই এসে বলে—আজ দোদুল দোকানে এসেছিল। কিছুদিন আগে একদিন এসে বললো—আপনার মনে হয় কোনো সমস্যা হয়েছে। আপনাকে নাকি বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। আপনার কি কিছু হয়েছে দোদুল ভাই? দাঁড়ান, নাস্তাটা নিয়ে আসি, তারপর শুনবো। রাত পর্যন্ত আছেন তো? দেখেন, আমিও কেমন! আছেন কী, থাকতেই হবে। আজ কিন্তু না খেয়ে যেতে পারবেন না।'

ঝরনা নাস্তা নিয়ে এসে বললো, 'কী ব্যাপার, এতো চুপচাপ কেন? জেসি ম্যাডামের সাথে মান-অভিমান চলছে বুঝি? ভালো, ভালো। মান-অভিমান না থাকলে প্রেম গাঢ় হয় না। বিয়ের আগে আমি রাশেদকে কতো জ্বালিয়েছি। ও আমার জন্য প্রায়ই গিফ্‌ট নিয়ে আসতো। আমি গিফ্‌টগুলো ফেলে দিয়ে শুধু বলতাম—গিফ্‌ট দিয়ে ফর্মালিটি মেইনটেইন করা হচ্ছে, না? আসলে তো কানাকড়িও ভালোবাসো না, শুধু অভিনয় করো। কতোদিন পর-পর আসো? মনে করেছো কিছুই বুঝি না? অন্য মেয়ে নিয়ে ঘুরো। আর আমার কাছে আসো গিফ্‌ট নিয়ে। কটা মেয়ে দরকার তোমার? রাশেদের চেহারা তখন বলার মতো না, দোদুল ভাই। ও প্রায় কেঁদে কেঁদে বলতো—বিশ্বাস করো ঝরনা, তোমাকে ছাড়া আমি অন্য কাউকে নিয়ে ভাবি না। কাজে ব্যস্ত ছিলাম বলে

আসতে পারি নি। আমি তো জানিই ও আমাকে কতো ভালোবাসে। তবুও ওকে রাগানোর জন্য প্রায়ই এসব করতাম।'

দোদুল বললো, 'তবুও তো শেষ পর্যন্ত তুমি তাকেই বিয়ে করেছো।'

'কেন, জেসি কি বলেছে যে তোমাকে বিয়ে করবে না?'

দোদুল কিছু বললো না, শুধু ঝরনার সামনে জেসির চিঠিটা মেলে ধরলো।

দোদুল,

আমি এক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। আমার এই কঠিন সময়ে তোমার একটা সাহসী সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। বাবা আমাকে ঐ আমেরিকাঅলার সাথে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন। তোমার অনিশ্চিত চাকরির সাথে আরেকটা অভিযোগ হলো—তোমার ভাই নারী অপহরণ মামলার আসামি। আমাকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে। তোমার আশ্বাস পেলে আমি এক কাপড়ে তোমার ঘরে উঠতে রাজি আছি। একটা কিছু করো দোদুল, প্লিজ। ইতি—জেসি।

ঝরনা বললো, 'আপনি কী সিদ্ধান্ত নিলেন?'

দোদুল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'এই চিঠি লেখা হয়েছে জেসির বিয়ের একদিন আগে। আমি পেয়েছি আজ। ও এখন স্বামীর সাথে আমেরিকায়।'

ঝরনা বাক্যহীন হয়ে গেলো। এমন পরিস্থিতির জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। সান্ত্বনা দেয়ার মতো কোনো ভাষা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সে ভাবছে—এমন পরিস্থিতির জন্য সান্ত্বনার কোনো শব্দ কি বাংলা অভিধানে সত্যিই আছে?

দোদুল রাশেদের বাসা থেকে রাত দশটার দিকে বেরুলো। রাস্তায় নেমে পকেট থেকে জেসির চিঠিটা নিয়ে আবার পড়লো। দোদুলের এখন নিজের জন্য যতোটা না কষ্ট লাগছে, তার চেয়ে বেশি লাগছে জেসির জন্য। মেয়েটা ওর ওপর কতোখানি রাগ ক্ষোভ-অভিমান নিয়ে কবুল বলেছে। এটা ভাবতেই ওর কষ্ট হচ্ছে। সে কবুল বলার আগ পর্যন্ত হয়তো অপেক্ষায় ছিল—এই বুঝি তার প্রেমিক-রাজপুত্র দোদুল ঘোড়ায় চড়ে এলো। এসেই বলবে—'জেসি, আমি এসে গেছি। তোমার আর দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। সব চিন্তা আমার। যে করেই হোক, আমি তোমাকে এই নরকপুরী থেকে নিয়ে যাবোই।' অথচ সে জানতেই পারলো না—তার স্বপ্নের রাজপুত্র তার চিঠিই পেয়েছে বিয়ের অনেকদিন পর। হয়তো দোদুল সে-সময় কোনো এক ফুটপাত ধরে হাঁটছিল।

দোদুল জেসির চিঠিটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললো। কী লাভ স্মৃতি জমা রেখে! স্মৃতির মতো বেদনাদায়ক কিছু পৃথিবীতে আর নেই!

বাসায় এসে দেখে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। ফাতেমার ছেলেটা দোদুলকে দেখেই মামা-মামা বলে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। চৌকির কোনায় বসে ফাতেমা কাঁদছে। ও ফুঁপিয়ে যা বললো তার সারমর্ম হচ্ছে—ওর শ্বশুর বাড়ির লোকেরা ওকে বিদায় করে দিয়েছে। যে মেয়ের ভাই অন্য মেয়ের ওড়না ধরে টানাটানি করে, গুণ্ডা দিয়ে মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে যায়, সেই মেয়েকে তারা আর ঐ বাড়িতে রাখতে রাজি না। যেন মৃদুলের অপরাধ ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ফাতেমার গায়েও লাগছে। ওর ছেলেকেও আনতে দিতে চায় নি। ছেলেটা এমনভাবে মার গলা জড়িয়ে ধরেছিল যে, তাকে ছাড়ানো সম্ভব হয় নি।

তবে তাকে একাই দিয়ে দেয়া হয় নি—মামলা করে তাকে নিয়ে যাবে সেই হুমকিও সাথে করে দিয়ে দেয়া হয়েছে। শুধু তাই না, কিছুদিনের মধ্যে ডিভোর্স লেটার পাঠিয়ে ফাতেমাকে চিরমুক্তি দেয়া হবে, সেই আশ্বাসও দেয়া হয়েছে। ফাতেমার এই খবরে রফিক সাহেব মূর্ছা গেলেন। তার জ্ঞান আর ফেরে নি। হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। হোসনে আরা হাসপাতালে আছেন।

মৃদুলের মামলার রায় হয়েছে। ওর দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। আপিল করেও পার পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বলেই উকিলের পরামর্শ আপিল না করা।

প্রতিবেশীদের নানা অপমানজনক কথা সইতে না পেরে ফাতেমা সিলিং ফ্যানের সাথে শরীরটা ঝুলিয়েছে। তার ছেলেটা নিচে বসে বসে মায়ের এই দৃশ্য দেখে চিৎকার দিয়ে কেঁদেছে, কিছুই করতে পারে নি। লাভের ওপর লাভ হয়েছে—ও এখন ওর বাবার বাড়িতে বিনা বাধায় চলে যাবে। ওর বাবাকে আইনি ঝামেলায় জড়াতে হবে না।

আরেক নাটক করলেন রফিক সাহেব। এক মাস হাসপাতালে থেকে ডাক্তাররা যখন সবুজ সংকেত দিচ্ছেন তখন আজ ভোরে ভেলকি দেখিয়ে তিনিও চলে গেলেন। যাবার আগে বলেছেন, 'আফসোস। আল্লাহ্, আমার সহজ-সরল সৎ চলাফেরার এই প্রতিদান? আহা!'

বীথির বাবা এহসান সাহেবই এতোদিন হাসপাতালের খরচ চালাচ্ছিলেন। আজ বাদবাকি টাকা দিয়ে রফিক সাহেবের লাশটা বাসার দিকে নিচ্ছেন তাঁরই নেতৃত্বে। পেছনে পেছনে আসছেন হোসনে আরা, এহসান সাহেবের স্ত্রী জাহানারা, দোদুল এবং বীথি।

দোদুল তার টেবিলে মাথা ফেলে নিঃশব্দে কাঁদছে। অনেকদিন কাঁদা হয় না। বুকে বেশ কয়েকটা পাথর জমে আছে। কেঁদে কেঁদে সেই পাথর গলাতে হবে।

দোদুল টের পেলো—টবিলের ওপরে রাখা তার হাতে আরেকজনের হাত। মাথা তুলে দেখে পাশে বীথি দাঁড়ানো। তার চোখে টলোমলো জল।

দোদুল জানে না, এই জল কি সহমর্মিতার, না অন্য কোনো যমুনা সৃষ্টির জন্য এ জল প্রতীক্ষা-রত? সে কেবল জানে—ফাতেমার নামটা ফাতেমার জীবনে কাজে না দিলেও তার নিজের নামটা খুব কাজে দিয়েছে। তার নামের মতোই তার সৌভাগ্যটা অদৃশ্য কোনো চিকন সুতায় দুলছে, যার দেখা হয়তো সে কোনোদিনই পাবে না। কিংবা পেলেও ধরতে গেলেই ছিঁড়ে পড়বে।

• • •